বিজ্ঞান
ষষ্ঠ শ্রেণি
অনুসন্ধানী পাঠ
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বিচক্ষণ নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে পাওয়া জাতিসংঘের 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দি আর্থ' পুরস্কার গ্রহণ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন্স অব দি আর্থ' পদকে ভূষিত হন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরিবেশ আদালত আইন, পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, বাংলাদেশ জীব-বৈচিত্র্য আইন প্রণয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তহবিল গঠন এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ২০১৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ড. হাসিনা খান
ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খান
ড. মুশতাক ইবনে আয়ূব
রনি বসাক

সম্পাদনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

সূচিপত্র

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা-

শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই? ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান বিষয়ে তোমাদের স্বাগতম!

দেখতেই পাচ্ছ, এতদিন তোমরা যেভাবে পড়াশোনা করে এসেছ তাতে একটা বড় পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে! তোমাদের সকল বিষয়ের বইগুলোও তাই এবার একটু অন্যরকম। বিজ্ঞান বিষয়ে তোমরা নিশ্চয়ই দুইটি বই হাতে পেয়েছ! এই 'অনুসন্ধানী পাঠ' বইটির সঙ্গে তোমাদের আরেকটা 'অনুশীলন বই'ও দেওয়া হয়েছে। একটু চোখ বুলালেই বুঝতে পারবে যে, এই বইটির সঙ্গে অনুশীলন বইটির বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। সত্যি বলতে এতদিন যেভাবে তোমরা পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় পড়ে বিজ্ঞান শিখতে চেষ্টা করেছ, এবার এই শেখার ধরনটাই একেবারে বদলে যাচ্ছে। পুরো বছর জুড়ে তোমরা বেশ কিছু নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবে, নতুন নতুন কিছু সমস্যার সমাধান করবে। এই নতুন অভিজ্ঞতাগুলো আর সমস্যা সমাধানের ধাপগুলো সব বিস্তারিতভাবে তোমাদের অনুশীলন বইটিতে দেওয়া আছে। এই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে গিয়ে নানা ধাপে তোমাদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় জানার প্রয়োজন পড়বে, সেজন্য তোমাদের সাহায্য করবে এই 'অনুসন্ধানী পাঠ' বই। স্কুলে বা বাড়িতে, যখন যেখানেই থাকো, তোমরা এই বইটির সাহায্য নিয়ে দরকার হলে নিজে নিজেই সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেলতে পারবে!

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমাদের বিজ্ঞানের যেসব বিষয় জানার প্রয়োজন হবে সেগুলো এই বইয়ে মোট ষোলটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। পুরো বছরজুড়ে তোমরা যে অভিজ্ঞতাগুলোর ভেতর দিয়ে যাবে, তাতে এই বিষয়গুলো বিভিন্ন সময়ে তোমাদের কাজে আসবে।

তাহলে শুরু করা যাক, কী বলো?

অধ্যায় ১

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
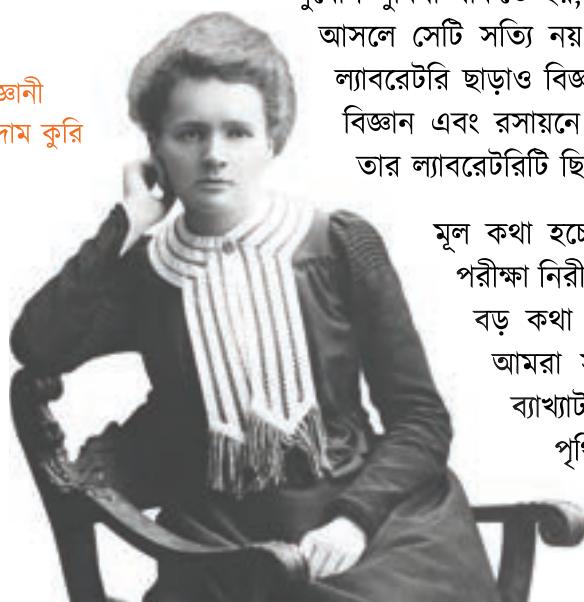
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ বিজ্ঞানের ধারণা, প্রযুক্তির ধারণা
- ☑ বিজ্ঞান থেকে প্রযুক্তি
- ☑ ভালো প্রযুক্তি, খারাপ প্রযুক্তি
- ☑ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া
- ☑ বিভিন্ন রাশির পরিমাপ, বিভিন্ন ধরনের পরিমাপের পদ্ধতি
- ☑ ছোট ও বড় স্কেলে পরিমাপ
- ☑ প্রয়োজনে নিখুঁত পরিমাপ
- ☑ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা
- ☑ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণে নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা
- ☑ বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতি

বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের কথা বলতেই আমাদের কল্পনায় বড় বড় আধুনিক ল্যাবরেটরিতে নানা ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের জটিল সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছেন, এরকম একটা ছবি ভেসে ওঠে। সেজন্য অনেকেই মনে করে বিজ্ঞান চর্চা বুঝি সবাই করতে পারে না, এর জন্য বুঝি অনেক সুযোগ সুবিধা থাকতে হয়, বিজ্ঞানী হতে হলে অনেক মেধাবী হতে হয়। আসলে সেটি সত্যি নয়, বিজ্ঞান সবার জন্য। অনেক বড় আধুনিক ল্যাবরেটরি ছাড়াও বিজ্ঞানের গবেষণা করা যায়। মাদাম কুরি পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নে দুইবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, কিন্তু তার ল্যাবরেটরিটি ছিল একেবারেই সাদামাটা।

বিজ্ঞানী মাদাম কুরি

মূল কথা হচ্ছে বিজ্ঞান এক ধরনের জ্ঞান যেটি সবসময় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচাই করা যায়। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা বিজ্ঞান হচ্ছে চিন্তার একটা পদ্ধতি যেখানে আমরা সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করি এবং সেই প্রশ্নের ব্যাখ্যাটাকেও যাচাই করে দেখি সেটি সত্যি কি না। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর তত্ত্ব নিয়েও আমরা প্রশ্ন করতে পারি এবং সেটি সত্যি কি না

পরীক্ষা করে দেখতে পারি। হাজার হাজার বছর থেকে বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বকে প্রতিনিয়ত যাচাই করে আসা হচ্ছে বলে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোর কোনটা কতটুকু সত্যি সেটা আমরা জানি। যখন প্রয়োজন হয় তখন বিজ্ঞানের তত্ত্বকে আমরা পরিবর্তন করি, কিংবা পরিমার্জন করি। সেজন্য বিজ্ঞানের উপর আমরা সবসময় নির্ভর করতে পারি।

বিজ্ঞান এক ধরনের জ্ঞান যেটি যুক্তিতর্ক, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়ে যাচাই করতে পারি, কিন্তু মনে রাখবে যে, সব ধরনের জ্ঞানই কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র নয়। আমাদের চারপাশে যে বাস্তব জগৎ আছে, সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। তাই ভালোবাসা, হিংসা বা নৈতিকতার মতো বিষয়গুলো নিয়ে যে জ্ঞানটুকু গড়ে উঠছে সেটি বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। অর্থাৎ প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ঘটনা হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র।

দুইজন বিজ্ঞানী

বিজ্ঞান বিষয়টা সঠিকভাবে বোঝার জন্য এবারে দুইজন বিজ্ঞানীর দুটি আবিষ্কারের কথা বলা যাক। একজন বিজ্ঞানীর নাম পৃথিবীর সবাই জানে আর অন্যজনকে দেখলে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না যে তিনি একজন বিজ্ঞানী, তার কথা জানে শুধু আমাদের দেশের অল্প কিছু মানুষ।

স্যার আইজাক নিউটন

নিউটনের কথা কে না জানে, বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে তার যুগান্তকারী আবিষ্কার রয়েছে কিন্তু এখানে তুলনামুলকভাবে একটি সহজ আবিষ্কারের কথা বলা যাক। তিনি বলেছিলেন, সূর্যের আলোকে আপাতত রংহীন মনে হলেও এটি আসলে অনেকগুলো রং দিয়ে তৈরি। বিজ্ঞানী নিউটন যে সময়ে বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেছেন সেই সময়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার সেরকম প্রচলন হয়নি। একজন বিজ্ঞানী কোনো তত্ত্ব দিলে সবাই মিলে সেটা নিয়ে আলোচনা করে বের করার চেষ্টা করতেন তত্ত্বটি সঠিক না ভুল।

বিজ্ঞানী নিউটন শুধু তার তত্ত্ব দিলেন না, একটি প্রিজম দিয়ে সূর্যের আলোকে ভাগ করে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের বিশ্লেষণ করে দেখালেন। তিনি এটি করেই থেমে গেলেন না, আরেকটি প্রিজম দিয়ে সাতটি রংকে একত্র করে আবার বর্ণহীন করে দেখালেন!

পরীক্ষা করে একেবারে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেখানোর ফলে বিজ্ঞানী নিউটনের তত্ত্বটি মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না।

হরিপদ কাপালী

হরিপদ কাপালী ছিলেন যশোর এলাকার একজন সাধারণ চাষি। তিনি তার ক্ষেতে ইরি ধান লাগিয়েছেন, সেই ক্ষেতের ধান পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ করে দেখলেন- কিছু গাছ তুলনামূলকভাবে বড় এবং সেখানে ধানের ফলন হয়েছে বেশি। হরিপদ কাপালী একজন কৃষক হলেও তিনি আসলে বিজ্ঞানী, তাই সেই ধানগুলো অন্য ধানের সাথে মিশিয়ে না ফেলে সেগুলো আলাদা করে ফেললেন। তার বীজকে আলাদা করে করে সেগুলো আবার নতুন করে লাগালেন, তিনি দেখতে চাইলেন আসলেও সেগুলো উচ্চ ফলনশীল কি না। দেখা গেলো সেগুলো বেশ বড় হলো এবং অনেক বেশি ধানের ফলন হলো।

খাঁটি বিজ্ঞানীরা স্বার্থপর হন না, তাঁরা সবার জন্য কাজ করেন। হরিপদ কাপালীও তাঁর ধানের বীজ অন্যদের বপন করতে দিলেন এবং দেখতে দেখতে সেই এলাকার সকল চাষি উচ্চ ফলনশীল ধান পেতে লাগলো!

বিজ্ঞানী হরিপদ কাপালীর এই আবিষ্কারের কথা লোকমুখে অন্যরা জেনে যাওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করে। তাঁর ধানের নাম দেওয়া হয় হরি ধান, দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান তাকে পদক দিয়ে সম্মানিত করে এবং পাঠ্যবইতে তার এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা লেখা হয়।

তোমাদের এই দুইজন বিজ্ঞানীর কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে বোঝানোর জন্য যে, বিজ্ঞান আসলে শুধু বড় বড় ল্যাবরেটরি এবং দক্ষ অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের জন্য নয়। একজন সাধারণ মানুষের যদি বৈজ্ঞানিক মন থাকে তাহলে তিনিও বিজ্ঞানে অবদান রাখতে পারেন।

প্রযুক্তি

বিজ্ঞানের জ্ঞানটুকু যখন আমাদের জীবনের কোনো একটি প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করা হয় তখন সেটাকে বলে প্রযুক্তি। যেমন বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি- পদার্থের ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। সেই জ্ঞানটুকু ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় এবং এই বিদ্যুৎ আমাদের জীবনের অনেক প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমাদের রূপপুরে সেরকম একটি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। আবার সেই একই জ্ঞান ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করা হয়েছে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে দুইবার সেটি সরাসরি মানুষের উপর ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজ্ঞানের অপূর্ব একটি জ্ঞানকে

প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের ভালো কাজে যেরকম ব্যবহার করা যায়, ঠিক সেরকম মানুষকে ধ্বংস করার কাজেও ব্যবহার করা যায়।

বিজ্ঞান যেহেতু একটা জ্ঞান এবং চিন্তার একটা প্রক্রিয়া তাই বিজ্ঞানের মাঝে খারাপ কিছু থাকার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু সেই জ্ঞানটুকু ব্যবহার করে যখনই কোনো একটা প্রযুক্তি গড়ে তোলা হয় সেটি কিন্তু যেরকম ভালো হতে পারে ঠিক সেরকম খারাপও হতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে তোমাদের সেরকম একটা উদাহরণ দিয়েছি, সেটি হচ্ছে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং নিউক্লিয়ার বোমা। ঠিক সেরকম জৈব রসায়নের জ্ঞান ব্যবহার করে মানুষের জীবন রক্ষার জন্য ঔষধ তৈরি করা হয় আবার সেই একই জ্ঞান ব্যবহার করে ভয়ানক মাদক তৈরি করা হয়, যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধের উৎস।

নিউক্লিয়ার শক্তি ভাল, খারাপ দুইরকম কাজেই ব্যবহৃত হতে পারে
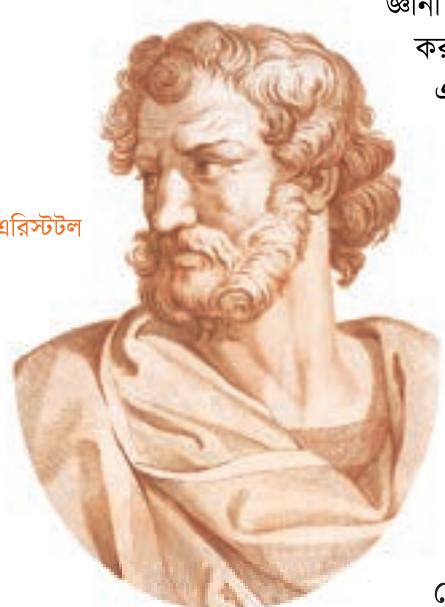
আমরা শুরুতে বলেছি আমাদের প্রয়োজন মেটাতে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয় তখন সেটাকে প্রযুক্তি বলি, যদি তোমরা তোমাদের চোখ কান খোলা রাখো তাহলে দেখবে মাঝে মাঝে সেই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমাদের লাভ থেকে ক্ষতি বেশি হয়। যেমন পলিথিনের ব্যাগ, আমরা এই ব্যাগগুলো একবার ব্যবহার করে ফেলে দিই। এইগুলো অপচনশীল বলে আবর্জনার সাথে সাথে শেষ পর্যন্ত নদীর তলদেশ বা প্রকৃতিতে আশ্রয় নেয়, প্রথমে দেশের তারপরে পৃথিবীর পরিবেশের মহা বিপর্যয় ঘটাতে থাকে। কিন্তু মানুষ যদি একটা কাপড়ের বা চটের ব্যাগ ব্যবহার করতো তাহলে কিন্তু এই সর্বনাশ হতো না। কাজেই তোমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে একবার ব্যবহারের উপযোগী পলিথিনের ব্যাগের এই প্রযুক্তিটি আসলে একটি অপ্রয়োজনীয় প্রযুক্তি।

আবার কিছু অসাধারণ চমৎকার প্রযুক্তি রয়েছে যেগুলো আমাদের জীবনযাত্রার মানের অনেক বড় পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু সেই একই প্রযুক্তি একজন মানুষ অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন এমনকি ক্ষতিকর কাজেও ব্যবহার করতে পারে। তার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ তোমাদের সবার চোখের সামনেই রয়েছে, সেটি হচ্ছে স্মার্ট ফোন। স্মার্ট ফোন কত কাজে লাগে সেটা নিশ্চয়ই কাউকে বলে দিতে হবে না কিন্তু মাঝে মাঝে দেখবে কোনো একজন মানুষ সম্পূর্ণ বিনা কারণে সেটি ব্যবহার করে নিজের সময় নষ্ট করছে। অপ্রয়োজনে ব্যবহার করে করে অনেক তরুণ-তরুণী নিজেদের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ যে প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণের জন্য তৈরি হয়েছে, সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করেই মানুষের অকল্যাণ করা যায়, ক্ষতি করা যায়।

তাই প্রযুক্তি ব্যবহার করার সময় খুব সতর্ক থাকতে হয়। বিজ্ঞান কখনো খারাপ হতে পারে না, কিন্তু প্রযুক্তি যদিও মানুষের কল্যাণকে সামনে রেখেই তৈরি হয় কিন্তু সেটি ভালো হওয়ার পাশাপাশি খারাপও হতে পারে, অপ্রয়োজনীয় হতে পারে কিংবা তার অপব্যবহারও হতে পারে। কাজেই প্রযুক্তি ব্যবহার করার আগে সবসময়ই এই ব্যাপারটা নিয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
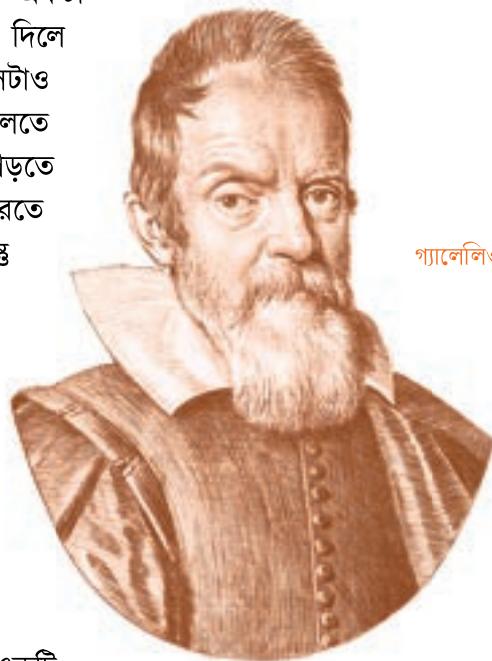
এরিস্টটল তাঁর সময়ের অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময়কার জ্ঞানী ব্যক্তিরা শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সবকিছুই চর্চা করতেন। তাই এরিস্টটলের বিজ্ঞান নিয়েও অনেক তত্ত্ব ছিল। একটি তত্ত্ব ছিল ভারী আর হালকা বস্তু নিয়ে। এরিস্টটল বলেছিলেন ভারী আর হালকা বস্তু উপর থেকে ছেড়ে দিলে ভারী বস্তুটি আগে নিচে পড়বে। সেই সময় জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথাকে সবাই গুরুত্ব দিত তাই দুই হাজার বছর ধরে সবাই বিশ্বাস করত সেটাই সত্যি।

এরিস্টটল

বিষয়টা একটু চিন্তা করলেই কিন্তু খটকা লাগে। যদি ভারী জিনিস দ্রুত এবং হালকা জিনিস ধীরে নিচে পড়ে তাহলে দুটি একসাথে বেঁধে দিলে হালকা জিনিসটা ভারী জিনিসটাকে আর দ্রুত পড়তে দেবে না। আবার দুটি জিনিস একসাথে বেঁধে দিলে মোট ওজন আরও বেশি বলে সেটার আরও দ্রুত পড়া উচিত। তাহলে কোনটা সত্যি? এই প্রশ্নের উত্তর কী?

যুক্তি তর্ক দিয়ে আমরা একটা উত্তর দাঁড় করতে পারি, যে আসলে ভারী আর হালকা সব বস্তুই একসাথে নিচে পড়বে। কিন্তু আমরা তো সেটা ঘটতে দেখি না—একটা পাথর আর এক টুকরা কাগজ উপর থেকে ছেড়ে দিলে সবসময়ই পাথরটাই আগে নিচে পড়ে। আমরা সেটাও ব্যাখ্যা করার জন্য একটা যুক্তি দাঁড় করতে পারি—বলতে পারি বাতাসের বাধার কারণে কাগজের টুকরার পড়তে সময় বেশি লাগে। বায়ুশূন্য জায়গায় পরীক্ষাটা করতে পারলে দেখব দুটো একই সময় নিচে পড়ছে। কিন্তু বায়ুশূন্য জায়গা পাওয়া খুব সহজ নয়, তাই ভারী বস্তুর সাথে খুবই ছোট আকারের হালকা একটা বস্তু নিতে পারি যেন বাতাসের বাধা বেশি না হয়। কথিত আছে পিসার হেলানো দালানের উপর থেকে এরকম একটি ভারী আরেকটি হালকা বস্তু ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করে গ্যালেলিও দেখিয়েছিলেন যে, ভারী এবং হালকা বস্তু একসাথে নিচে পড়ে।

গ্যালেলিও

উপরের উদাহরণটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি

সুন্দর উদাহরণ। এখনও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিটা এরকম। এখানে মোট ছয়টি ধাপ আছে, ধাপগুলো এরকম:

১। একটি প্রশ্ন যার উত্তর বের করতে হবে।
(উপরের উদাহরণে সেই প্রশ্নটি হচ্ছে ভারী না হালকা বস্তু কোনটা আগে নিচে পড়ে?)

২। এ সম্পর্কে যা কিছু গবেষণা হয়েছে তা জেনে নেওয়া।
(উপরের উদাহরণে সেটি ছিল এরিস্টটলের ব্যাখ্যা।)

৩। প্রশ্নটির একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানো।
(উপরের উদাহরণের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে ভারী এবং হালকা দুটিই বস্তুই একসাথে নিচে পড়বে।)

৪। সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটি সত্যি কি না সেটি পরীক্ষা করে দেখা।
(উপরের উদাহরণে গ্যালেলিও সেটি পিসার হেলানো দালানের উপর থেকে ভারী এবং হালকা বস্তু ফেলে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন।)

৫। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া।
(উপরের উদাহরণে গ্যালেলিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাঁর ধারণা সঠিক।)

৬। সবাইকে ধারণাটি জানিয়ে দেওয়া।
(গ্যালেলিও তার ধারণাটি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তখন অন্যরাও পরীক্ষাটি করে দেখেছিলেন।)

তোমরা যদি ইতিহাসের বড় বড় বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো দেখো তাহলে দেখবে, সবসময়ই সেগুলো ঘটেছে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে। আবার তোমাদের চারপাশের দৈনন্দিন ঘটনাগুলোর জন্যও কিন্তু এটা সত্যি, তোমরা অনেক প্রশ্নের উত্তর এভাবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করেই পেয়ে যাবে।

মূল কথা হচ্ছে, বিষয়টা যদি বিজ্ঞানের বিষয় হয় তাহলে তার উত্তরটি চোখ বন্ধ করে মেনে নেওয়া নয়; সেটি যাচাই করে গ্রহণ করা হচ্ছে বিজ্ঞান। সবাই হয়তো বিজ্ঞানী হবে না কিন্তু সবাই বিজ্ঞানমনস্ক হবে।

বিভিন্ন রাশির পরিমাপ

একটা পাথর উপরে ছুড়ে দিলে একসময় তা আবার নিচে এসে পড়ে। মানুষ প্রাচীন কাল থেকে এটা দেখে আসছে। কিন্তু এই জ্ঞানটুকু পুরোপুরি বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বলতে পারবে না যে—ঠিক কত জোরে কত ওজনের একটা পাথর কোনদিকে ছুড়ে দিলে কত সময়ে কত উপরে উঠে তা কত দূরে গিয়ে পড়বে। তার অর্থ প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চা করতে গেলে আমাদের সবকিছু পরিমাপ করে বলতে হয়।

যে সমস্ত বিষয় আমরা পরিমাপ করতে পারি সেগুলোকে রাশি বলে। কাজেই জ্বর ওঠার পর তোমার যে তাপমাত্রা বেড়ে যায় সেটি হচ্ছে একটা রাশি, কিন্তু জ্বর ওঠার কারণে তোমার শরীরে যে খারাপ অনুভূতি হয় সেটি রাশি নয়। ঠিক সেরকম একটা রসগোল্লার ভর হচ্ছে রাশি, কিন্তু রসগোল্লা খাওয়ার আনন্দ রাশি নয়। কাজেই তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যে, বিজ্ঞান চর্চা করতে হলে আমাদের অনেক রাশি পরিমাপ করতে হবে। রাশিগুলো পরিমাপ করার জন্য আমাদের সঠিক একক তৈরি করে নিতে হবে, যেমন দৈর্ঘ্যের জন্য মিটার, সেন্টিমিটার বা কিলোমিটার; ভরের জন্য কেজি কিংবা পাউন্ড ইত্যাদি। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে রাশি কতগুলো আছে? তাদের জন্য কতগুলো একক লাগবে? আমরা যদি কিছু রাশির কথা কল্পনা করতে চাই, তাহলে এক নিশ্বাসে বলে দিতে পারব দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, আয়তন,ওজন, ঘনত্ব, অবস্থান, বেগ, চাপ, তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, তাপ পরিবাহিতা, রং, কাঠিন্য অর্থাৎ রাশির কোনো শেষ নেই। সেগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের একক কয়টি লাগবে?

আনন্দের কথা হচ্ছে আমাদের চারপাশের জগতে অসংখ্য রাশি থাকলেও সেগুলো ব্যাখ্যা করতে মাত্র সাতটি রাশির জন্য সাতটি একক তৈরি করে নিলে সেগুলোকে ব্যাবহার করে আমরা আমদের পরিচিত জগতের সব রাশি তৈরি করে ফেলতে পারব। সেই সাতটি রাশির চারটি তোমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিদিন ব্যবহার করো, সেগুলো হচ্ছে দৈর্ঘ্য, ভর, সময় এবং তাপমাত্রা। (অন্য তিনটি হচ্ছে বৈদ্যুতিক কারেন্ট, পদার্থের পরিমাপ, আলোর ঔজ্জ্বল্য, আরেকটু উপরের ক্লাসে তোমরা সেগুলো সম্পর্কেও জানবে।) পরিমাপের জন্য এককগুলো আন্তর্জাতিকভাবে সবাই মিলে ঠিক করে রেখেছে। যদিও বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন একক প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত SI ইউনিটগুলো এরকম: দৈর্ঘ্যের জন্য মিটার (m), ভরের জন্য কিলোগ্রাম বা কেজি (kg), সময়ের জন্য সেকেন্ড (s), তাপমাত্রার জন্য কেলভিন (K)। আমরা এবারে প্রচলিত এই চারটি এককের পরিমাপ নিয়ে আর একটু আলোচনা করি।

পরিমাপের পদ্ধতি

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ঠিকভাবে পরিমাপ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচ কিলোমিটার হাঁটতে গিয়ে যদি দেখো তোমাকে পাঁচ মাইল হাঁটতে হচ্ছে তাহলে দেড়গুণ থেকে বেশি হাঁটতে হবে। তোমার মা যদি তোমাকে পাঁচ কেজি চাল আনতে বলে আর তুমি যদি পাঁচ পাউন্ড চাল নিয়ে আস, তাহলে অর্ধেক থেকেও কম চাল আনবে! দৈনন্দিন জীবনে এরকম ভুলত্রুটি আমরা কোনোভাবে কাটিয়ে উঠতে পারি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই ভুল মারাত্মক হতে পারে। পরিমাপে ভুল করেছিল বলে ১৯৮৩ সালের ২৩শে জুলাই এয়ার কানাডার যাত্রীবাহী একটি বোয়িং 767 বিমান মাঝপথে আবিষ্কার করল তার

জ্বালানি শেষ। বিন্দুমাত্র জ্বালানি ছাড়াই দক্ষ পাইলট সেটিকে কাছাকাছি পরিত্যক্ত একটা রেস কোর্সে নামিয়ে আনতে পেরেছিল। আবার একই ধরনের পরিমাপের হেরফেরের কারণে নাসার (NASA) ১২৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি মহাকাশযান ১৯৯৯ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গল গ্রহে বিধ্বস্ত হয়েছিল। কাজেই পরিমাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার।

এবারে আমরা আমাদের পরিচিত চারটি একক বিজ্ঞানে ব্যবহারের উপযোগিভাবে দেখি।

দৈর্ঘ্য

দৈর্ঘ্যের আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে মিটার, সংক্ষেপে m। যদিও পাশাপাশি ইঞ্চি এবং ফুটকেও দৈনন্দিন জীবনে এখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। আমরা বিজ্ঞানের পরিমাপের জন্য এই বইয়ে মিটারকে দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে ব্যবহার করব। তোমরা যারা একটা মিটার স্টিক হাতে নিয়েছ তারা মিটার বলতে কতটুকু দূরত্ব বোঝায় সেটা অনুভব করতে পেরেছ। মোটামুটিভাবে বলা যায় একজন মানুষের পা থেকে কোমর পর্যন্ত দূরত্বটুকুই হচ্ছে এক মিটার। তবে একেবারে সঠিকভাবে এক মিটার দূরত্ব মাপার জন্য আগে একটি আদর্শ মিটারস্টিক ফ্রান্সের একটি মিউজিয়ামে রাখা ছিল। এখন এক মিটার দূরত্ব মাপার জন্য বিজ্ঞানীরা একটি মজার পদ্ধতি ব্যবহার করেন। আলোর বেগ অনেক বেশি, এটি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই অচিন্ত্যনীয় আলোর বেগ ব্যবহার করে এক মিটার দূরত্ব বের করে ফেলেন। (তোমরা যখন একটু উপরের ক্লাশে উঠবে তখন সেটি কীভাবে করা যায় জানতে পারবে।) আলোর বেগ যেহেতু মহাবিশ্বের সব জায়গায় একই থাকে, তাই শুধু পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় নয় মহাবিশ্বের যে কোনো জায়গায় এক মিটার দূরত্ব কতটুকু সেটা অনেক সূক্ষ্মভাবে বের করে ফেলা যাবে।

তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ঢাকা থেকে সিলেট কতদূর তাহলে তুমি দূরত্বটি মিটারে না দিয়ে কিলোমিটারে দেবে, এক কিলোমিটার হচ্ছে ১০০০ মিটার। ঠিক সেরকম যদি তোমাকে তোমার নখের দৈর্ঘ্য কত জিজ্ঞাস করা হয় তুমি সেই দৈর্ঘ্যটি মিটারে না বলে মিলিমিটারে বলবে, মিলিমিটার হচ্ছে এক মিটারের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। মিলিমিটারের পাশাপাশি সেন্টিমিটারেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। এক সেন্টিমিটার হচ্ছে এক মিটারেরে ১০০ ভাগের ১ ভাগ কিংবা ১০ মিলিমিটার। মিলিমিটারে চাইতেও ছোট দৈর্ঘ্যের জিনিষ সাধরণত আমাদের খালি চোখে মাপ জোক করতে হয় না।

কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তোমাকে যদি কোনো একটা বস্তুর দৈর্ঘ্য বলতে হয় তাহলে তোমাকে বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিক করতে হবে দূরত্বটি মিটারে বলবে নাকি কিলোমিটারে বলবে কিংবা সেন্টিমিটারে বলবে নাকি মিলিমিটারে বলবে। সত্যি কথা বলতে কি তোমরা যখন মহাকাশের গ্রহ, নক্ষত্র নিয়ে পড়বে তখন দেখবে আমাদের এর বাইরেও কাজের সুবিধার জন্য অন্য একটা একক ব্যবহার করতে হচ্ছে!

ভর

ভরের একক হচ্ছে কিলোগ্রাম বা সংক্ষেপে কেজি (kg)। এক সময় 'আসল' এক কেজি একটা ভর ফ্রান্সের একটি মিউজিয়ামে রাখা হতো। ২০১৯ সালের মে মাস থেকে 'আদর্শ' বা 'আসল' এককের জন্য কোনো মিউজিয়ামে রক্ষা করা ভরের উপর নির্ভর করতে হয় না। বিজ্ঞানের কিছু ধ্রুব থেকে সেগুলো বের করে ফেলা যায়।

সম্ভবত আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে বেশি বার কেজি ব্যবহার করি। যেহেতু আমরা আজকাল পানি কিংবা সফট ড্রিংকের বোতলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাই বলতে পারি এক লিটারের বোতল বোঝাই পানি কিংবা সফট ড্রিংকের ভর হচ্ছে এক কেজি। কিংবা সাধারণ গ্লাসের চার গ্লাস পানির ভর হচ্ছে এক কেজি।

তোমাদের কারো কারো মনে হয়তো খটকা লাগছে যে আমরা ওজন মাপার জন্য কেজি ব্যবহার করি, আমাদের ওজন ৩০ কেজি বলতে আমরা খুবই অভ্যস্ত, তাহলে প্রচলিত ওজন শব্দটা ব্যবহার না করে বার বার ভর কথাটা কেন ব্যবহার করছি?

তার কারণটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের ভাষায় ভর আর ওজনের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য। ভরের একক হচ্ছে কেজি। ওজনের অন্য একটি একক, তোমরা উপরের ক্লাসে সেগুলো জানবে। কাজেই বিজ্ঞানের ভাষায় তোমার ওজন ৩০ কেজি কথাটি ভুল, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামাই না! এক ভর অন্য ভরকে আকর্ষণ করে; পৃথিবীর ভর যেহেতু অনেক বেশি তাই তার আকর্ষণটাও বেশি, এই আকর্ষণটাই আসলে ওজন। চাঁদের ভর যেহেতু পৃথিবীর ভর থেকে কম তাই তুমি যদি চাঁদে যাও তাহলে দেখবে সেখানে তোমার উপর চাঁদের আকর্ষণও কম। অর্থাৎ তোমার মনে হবে তোমার ওজনও কম, এক লাফে তুমি অনেক উপরে উঠে যেতে পারবে। কাজেই পৃথিবী এবং চাঁদ দুই জায়গাতেই তোমার ভর ৩০ কেজি হলেও পৃথিবী এবং চাঁদে তোমার ওজন ভিন্ন!

দৈর্ঘ্যের বেলায় দেখেছি মিটারের পাশাপাশি ইঞ্চি এবং ফুটও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভরের জন্যও কেজির পাশাপাশি পাউন্ড ব্যবহার হতো তবে আজকাল সেটি তুলনামূলকভবে কম। দৈর্ঘ্যের বেলাতে আমরা কম কিংবা বেশি দূরত্ব বোঝানোর জন্য সেন্টিমিটার বা কিলোমিটার ব্যবহার করেছি, ভরের বেলাতেও তাই। কম ভরের বেলায় আমরা গ্রাম (g) ব্যবহার করি যেটা কিলোগ্রামের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। তার চাইতেও কম ভর মাপার জন্য আমরা মিলিগ্রাম (mg) ব্যবহার করি যেটা গ্রামের ১০০০ ভাগের এক ভাগ। তোমরা ঔষধের ট্যাবলেটে দেখবে সেখানকার সক্রিয় উপাদানটির পরিমাণ সবসময় mg -এ দেওয়া থাকে।

সময়

যতগুলো রাশি আছে তার মধ্যে সময় রাশিটি নিশ্চয়ই আমাদের পরিচিত রাশি। এর মূল এককটি নিয়ে পৃথিবীতে কোনো বিভাজন নেই। সবাই সেকেন্ডকে (s) সময়ের একক হিসাবে মেনে নিয়েছে। খাঁটি বিজ্ঞানের বেলায় এক সেকেন্ড ব্যাখ্যা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরমাণুর নির্দিষ্ট সংখ্যক কম্পনের সময়কে ধরে নিলেও আমরা মুখে 'এক হাজার এক' কথাটি উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে এক সেকেন্ড হিসেবে অনুভব করতে পারি। দৈর্ঘ্য এবং ভরের বেলায় কিলোমিটার এবং কিলোগ্রাম থাকলেও সময়ের বেলায় কিলোসেকেন্ড নেই! তোমরা সবাই জানো ৬০ সেকেন্ডে এক মিনিট এবং ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা ধরে নেয়া হয়। তবে কিলোসেকেন্ড না থাকলেও মিলিসেকেন্ড আছে। সেটি হচ্ছে ১ সেকেন্ডের ১০০০ ভাগের এক ভাগ, তবে এই সময়টি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুভব করার জন্য বেশ ছোট।

আমাদের চারপাশে ১ সেকেন্ডের কাছাকাছি অনেক উদাহরণ আছে। আমাদের হৃদস্পন্দন সেকেন্ডে ১ বার করে হয়, কারো একটু বেশি, কারো একটু কম। আমরা চোখের পাতা ফেলি প্রতি দুই সেকেন্ডে একবার, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম। নিশ্বাস নেই প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে একবার, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম!

তাপমাত্রা

আমরা সবাই কখনো না কখনো বলেছি 'গরম লাগছে' কিংবা 'ঠান্ডা লাগছে'। আমরা এটাও জানি চা গরম এবং আইসক্রিম ঠান্ডা- গরম এবং ঠান্ডা কথাটি দিয়ে আমরা আসলে বোঝাই 'তাপমাত্রা' নামক রাশিটি তুলনামূলকভাবে বেশি বা কম। কাজেই আমরা আসলে তাপমাত্রাটি আমাদের শারীরিক অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারি, অবশ্যই যদি সেটা আমাদের সহ্য ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

তাপমাত্রার আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে কেলভিন (K), যদিও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কখনো ব্যবহার করি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা তাপমাত্রার জন্য যে এককটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে সেলসিয়াস (°C)। এই এককে পানি জমে বরফ হওয়ার তাপমাত্রা ধরা হয়েছে ০°C এবং পানি ফুটে বাষ্প হওয়ার তাপমাত্রা ধরা হয়েছে ১০০°C। তবে মজার বিষয় হচ্ছে কেলভিন এককের বেলাতেও পানি বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা এবং বরফের তাপমাত্রা পার্থক্য ১০০K।
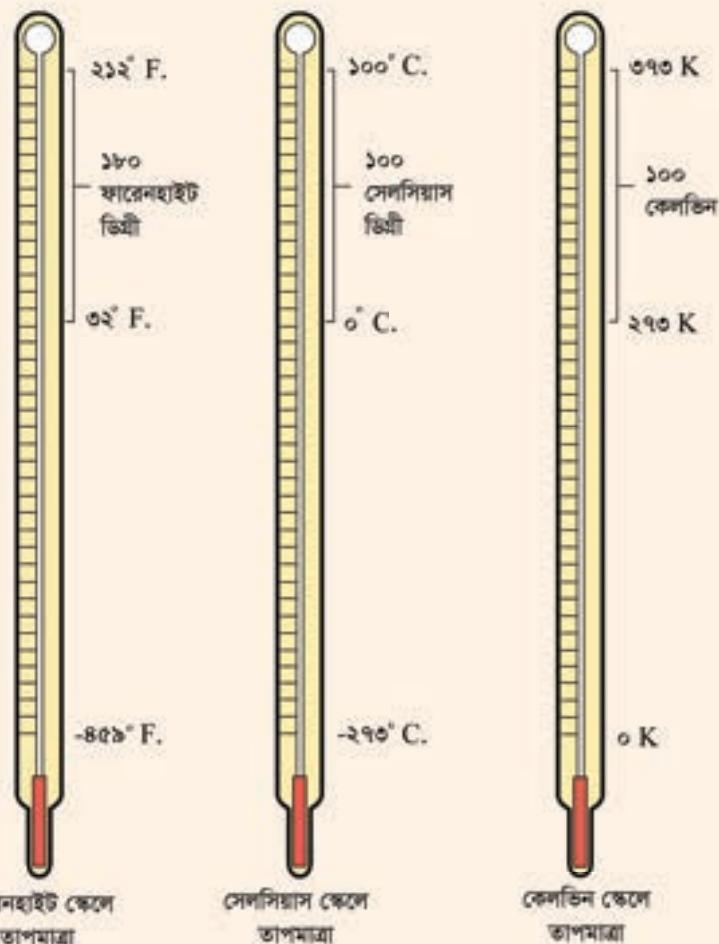
অর্থাৎ কোনো কিছুর তাপমাত্রা ১০°C বেড়ে গিয়েছে বলা যে কথা ১০K বেড়ে গিয়েছে বলা একই কথা। স্বাভাবিকভাবেই তুমি তাহলে প্রশ্ন করতে পার এই দুটি এককের মধ্যে পার্থক্য কী?

পার্থক্য হচ্ছে ২৭৩.১৫°!

অর্থাৎ সেলসিয়াস স্কেলের তাপমাত্রার সাথে ২৭৩.১৫ যোগ করলে কেলভিন স্কেল পাওয়া যায়। অর্থাৎ কেলভিন স্কেলে বরফের তাপমাত্রা হচ্ছে ০ + ২৭৩.১৫ = ২৭৩.১৫ K এবং পানি বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা হচ্ছে ১০০ + ২৭৩.১৫ = ৩৭৩.১৫ K!

স্বাভাবিকভাবেই তুমি তাহলে প্রশ্ন করবে সেলসিয়াসের এত সহজ সরল স্কেলের সাথে এই বিচিত্র একটি সংখ্যা যোগ দিয়ে কেলভিন স্কেল তৈরি করার কারণ কী?

কারণটি কিন্তু অত্যন্ত চমকপ্রদ। তুমি যে কোনো কিছুর তাপমাত্রা যত ইচ্ছা বাড়াতে পারবে, তার কোনো সীমা নেই! কিন্তু তাপমাত্রা যত ইচ্ছা কমাতে পারবে না। তাপমাত্রার একটা সর্বনিম্ন মান আছে। সত্যি কথা বলতে কী তুমি এই তাপমাত্রার কাছাকাছি যেতে পারবে কিন্তু কখনই সেই তাপমাত্রায় পৌছাতে পারবে না। এটাকে বলে পরম শূন্য তাপমাত্রা। কেলভিন স্কেলটি তৈরি করা হয়েছে এই তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রী ধরে। সেলসিয়াস স্কেলে এই তাপমাত্রা হচ্ছে -২৭৩.১৫° তাই সেলসিয়াস স্কেলের সাথে ২৭৩.১৫ যোগ দিলে কেলভিন স্কেল পাওয়া যায়।

যাই হোক, সেলসিয়াস স্কেলের পাশাপাশি ফারেনহাইট নামে আরও একটি তাপমাত্রা স্কেল কোনো কোনো দেশে এবং জ্বর মাপার থার্মোমিটারে ব্যবহার করা হয়। সেই স্কেলে বরফের তাপমাত্রা ৩২°F এবং ফুটন্ত পানির তাপমাত্রা ২১২°F। ফারেনহাইট স্কেলে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৪°F সেলসিয়াসে যেটা ৩৭°C।

মৌলিক একক এবং যৌগিক একক

আমরা দৈর্ঘ্য, ভর ,সময় এবং তাপমাত্রা এই চারটি রাশি পরিমাপ করার জন্য এককের কথা বলেছি। সেগুলো হচ্ছে মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড এবং কেলভিন। এগুলো হচ্ছে মৌলিক একক। কাজেই আমরা যদি কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য মাপি তাহলে শুধু মৌলিক একক মিটার দিয়ে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যদি একটা ঘরের ক্ষেত্রফল মাপতে চাই তাহলে সেটা মৌলিক একক মিটার দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না। ঘরটির দৈর্ঘ্য যদি ৫ মিটার এবং প্রস্থ ২ মিটার হয় তাহলে ঘরটির ক্ষেত্রফল,

ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ = ৫ মিটার × ২ মিটার = ১০ বর্গমিটার

যেহেতু এককটি 'বর্গমিটার' তাই সেটাকে আমরা বলব যৌগিক একক। ঠিক একটা গাড়ী যদি ৩ সেকেন্ডে ১৫ মিটার যায় তাহলে তার বেগ হচ্ছে

বেগ = ১৫ m / ৩ s

= ৫ m/s

প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার বা ৫ m/s।

এবারের এককটি হচ্ছে মিটার/সেকেন্ড, এটিও দুটি ভিন্ন একক দিয়ে তৈরি হয়েছে। কাজেই এটা হচ্ছে যৌগিক একক।

অনুশীলনী ?

১। তোমরা নিশ্চয়ই পিঁপড়াকে সারি বেঁধে যেতে দেখেছ। সারিটি ভেঙে দিলেও কিছুক্ষণের ভেতর পিঁপড়ারা আবার তাদের সারিটি তৈরি করে ফেলে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিটি ব্যবহার করে তোমরা কি বের করতে পারবে পিঁপড়া কীভাবে এটি করে?

২। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ছয়টি ধাপের মাঝে কোনটি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়? কেন?

৩। বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানমনস্ক এই দুইটির মাঝে পার্থক্য কী?

৪। ধরা যাক চাঁদে তুমি একটা মুদির দোকান দেবে। সেই দোকানে বেচা-কেনা করার জন্য তুমি কি দাড়িপাল্লা ব্যবহার করবে নাকি স্প্রিং ব্যালেন্স ব্যবহার করবে? কেন?

৫। লম্বা সুতা দিয়ে ছোট একটা পাথর ঝুলিয়ে সেটা দুলতে কত সময় নেয় বের করো। এখন সুতার দৈর্ঘ্য এবং পাথরের ভর বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে দোলনের সময় বের করে দেখ সেটার কি কোনো পরিবর্তন হয়?

৬। T_F = (T_C x ৯)/৫ + ৩২ তুমি এই সূত্র ব্যবহার করে সেলসিয়সে তাপমাত্রা (T_C) দেওয়া থাকলে সেটি ফারেনহাইটে (T_F) কত হবে বের করতে পারবে। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট দুই স্কেলেই তার মান সমান, সেটি কত বের করতে পারবে?

অধ্যায় ২

পদার্থ ও তার বৈশিষ্ট্য

অধ্যায় ২ পদার্থ ও তার বৈশিষ্ট্য

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ পদার্থ ও পদার্থের ধর্ম
- ☑ ভর এবং আয়তনের জ্ঞান
- ☑ ভর এবং ওজনের পার্থক্য
- ☑ ঘনত্ব, বিভিন্ন তরলের ঘনত্বের তুলনা
- ☑ ভাসা এবং ডোবা
- ☑ পদার্থের অবস্থাসমূহ: পদার্থের তিনটি অবস্থা (কঠিন, তরল, বায়বীয়) এবং তাদের বৈশিষ্ট্য
- ☑ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থার বৈশিষ্ট্য সমুহের ব্যবহার
- ☑ পদার্থের ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন

পদার্থ

পদার্থ কী?
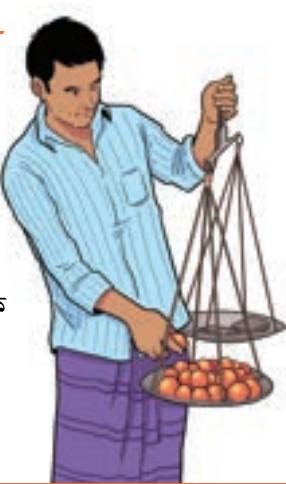
তুমি যা কিছু দেখতে পাও এবং স্পর্শ করতে পারো তার সবকিছুই পদার্থ! আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত আছে শুধু সেই জিনিসগুলোকে আমরা সাধারণত বস্তু বা পদার্থ বলে থাকি, কিন্তু আসলে মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সমস্তকিছুই পদার্থ। পরিচিত পদার্থের কিছু উদাহরণ হলো কলম, পানি, বাতাস কিংবা দুধ। শুধু যে জিনিসগুলো পদার্থ নয় সেগুলো হচ্ছে শক্তির বিভিন্ন রূপ, যেমন—আলো, তাপ, কিংবা শব্দ। পদার্থের ভর এবং আয়তন আছে। তোমাদের মনে হতে পারে বাতাসের বুঝি ভর কিংবা আয়তন নেই, কিন্তু তোমরা দেখবে আসলে বাতাসেরও ভর এবং আয়তন আছে।

ছবি: পদার্থের কিছু উদাহরণ

ভর (Mass):

ভর হলো একটি বস্তুতে পদার্থের মোট পরিমাণ। ছবিতে দেখানো দাড়িপাল্লাটি দেখে তোমরা ভর কী তা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পাবে। যদি এই দাড়িপাল্লার দুই দিক একই উচ্চতায় থাকে তবে এর অর্থ হবে যে ডান পাল্লায় থাকা টমেটোতে বাম পাল্লাতে থাকা বাটখারার সমান ভর রয়েছে। যদি বাটখারাটি ১ কেজি ভরের সমান হয়ে থাকে তাহলে টমেটোর ভরও হবে ১ কেজি। তোমরা আগের অধ্যায়েই পড়ে এসেছ যে, ভরের আন্তর্জাতিক একক হলো কিলোগ্রাম (kg)।

আয়তন (Volume):

একটি বস্তু যে পরিমাণ জায়গা দখল করে তার পরিমাপ হচ্ছে আয়তন। কোনো বস্তুর আয়তন কীভাবে পরিমাপ করা হবে তা সাধারণত ঐ পদার্থের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে, আয়তনের আন্তর্জাতিক একক হলো ঘনমিটার (m^3), কিন্তু ক্ষুদ্র আয়তন ঘন সে. মি. (cm^3 বা cc) দিয়ে পরিমাপ করা যেতে পারে। তরল পদার্থের আয়তন সাধারণত লিটারে (L) মাপা হয়। কম আয়তন হলে মিলিলিটারে (mL) পরিমাপ করা যেতে পারে। এক লিটার আসলে ১ হাজার ঘন সে.মি. আয়তনের সমান।

ঘনত্ব (Density):

ঘনত্ব বলতে মূলত একক আয়তনের মধ্যে কতটুকু ভর আছে তা বোঝায়। ভর সম্পর্কে তোমরা ইতোমধ্যেই জেনে গেছ। একটা উদাহরণ চিন্তা করা যাক! ধরো, একটা বাক্স বা স্যুটকেসে তুমি একদম ঠাসাঠাসি করে জামাকাপড় রাখলে। এখন এই বাক্সের তো একটা নির্দিষ্ট ঘনত্ব আছে। বাক্সের ভর হিসাব করে এর আয়তন দিয়ে ভরকে ভাগ করলে যা আসবে সেটাই হলো এই বাক্সের ঘনত্ব। এখন যদি বাক্স থেকে দু-তিনটা জামা বের করে নাও, বাক্সের ভর তো একটু কমে যাবে, তাই না? কিন্তু বাক্সের আয়তন তো আর পাল্টাচ্ছে না। কাজেই এখন যদি আবার এর আয়তন দিয়ে ভরকে ভাগ করা হয় ঘনত্ব আগের হিসেবের চেয়ে কম আসবে। অর্থাৎ, বাক্সের ঘনত্ব আগের চেয়ে কম!

তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে? যত কম জায়গায় বস্তুর যত বেশি পরিমাণ ভর থাকবে সেটি তত বেশি ঘন। কাজেই বলা যায়, ঘনত্ব বস্তুর একটি ভৌত ধর্ম যেটা তার ভর এবং আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে। যেহেতু প্রত্যেক বস্তুরই আলাদা আলাদা ঘনত্ব রয়েছে, সেজন্য ঘনত্বের মাধ্যমে অনেক বস্তুকে শনাক্ত করা যায়। তুমি এক টুকরা লোহা হাতে নিলে সেটা বেশ ভারী মনে হবে, কিন্তু সমান আয়তনের এক টুকরা কাঠ হাতে নিলে সেটাকে এত ভারী মনে হবে না। তার কারণ লোহার ঘনত্ব বেশি এবং কাঠের ঘনত্ব কম।

সাধারণভাবে, কঠিন পদার্থ তরল পদার্থ থেকে বেশি ঘন এবং তরল পদার্থ গ্যাসীয় পদার্থের চেয়ে বেশি ঘন। এর কারণ হলো কঠিন পদার্থের কণাগুলো একে অপরের অনেক কাছাকাছি থাকে, অপরদিকে

তরল পদার্থের কণাগুলি একে অপরের চারপাশে চলাচল করতে পারে, আবার গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে কণাগুলি যত বড় জায়গাই দেয়া হোক, পুরো জায়গা জুড়েই চলাচলের জন্য মুক্ত থাকে।

তুমি যদি কোনো বস্তুর ভর এবং তার আয়তন জানো তাহলে ভরকে আয়তন দিয়ে ভাগ দিয়ে বস্তুর ঘনত্ব বের করতে পারবে। অন্যভাবে বলা যায় বস্তুর ঘনত্ব হচ্ছে এক ঘন সেন্টিমিটার (cm^3 বা cc) আয়তনের ভরের সমান।

ঘনত্বের একক হলো গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটার, যা g/cm^3 কিংবা g/cc আকারেও লেখা হয়। লোহার ঘনত্ব ৭.৮ গ্রাম/ ঘন সে.মি. (g/cm^3)। এর অর্থ হলো প্রতি ঘন সেন্টিমিটার লোহার ভর ৭.৮ গ্রাম (g)।

তোমরা যদি কোনো বস্তুর ভর (m) ও আয়তন (V) জেনে থাকো, তাহলে নিচের সমীকরণের সাহায্যে বস্তুর ঘনত্ব (ρ) বের করতে পারবে।

$$\rho = m/V$$

বস্তুর ভর m, গ্রামে (g) এবং বস্তুর আয়তন V ঘন সেন্টিমিটারে (cm^3) লেখা হলে বস্তুর ঘনত্ব ρ বের হবে g/cm^3 এককে।
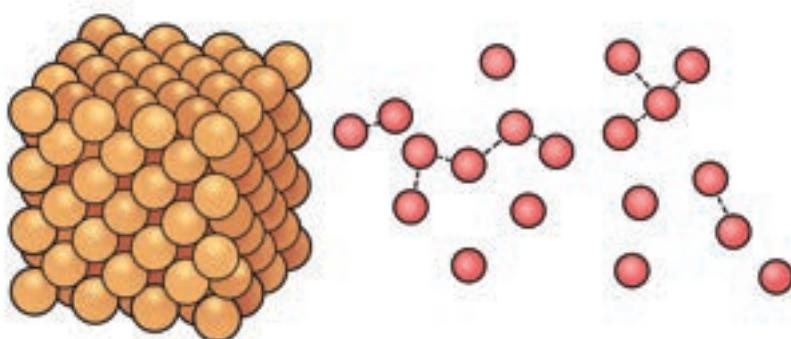
যদি একটি আম গাছের গুড়ির আয়তন হয় ২৫০০ ঘন সে. মি. (cm^3) এবং ভর ১৫০০ গ্রাম (g), তাহলে, আম গাছের কাঠের ঘনত্ব হবে = ১৫০০ গ্রাম (g) / ২৫০০ ঘন সে.মি. (cm^3) = ০.৬ গ্রাম/ ঘন সে.মি. (g/cm^3)।

কোনো বস্তুর ঘনত্ব দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

- ☑ বস্তুটি যে পরমাণু বা অণু দিয়ে তৈরি তার ভর
- ☑ বস্তু কতটা ঘনভাবে সন্নিবেশিত তার উপর

উদাহরণস্বরূপ, সোনার পরমাণুর ভর অনেক বেশি এবং ঘনভাবে সন্নিবেশিত পরমাণু দিয়ে গঠিত, তাই সোনার ঘনত্ব বেশি। আবার আমরা জানি গ্যাসের অণুগুলো, পুরো আয়তন দখলের জন্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এতে অণুগুলোর মধ্যে প্রচুর খালি জায়গা থাকে, তাই গ্যাসের ঘনত্ব কম।

ছবি: সোনা এবং গ্যাসের গঠন

ছবি: বিভিন্ন তরলের ঘনত্বের তুলনা

নিম্নে বিভিন্ন পদার্থের ঘনত্বের তুলনা করা হলো-

পদার্থ	ঘনত্ব (g/cm^3)	পদার্থ	ঘনত্ব (g/cm^3)
বায়ু	০.০০১২৯	পানি	১.০০
কর্ক	০.২৫	লোহা	৭.৮০
গ্লিসারিন	১. ২৬	রুপা	১০.৫০
বরফ	০.৯২	সোনা	১৯.৩০
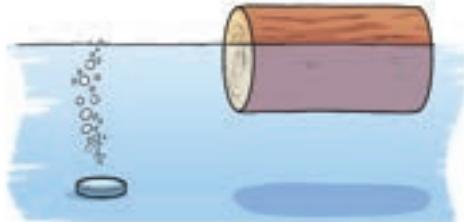
ছক: কয়েকটি পদার্থ ও তাদের ঘনত্ব

ভাসা ও ডোবা

ভাসা ও ডোবা ধাঁধার মতো হতে পারে-

? কেন একটি হালকা অ্যালুমিনিয়ামের কয়েন পানিতে ডুবে যায়?

? কেন একটি ভারি আম কাঠের গুড়ি পানিতে ভাসে?

তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ যে, একটা বস্তুর ভাসা ও ডোবা সেই বস্তুটির ভরের উপর নির্ভর করে না, তার ঘনত্বের উপর নির্ভর করে। এলুমিনিয়ামের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে বেশি যার কারণে সেটি পানিতে ডুবে যায় এবং কাঠের গুড়িটির ঘনত্ব পানির চেয়ে কম হওয়ায় সেটি ভাসে।

মজার তথ্য

» সমুদ্রের পানি সাধারণ পানির চেয়ে বেশি ঘন। যার কারণে পুকুরের চেয়ে সমুদ্রে ভেসে থাকা সহজ!

» মধ্যপ্রাচ্যের ডেড সি নামে সমুদ্রের পানির ঘনত্ব এত বেশি যে সেখানে সাঁতার না কেটেই ভেসে থাকা যায়!

অনুশীলনী ?

১। কোনো বস্তুর ঘনত্ব ১ গ্রাম/ ঘন সে .মি. (g/cm^3) বলতে কী বোঝ?

২। কারণ লেখো: উত্তপ্ত বাতাসের বেলুন কীভাবে কাজ করে ?
(সুত্র: উত্তপ্ত বাতাসের ঘনত্ব শীতল বাতাসের চেয়ে আলাদা। যে কারণে উত্তপ্ত বেলুন উড়তে শুরু করে।)

পদার্থের অবস্থাসমূহ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা ধরনের পদার্থ ব্যবহার করি। যেমন শুধু রান্না করার জন্য কখনো মাটির চুলায় কাঠ ব্যবহার করা হয়, কেরোসিনের চুলায় কেরোসিন ব্যবহার করা হয়, আবার গ্যাসের চুলায় গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তোমরা দেখতেই পাচ্ছো,

- ☑ আগুন জ্বালানোর কাঠ একটি কঠিন পদার্থ।
- ☑ পানি একটি তরল পদার্থ।
- ☑ এল. পি. গ্যাস একটি গ্যাসীয় পদার্থ।

অর্থাৎ সহজভাবে আমরা বলতে পারি পদার্থের তিনটি অবস্থা হচ্ছে, কঠিন, তরল এবং বায়বীয়।

কঠিন অবস্থা এবং কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্য

তোমরা তোমাদের চারপাশে নানা রকম কঠিন পদার্থ দেখেছ, কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ একটি কঠিন বস্তুর আয়তনের পরিবর্তন হয় না এবং তার আকারেরও পরিবর্তন হয় না। যেহেতু বস্তুটি কঠিন তাই তার আকারের পরিবর্তন করতে হলে সেটার উপর নানা ধরনের কাজ করতে হয়।

ছবি: কঠিন পদার্থের উদাহরণ

তরল অবস্থা এবং তরলের বৈশিষ্ট্য

ছবি: তরল পদার্থের উদাহরণ

তোমরা সবাই তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে পানি, তেল কিংবা দুধের মতো তরল পদার্থ ব্যবহার করেছ। নিশ্চয়ই জেনে গেছ যে, তরল পদার্থের আয়তন পরিবর্তন না হলেও তার কিন্তু কঠিন পদার্থের মতো নিজের নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। তাকে যখন যে পাত্রে রাখা হয় তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে।

গ্যাসীয় অবস্থা এবং গ্যাসের বৈশিষ্ট্য

আমাদের চারপাশে বাতাস সেই বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেই। অনেক গাড়ি প্রাকৃতিক গ্যাস বা সিএনজিতে চালানো হয়। কেতলিতে পানি ফুটানো হলে সেখান থেকে বাষ্প বের হয়। এইসবই হচ্ছে বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থের উদাহরণ। কঠিন এবং তরল দুই ধরনের পদার্থেরই আয়তন নির্দিষ্ট থকে কিন্তু গ্যাসের জন্য সেটা সত্যি নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস একটা ছোট পাত্রে রাখা হলে সেটি সাথে সাথে

ছবি: বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থের উদাহরণ

সারা পাত্রে ছড়িয়ে পড়ে, তার আয়তন হয় পাত্রটির সমান। আবার সেই একই পরিমাণ গ্যাস একটি বড় পাত্রে রাখা হলে সেটি সাথে সাথে পুরো বড় পাত্রে ছড়িয়ে পড়বে, তার আয়তন হবে বড় পাত্রের সমান।

কঠিন, তরল ও গ্যাসের ব্যবহার

কঠিন, তরল, এবং গ্যাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলাদা হওয়ায় তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

কঠিন পদার্থের কিছু ব্যবহার

কঠিন পদার্থসমূহ দৃঢ় হওয়ায় এদের আকৃতি সবসময় একই থাকে। যার ফলে এদেরকে বাড়িঘর, যন্ত্রপাতি, জাহাজ নৌকা ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

ছবি: একটি ঘর ও একটি নৌকা, যা নির্মাণে কঠিন পদার্থসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে।

তরল পদার্থের ব্যবহার

তরল পদার্থ যেমন পানি এবং তেল আমাদের প্রত্যহ জীবনে খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পানি সাধারণত তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। দিঘি, নদী, পুকুর, খাল, নালা, সমুদ্রে তরল পানি দেখতে পাওয়া যায়। তেল মোটর গাড়ির জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ছবি: মোটর গাড়ির জ্বালানি হিসাবে তেল ব্যবহার করা হয়।

গ্যাসীয় পদার্থের ব্যবহার

গ্যাসসমূহকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন, অক্সিজেন গ্যাস চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়। নাইট্রোজেন গ্যাস আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বাতাসের সাহায্যে ফুটবল ফুলানোও গ্যাসেরই একটি ব্যবহার।

ছবি: অগ্নিনির্বাপক নাইট্রোজেন সিলিন্ডার এবং বাতাসের সাহায্যে ফুটবল ফুলানো।

পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন

স্বাভাবিকভাবেই প্রাকৃতিক উপায়ে অনেক পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয়, আবার আমরা আমাদের প্রয়োজনে কৃত্রিম উপায়ে পদার্থের পরিবর্তন করি। পদার্থের পরিবর্তন দুই প্রকার: ভৌত পরিবর্তন এবং রাসায়নিক পরিবর্তন। নাম শুনেই বুঝতে পারছ, ভৌত পরিবর্তন একটি পদার্থের ভৌত বা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে এবং একটি রাসায়নিক পরিবর্তন তার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে। কিছু কিছু ভৌত পরিবর্তন উভমুখী হয় যেমন, কোনো বস্তুকে গরম করে উত্তপ্ত করে রাখা আবার শীতল করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। রাসায়নিক পরিবর্তনগুলি কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে উভমুখী হলেও সাধারণত একমুখী হয়ে থাকে।

ভৌত পরিবর্তন

একটি ভৌত পরিবর্তন একটি পদার্থকে মৌলিকভাবে ভিন্ন পদার্থে পরিণত করে না। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ফলের রস মিশ্রণ তৈরি করার পদ্ধতিতে দুটি বাহ্যিক পরিবর্তন জড়িত: তা হলো প্রতিটি ফলের আকৃতির পরিবর্তন এবং ফলের বিভিন্ন টুকরো একসাথে মিশ্রিত হওয়া। কারণ ফলগুলির উপাদানগুলোর মিশ্রণের সময় কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পানি এবং ফলের ভিটামিন অপরিবর্তিত থাকে।

ছবি: দোমড়ানো, বরফ গলানো, পানি ফুটানো, পানি ও বালি মেশানো, কাচ ভাঙা ইত্যাদি ভৌত পরিবর্তনের উদাহরণ

কাটা, ছিঁড়ে ফেলা, পিষে ফেলা এবং মিশ্রিত করা হলো ভৌত পরিবর্তন কারণ এগুলোতে আকার পরিবর্তন হয় কিন্তু কোনো উপাদানের গঠন পরিবর্তিত হয়না। উদাহরণস্বরূপ, চিনি এবং পানির মিশ্রণ একটি নতুন পদার্থ তৈরি করে এদের কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ছাড়াই।

রাসায়নিক পরিবর্তন

রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে একটি পদার্থ তার উপাদানগুলির গঠনের পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে নতুন একটি পদার্থে পরিবর্তিত হয়। রাসায়নিক পরিবর্তন রাসায়নিক বিক্রিয়া হিসেবেও পরিচিত।

ছবি: কাঠ পোড়ানো, ফল পচে যাওয়া, মরিচা পড়া, ব্যাটারির ব্যবহার, খাবার হজম হওয়া, দুধ টকে যাওয়া, রান্না করা, সালোকসংশ্লেষণ ইত্যাদি রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ

পচানো, পোড়ানো, রান্না করা এবং মরিচা ধরা হলো আরও কিছু ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন। কারণ তারা এমন পদার্থ তৈরি করে যা সম্পূর্ণ নতুন রাসায়নিক পদার্থ। উদাহরণস্বরূপ, কাঠ পোড়ালে ছাই, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানিতে পরিণত হয়।

অধ্যায় ৩

জীবজগৎ

অধ্যায় ৩ জীবজগৎ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ জীবজগতের বৈচিত্র
- ☑ জীবের ক্ষুদ্রতম একক কোষ এবং তার গঠন
- ☑ জীবের শ্রেণিবিন্যাস

কোষ

কখনো কী তোমার হাতের আঙ্গুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ভেবেছ এগুলো কী দিয়ে তৈরি? অথবা ওই যে স্কুলের আঙিনায় বড় গাছটি, কিংবা পরিচিত পুকুর বা ড্রইংরুমের এ্যাকুরিয়ামের মাছগুলো—এরাই বা কীভাবে তৈরি হলো এমন আকার আর আকৃতিতে?

আমাদের চারপাশের যা কিছু দেখি তাদের মধ্যে যাদের জীবন আছে তারাই বিজ্ঞানের পরিভাষায় জীব হিসেবে পরিচিত। সব জীবকে আমরা দেখতে পাই না। উপরে যাদের কথা বললাম—তাদেরকে আমরা খালি চোখেই দেখি। আর কেউ কেউ আছে যাদেরকে আমরা খালি চোখে দেখি না। এদেরকে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। একটু পরেই আমরা এই যন্ত্র সম্বন্ধে জানবো।

তোমার স্কুলের ভবনটির কথা ভাবো। একতলা হোক বা পাঁচতলা, এই ভবনটি কিন্তু তৈরি হয়েছে একের পর এক ইট গেঁথে। তাই ইটগুলোকে আমরা বলতে পারি ভবন তৈরির একক। ঠিক এমনিভাবে আমাদের জানা অজানা যত ছোট ও বড় জীব আছে তাদেরও গঠনের মূলে রয়েছে কিছু গাঠনিক একক। তোমার সম্পূর্ণ শরীর, প্রিয় পোষা প্রাণী কিংবা মাঠের গাছ সবকিছুর গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ওই এককসমূহ।

বিজ্ঞানের ভাষায় জীবের গঠনের এই এককগুলোকে বলা হয় কোষ (Cell)। আমরা এ সম্বন্ধে আরো কিছু বিষয় জেনে নেবো এই অধ্যায়ে।

কোষ: জীবের আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্রতম একক যা জীবদেহের গঠন ও কাজে যুক্ত থাকে তাকেই কোষ বলা হয়।

অনেক জীব আছে যারা কেবল একটি কোষ নিয়েই গঠিত। এদেরকে আমরা বলি এককোষী জীব। এককোষী (Unicellular) জীবদেহের সমস্ত জৈবিক কাজ একটি কোষের মধ্যেই হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়া (একবচনে Bacterium এবং বহুবচনে Bacteria) এবং প্রোটোজোয়া (Protozoa) এককোষী জীবের উদাহরণ। এককোষী জীব হলো সরলতম জীব।

আর একটু আগে যে বড় বড় জীবের উদাহরণ তোমরা দেখেছিলে (মাছ, গাছ, মানুষ), এরা তৈরি হয় বহু কোটি কোষ দিয়ে। তাই এদেরকে বলা হয় বহুকোষী (Multicellular) জীব।
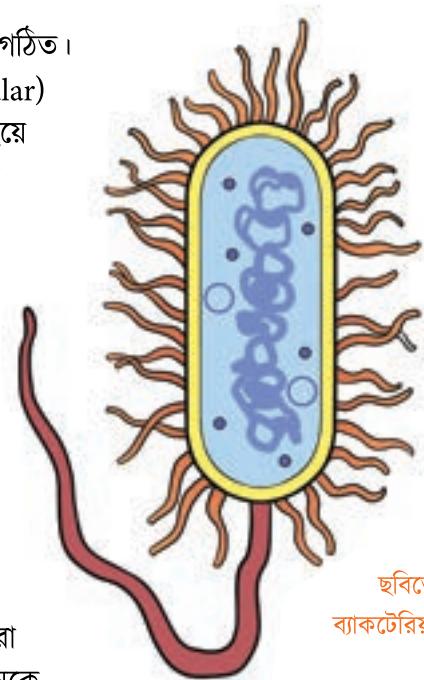
কোষ সম্বন্ধে আমাদের এই যে ধারণা, তা কিন্তু খুব বেশি আগে জানা ছিলো না।

ছবিতে ব্যাকটেরিয়া

চারপাশের নানান জীব কী দিয়ে, কীভাবে গঠিত হয়, বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে এই প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করেছেন। জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করার জন্য একটি উপায় বের করার জন্য বহু বিজ্ঞানী প্রচেষ্টা চালান । এভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয় মাইক্রোস্কোপ (Microscope) তথা অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এর ফলে খালি চোখে দেখা যায় না এমন অত্যন্ত ছোট জীবকেও অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে দেখার সুযোগ তৈরি হয়। ষোড়শ শতাব্দীর সেই প্রথম দিককার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে আজকের যুগের যন্ত্রগুলো অনেক উন্নত ধরনের এবং দিনদিন জীবজগতের নতুন সব রহস্য উদ্ঘাটন করছে। ক্ষুদ্রতম ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বৃহত্তম বট গাছ বা অতিকায় নীল তিমি পর্যন্ত সমস্ত জীবদেহের গঠন ও জৈবিক কাজের মূলে রয়েছে কোষ। মানব দেহ প্রায় ৩৭ ট্রিলিয়ন (সাইত্রিশ লক্ষ কোটি বা ৩৭,০০০,০০০,০০০,০০০) সংখ্যক কোষ দিয়ে তৈরি।

বৃহদাকার জীবদেহও ছোট আকারের অসংখ্য কোষ থাকে। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তুমি যদি বিভিন্ন কোষের দিকে তাকাও, দেখতে পাবে যে বিভিন্ন কোষের আকৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে। কিছু কোষ লম্বাকৃতির, কিছু দেখতে গোলাকার কিংবা দণ্ডাকার, আবার কিছু দেখতে হয়তো ব্যাঙাচির মতো। কিছু কোষ আছে যার কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নেই, অর্থাৎ এদের আকৃতি পরিবর্তনশীল।

জীব জগতের অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। জীবের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তিক বিভিন্ন কাজে কোষগুলো যুক্ত থাকে। কাজের উপর ভিত্তি করে বহুকোষী জীবে কোষের আকৃতি নানা রকমের হয়ে থাকে। বহুকোষী একটি জীবের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সব ধরনের কোষেরই সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, একটি জীবদেহে সকল কোষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

বহুকোষী জীবগুলোও কিন্তু একটি কোষ থেকেই তৈরি হয়। যেমন- একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের যে ৩৭ ট্রিলিয়ন কোষ, তাদের শুরু কিন্তু হয়েছিল একটিমাত্র কোষ থেকে—যার নাম অবিভক্ত বা আদি ভ্রূণ কোষ বা জাইগোট (Zygote)। এই একটি জাইগোট কীভাবে শেষ পর্যন্ত ট্রিলিয়ন কোষের বিরাট

সংখ্যায় পরিণত হলো? এর উত্তর জানা যাবে কোষের বিভাজন প্রক্রিয়ার বিষয়টি জানলে।

বহুকোষী জীবের একটি পরিণত দেহকোষ এক পর্যায়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি কোষ তার জেনেটিক উপাদানসহ সমস্ত উপাদান দ্বিগুণ করে দুটি অভিন্ন কোষ গঠনের জন্য বিভক্ত হয় । প্রতিটি ভাগেই সকল উপাদান সমানভাবে চলে আসে। কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি কোষ থেকে দুইটি, দুইটি কোষ থেকে চারটি, চারটি কোষ থেকে আটটি, আটটি কোষ থেকে ষোলটি—এভাবে নতুন নতুন কোষ তৈরি হয়। এভাবে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবের শরীরের বৃদ্ধি ঘটে।
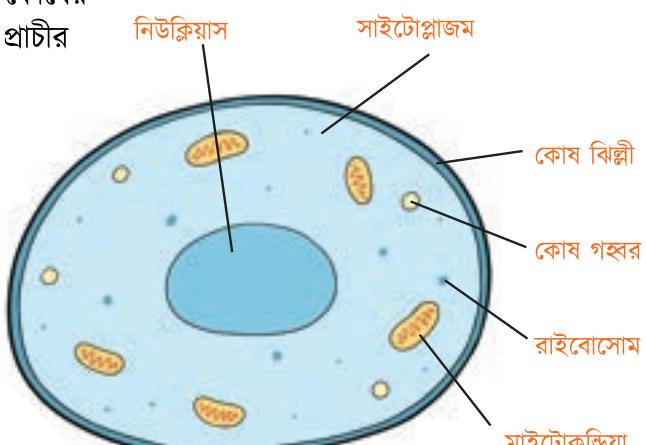
ধরো, তোমার দেহে এখন ২০ ট্রিলিয়ন (বিশ লক্ষ কোটি, অর্থাৎ ২×১০^{১৩}) কোষ আছে। সবসময় কিন্তু এত কোষ তোমার দেহে ছিল না। আমরা প্রত্যেকেই একটি কোষ হিসাবে জীবন শুরু করেছি। সেই কোষটি বিভাজিত হয়েছে, আকার-আকৃতিতে বেড়েছে, এবং এক সময় আবার বিভাজিত হয়েছে। আমরা সেই শিশুকাল থেকে বড় হয়ে আজকের অবস্থায় এসেছি কারণ আমাদের কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হয়েছে।
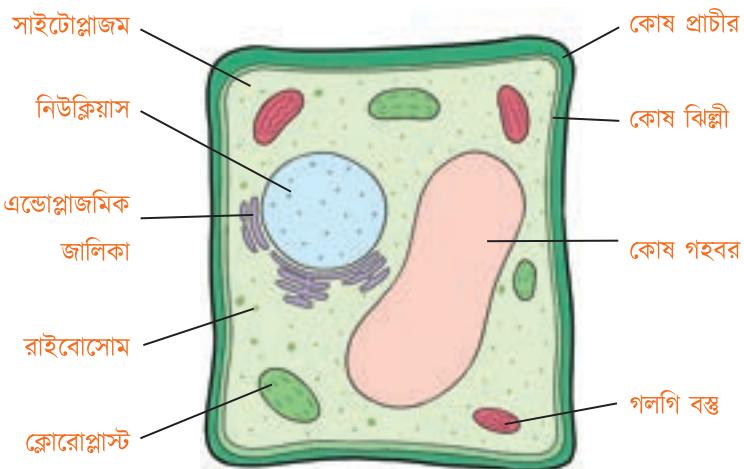
প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের তিনটি প্রধান কাঠামো রয়েছে: নিউক্লিয়াস (Nucleus), কোষ ঝিল্লি (Cell or plasma membrane) এবং সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)। এর ব্যতিক্রম হলো ব্যাকটেরিয়া কোষ, যার কোনো সংগঠিত নিউক্লিয়াস নেই। নিউক্লিয়াস সাধারণত গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির হয়। এটি কোষের কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত। নিউক্লিয়াস একটি কোষের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। আমাদের দেহের মস্তিষ্ক যেমন সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ধারণ করে, নিউক্লিয়াসও তেমনি কোষের সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু। কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ সমস্ত জৈবিক কাজ পরিচালনার তথ্য নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকা ডি এন এ (DNA)- এর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। নিউক্লিয়াসের নিজস্ব ঝিল্লি বা আবরণ (Nuclear membrane) আছে, যা একে সাইটোপ্লাজম থেকে আলাদা করে। কোষঝিল্লি কোষকে ঘিরে রাখে এবং কোষের ভিতরে ও বাইরের বিভিন্ন পদার্থের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদ কোষের কোষঝিল্লিটি চারদিকে একটি কোষ প্রাচীর দ্বারা ঘেরা থাকে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের সাইটোপ্লাজমকে ঘিরে একটি প্রতিরক্ষামূলক আবরণ থাকে। একে কোষঝিল্লি বলা হয়। কোষঝিল্লি নমনীয় হয়। তবে উদ্ভিদ কোষে কিন্তু এই ঝিল্লিটির চারদিকে আরো একটি তুলনামূলক শক্ত আবরণ থাকে। একে কোষপ্রাচীর (Cell wall)

ছবি: প্রাণীকোষ

বলা হয়। কোষ প্রাচীরের জন্যই উদ্ভিদ কোষ তুলনামূলকভাবে একটু শক্ত হয়ে থাকে। কোষ প্রাচীর উদ্ভিদ কোষকে আকৃতিও প্রদান করে। প্রাণীকোষে কোনো কোষ প্রাচীর থাকে না। উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের একটি প্রধান উপাদান হলো সেলুলোজ (Cellulose)। সেলুলোজ একটি নির্জীব উপাদান যা কোষকে রক্ষা করে এবং আকৃতি প্রদান করে। কাঠের প্রধান উপাদান হলো সেলুলোজ। শুধু উদ্ভিদ কোষেই সেলুলোজ থাকে। প্রাণীকোষে কোনো সেলুলোজ থাকে না।

ছবি: উদ্ভিদকোষ

আমরা শুরুর দিকে কোষের বিভিন্ন আকার আকৃতি নিয়ে কথা বলেছি। কোষ কীভাবে তার আকৃতি ঠিক রাখে? এই প্রশ্নের উত্তরের আগে আগে তোমাদের মনে করিয়ে দিই—আমাদের দেখা প্রাণীদের গঠন এবং আকৃতির পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে তাদের কঙ্কাল । যেমন—মানবদেহে কঙ্কাল না থাকলে এমন সুনির্দিষ্ট গঠন থাকতো না। আবার, কিছু প্রাণীতে দেহের বাইরে একটি শক্ত খোলস থাকে, যেমন—গলদা চিংড়ি। এই খোলসও প্রাণীর আকৃতি প্রদানে ভূমিকা রাখে।

আমাদের অভ্যন্তরীণ কঙ্কাল আমাদের সুনির্দিষ্ট আকৃতি দেয় এবং অঙ্গগুলিকে সঠিক জায়গায় রাখতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন কোষের আকৃতি এবং তাদের অঙ্গাণু ঠিক রাখতে তাদের সাইটোপ্লাজমের ভেতরে আণুবীক্ষণিক নলের মতোন গঠন দেখা যায়। এদের মাইক্রোটিবিউল বলে।

আমাদের যেমন বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি কোষেরও নানা উপাদান গ্রহণ করতে হয়। আবার ঠিক আমাদের মতোই কোষের বর্জ্য ও বিষাক্ত পদার্থগুলিকে দূর করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের কোষ বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। এসব কোষের আকার-আকৃতি তাদের কাজের ধরনের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ কোষে কোষ-গহ্বর নামক বড় ফাঁকা জায়গা থাকে যেখানে পানি, বর্জ্য ও খাদ্য সঞ্চিত থাকে। এটি উদ্ভিদকে সোজা দণ্ডায়মান রাখতে সাহায্য করে। কোষ-গহ্বরে পানিশূন্যতা হলে উদ্ভিদ নেতিয়ে পরে।

বহুকোষী জীবে কোষগুলো কিন্তু একা একা কাজ করে না। বরং প্রায়ই এক গুচ্ছ কোষ একটি নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে। এমন কোষগুচ্ছ যারা দেখতে একই রকম এবং একই কাজে অংশগ্রহণ করে,

তাদেরকে টিস্যু বা কলা বলা হয় । কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন টিস্যুর নামকরণ করা হয়। যেমন: প্রাণীদেহে পেশী, ত্বক, হাড়, রক্ত এবং স্নায়ু হলো বিভিন্ন ধরনের টিস্যু। এরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত এবং এসব কোষ জীবদেহের কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে যুক্ত থাকে।

এককোষী জীব কাজের দিক দিয়ে অনেকটাই বড় বহুকোষী জীবের মতোন হয়। প্রতিটি কোষেই এমন সব গঠন থাকে যা একটি সম্পূর্ণ জীবকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

জীবের বৈশিষ্ট্য

পৃথিবী একটি প্রাণবন্ত গ্রহ। এখানে এমন সব জায়গায় জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় যা কল্পনারও অতীত। সাগরের তলদেশের গরম আগ্নেয়গিরি মুখ থেকে শুরু করে অ্যাসিড পূর্ণ উষ্ণ ঝর্ণা থেকেও অতিক্ষুদ্র জীব পাওয়া যেতে পারে। কিছু কাল আগে বিজ্ঞানীরা অ্যান্টার্কটিকায় ২০ বছর ধরে শুষ্ক নদীর নিচে বেঁচে থাকা অণুজীবের সন্ধান পান। যখন সেখানে পানি পৌঁছায়, মাত্র একদিনের মাথায় সেগুলোতে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের সম্পূর্ণ একটি সম্প্রদায় তৈরি হয়ে যায়! তখন গবেষকদের মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি মঙ্গল গ্রহের শুষ্ক, শীতল পৃষ্ঠেও এমন জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারে!

এই ছোট তথ্যগুলো থেকেই বোঝা যায়, জীববিজ্ঞান একটি আকর্ষণীয় এবং কখনও কখনও আশ্চর্যজনক বিষয়।
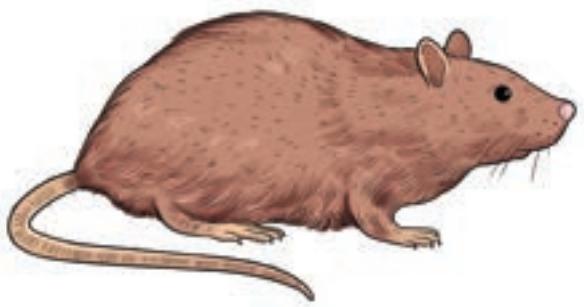
আমাদের চারপাশে যে জীবগুলো দেখি কিংবা যাদেরকে আমরা দেখতেই পাই না এদেরকে আমরা তিনটি ভাগে আলোচনা করতে পারি—উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব। এদের সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই আরো বিশদভাবে জানব। তবে তার আগে আমরা জেনে নেব জীবের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে। জীব, হোক না উদ্ভিদ, প্রাণী কিংবা অণুজীব, তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়—

শক্তি অর্জন এবং ব্যবহার

প্রতিটি জীবেরই তাদের জৈবিক-ক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য শক্তি প্রয়োজন। উদ্ভিদ সূর্যালোক থেকে শক্তি শোষণ করে এবং সেটাকে খাদ্যে রূপান্তর করে। আবার, প্রাণীরা শক্তি গ্রহণ করে উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীব থেকে ।

প্রজনন
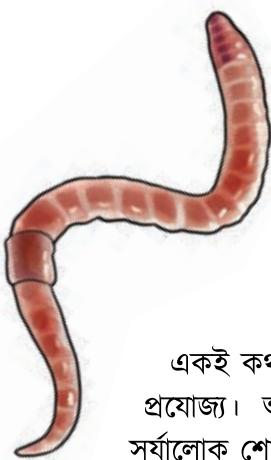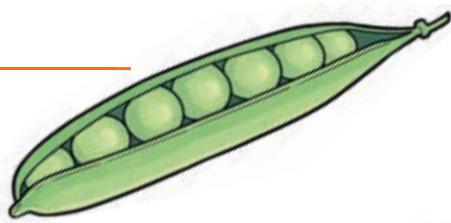
জীব নিজের বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। অনেক বহুকোষী জীব, যেমন এই ইঁদুরটির জন্মের জন্য পিতা এবং মাতার প্রয়োজন। বাবা-মা দুজনের প্রত্যেকেই একটি করে বিশেষ কোষ প্রদান করে। বিশেষ কোষ দুটি একত্রিত হয়ে

একটি নতুন কোষ গঠন করে। পরবর্তী সময়ে এই কোষটিই পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে একটি নতুন প্রাণীতে পরিণত হয়।

বৃদ্ধি এবং বিকাশ

ছবির মটরশুঁটির মতো অঙ্কুরোদ্গম ও বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি বীজ পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হয়। প্রতিটি জীবের একটি সুনির্দিষ্ট জীবন চক্র রয়েছে যা তার আকার, আকৃতি, চলন ক্ষমতা এবং খাদ্যগ্রহণের ধরনে পরিবর্তন আনে।

পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া

সরল জীবগুলোও পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল। কখনো দেখেছ একটি কেঁচোকে স্পর্শ করা হলে সেটা কেমন তার দেহটাকে গুটিয়ে নেয়?

একই কথা লজ্জাবতী উদ্ভিদের পাতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আবার কিছু উদ্ভিদ, যেমন সূর্যমুখী, বেশি সূর্যালোক শোষণের জন্য সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে।

জীবের শ্রেণিবিন্যাস

এই পৃথিবীকে ঠিক কত সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জীব রয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে বিজ্ঞানীরা সর্বশেষ যে অনুমান করছেন তাতে এই সংখ্যা প্রায় ৮.৭ মিলিয়ন বা ৮৭ লক্ষ।

এই বিপুল সংখ্যক ভিন্ন জীবকে আমরা কীভাবে চিনব এবং জানব? এই চিন্তা অনেককেই ভাবিত করেছিলো। এর একটি সমাধান দিয়েছিলেন সুইডিশ উদ্ভিদবিদ ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus, যিনি Carl Linnaeu নামেও পরিচিত (১৭০৭—১৭৭৮)। তিনি জীবের নাম ও শ্রেণিকরণের একটি পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। তিনি জীবকে বিভক্ত করেছিলেন তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। এই পদ্ধতিটি আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে জীবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শ্রেণিকরণ বা শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে ‘প্রজাতি’ (species), যেখানে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের জীবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রজাতি বলতে বুঝায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক মিলসম্পন্ন জীবসমূহকে, যারা নিজেদের মধ্যে প্রজননের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম, যারা পরবর্তী সময়ে

নিজেরাও তাদের মতো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সন্তান জন্ম দিতে পারে। একই ধরনের প্রজাতিগুলিকে একত্রিত করা হয় আরেকটি এককে—যাকে বলা হয় 'গণ' (genus)। এরই ধারাবাহিকতায় একই ধরনের 'গণ'গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় 'গোত্র' (family)-তে । যেমন ধরো- কুকুর, নেকড়ে, শিয়াল একই গণ-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারা আলাদা প্রজাতি। গোত্র হচ্ছে গণ-এর উপরের ধাপ এবং গোত্রের ভেতরে, গণের তুলনায় জীবের মাঝে কম সাদৃশ্য দেখা যায়। একই বৈশিষ্টের অধিকারী গোত্রগুলিকে 'বর্গ' (order) এর অন্তর্গত করা হয়। যেমন- কুকুর Carnivora বর্গের প্রাণী। কুকুর, নেকড়ে, শিয়াল সমগোত্রীয় এবং এদেরকে যে বর্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বিড়াল, বেজী ও ভাল্লুকও একই বর্গভুক্ত। সমবর্গের জীবগুলোকে একত্রিত করা হয় আরেকটি এককে যার নাম 'শ্রেণি' (class)। Carnivora বর্গটি এমন একটি শ্রেণির অংশ যেখানে বাদুড়, শিম্পাঞ্জি এবং তিমির মত প্রাণীরাও অন্তর্ভুক্ত। অনেকগুলো শ্রেণি একটি 'পর্ব' (phylum) গঠন করে। এই ধাপে, কুকুর, পাখি, সাপ, ব্যাঙ এমনকি মাছও একই

নিচে ছবিতে শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপ দেখানো হলো

অধিজগত বা domain: সকল প্রোটিস্টা, ছত্রাক, উদ্ভিদ এবং প্রাণীরা ইউকেরিয়া (Eukarya) অধিজগতের অন্তর্ভুক্ত

রাজ্য বা kingdom: সমস্ত প্রাণীদের নিয়ে গড়ে উঠে এনিমেলিয়া (Animalia) রাজ্য তথা প্রাণীজগত

পর্ব বা phylum: কর্ডাটা (Chordata) পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের পিঠে একটি ফাঁপা নার্ভ কর্ড থাকে। বেশ কিছু প্রাণীদের মাঝেই মেরুদণ্ড দেখা যায়

শ্রেণি বা class: ম্যামেলিয়া (Mammalia) তথা স্তন্যপায়ী শ্রেণিভুক্ত প্রাণীরা মেরুদণ্ডী হয়ে থাকে। শিশুকালে এসব প্রাণী মায়ের দুধ পান করে

বর্গ বা order: কার্নিভোরা (Carnivora) তথা মাংসাশী বর্গের মধ্যে সেই সব স্তন্যপায়ী প্রাণীরা পড়ে যাদের মাংস ছেঁড়ার উপযোগী সুগঠিত দাঁত আছে
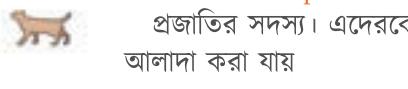
গোত্র বা family: Felidae-র অন্তর্ভুক্ত প্রাণীরা বিড়াল গোত্রীয় হয়। এই গোত্রের মাংসাশী প্রাণীদের সংকোচনশীল থাবা থাকে

গণ বা genus: *Felis* গোত্রের বিড়ালেরা গর্জন করতে পারে না। কোমল আদুরে শব্দে ডাক দেয়
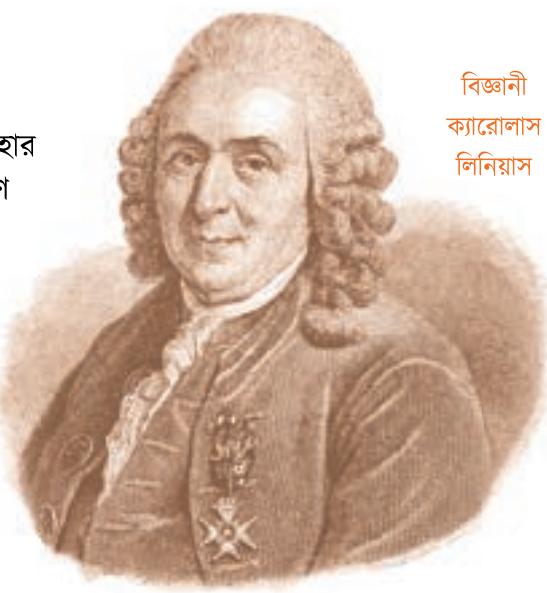
প্রজাতি বা species: *Felis catus* প্রজাতি আমাদের অতি পরিচিত। গৃহপালিত বিড়াল এই প্রজাতির সদস্য। এদেরকে *Felis* গণের অন্য সদস্যদের থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য সহজে আলাদা করা যায়

পর্বের মাঝে এসে যায়। কয়েকটি পর্ব মিলে একটি জগত বা রাজ্য (kingdom) তৈরি হয়। রাজ্য সবচেয়ে বিস্তৃত এবং বৃহত্তম ধাপ। আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ সাপেক্ষে এই সিধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জীবজগতে প্রাণীদের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, যার কারণে তাদের বিভিন্ন রাজ্যে ভাগ করা প্রয়োজন। বহুলপ্রচলিত এই শ্রেণিবিন্যাস মোট ছয়টি রাজ্য দ্বারা গঠিত; ইউব্যাকটেরিয়া (Eubacteria), আর্কিব্যাকটেরিয়া (Archaebacteria), প্রোটিস্ট (Protista), ফানজাই (Fungi), প্লান্টি (Plantae) এবং অ্যানিমেলিয়া (Animalia)।

প্রজাতির নামকরণ

বিজ্ঞানী লিনিয়াস গণ এবং প্রজাতির নাম ব্যবহার করে পরিচিত জীবগুলোর বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন, যা দ্বিপদ নামকরণ (Binomial nomenclature) নামেও পরিচিত। অধিকাংশ জীবের বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাটিন ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যেমন Carnivora শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দের অংশ। Carn অর্থ 'মাংস' Vorus অর্থ 'গ্রাসকারী'। সকল গৃহপালিত বিড়ালের বৈজ্ঞানিক নাম *Felis catus*।

বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস

অনুশীলনী ?

১। কোষের গঠনে কোন কোন অংশগুলো আবশ্যক বলতে পারো?
২। ধরো, তুমি নিজেই কোনো একটা নতুন প্রজাতির মাছ, ব্যাং কিংবা পোকা আবিষ্কার করে ফেললে! কী নাম রাখবে এই নতুন প্রাণীর? কেন?

অধ্যায় ৪
উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব

অধ্যায় ৪ উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ জীবজগতকে সাধারণ পর্যবেক্ষণযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং মিল-অমিলের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয়; যেমন: অণুজীব, উদ্ভিদ এবং প্রাণী।
- ☑ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের সাধারণ তুলনামূলক আলোচনা (গঠন, বৃদ্ধি, উপকারিতা, অপকারিতা)

উদ্ভিদ

জীব জগতের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য উদ্ভিদ। শুধু খাবারের উৎস হিসেবেই নয়, বরং পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য উদ্ভিদ অপরিহার্য। উদ্ভিদ বিচিত্র রকমের হয়। কিন্তু সকল উদ্ভিদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে আমরা উদ্ভিদ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জেনে নেবো।

উদ্ভিদ হচ্ছে মূল, কাণ্ড ও পাতা আছে এমন জীব যা সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে শর্করা জাতীয় উপাদান তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন তৈরি হয়, তা উদ্ভিদ পরিবেশে ছেড়ে দেয় যা এই পৃথিবীকে মানুষসহ অন্য প্রাণীর জন্য বাসযোগ্য রেখেছে।

উদ্ভিদের মূল ও কাণ্ড কেন প্রয়োজন? উঁচু দালানের কথা ভেবে দেখো। পানি এক ধরনের নলের মাঝ দিয়ে দালানের বিভিন্ন তলার নানা অংশে যায়। ঠিক একই রকম পরিবহন ব্যবস্থা থাকে সংবাহী উদ্ভিদ শরীরে। সংবাহী (vascular) উদ্ভিদ বলতে পরিবহন টিস্যু আছে এমন গাছ বোঝায়। এসব গাছ মূল দিয়ে মাটি থেকে পানি নেয়। এই পানি কাণ্ডের মধ্য দিয়ে উঁচু শাখা-প্রশাখা ও অন্যান্য অঙ্গে যায়। একাজে জাইলেম
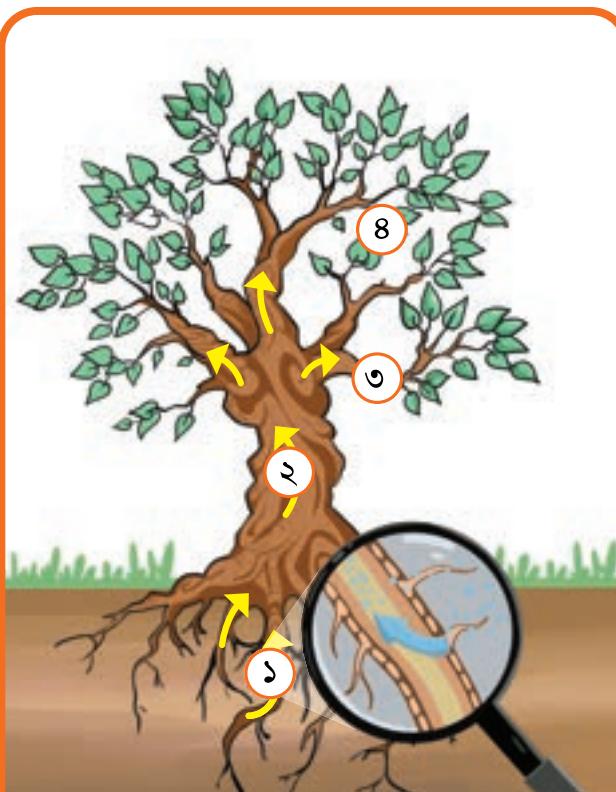
ছবি: উদ্ভিদের কাণ্ডের টিস্যুবিন্যাস

(Xylem) টিস্যু ব্যবহার করা হয়। জাইলেম দিয়ে গাছ পানির পাশাপাশি খনিজ লবণ নেয় মাটি থেকে। অন্যদিকে পাতায় তৈরি খাদ্য মূলসহ অন্যান্য অঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় যুক্ত পরিবহন নলের নাম ফ্লোয়েম (Phloem)। এই জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝে থাকে ক্যাম্বিয়াম (Cambium) স্তর, যা এই দুই রকমের পরিবাহী টিস্যুকে পরস্পর থেকে আলাদা করে। গাছের মূল ও কাণ্ডের আবরণের ভেতরে থাকে করটেক্স (Cortex)। একটা গাছকে কাঠামো দিয়ে তার পাতা ধারণের মতো গুরুত্বপুর্ণ কাজ করে ঐ গাছের কাণ্ড। এই কাণ্ড আবার গাছভেদে কিংবা অঙ্গভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। ফুলের বোঁটা হিসেবে আমরা যা দেখে থাকি তা মূলত এক ধরনের নরম কাণ্ড। কাঠ হিসেবে ব্যবহার উপযোগী কাণ্ড খুব শক্ত হয় এদের বাইরের পুরু বাকলের জন্য। মজাদার পানীয় আখের রস পাই আমরা আখের রসালো কাণ্ডে সঞ্চিত খাদ্য থেকে। আবার, কাঁটাযুক্ত ক্যাক্টাস তাদের কাণ্ড পানি সঞ্চয়ের কাজে ব্যবহার করে।

যেভাবে বিভিন্ন উপাদান গাছের মধ্যে পরিবাহিত হয়-

১। মাটি থেকে পানি ও খনিজ উপাদান গাছের মূলরোমে প্রবেশ করে। এরপর করটেক্স টিস্যু হয়ে জাইলেম নামক পরিবহন টিস্যুতে যায়।
২। প্রস্বেদন টানে পানি ও খনিজ উপাদান মূল থেকে কাণ্ড হয়ে পাতায় আসে।
৩। পাতায় আসা উপাদানসমূহ পাতার প্রত্যেক কোষে প্রবেশ করে।
৪। পানি ও বাতাস থেকে নেয়া কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করে পাতার কোষগুলো শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে।

মূল

গাছের যে অংশ মাটির সাথে যুক্ত থাকে, খাদ্য জমা রাখে, মাটি থেকে পানি ও খনিজ পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে তা মূল বা শিকড় (Root) নামে পরিচিত। মূলের গায়ে থাকে মূলরোম (Root hair) নামক ছোট চুলের মতো অংশ। মূলরোমের গঠন এমন থাকে যাতে খুব সহজেই বেশি পরিমাণে মাটি থেকে পানি ও দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করে নিতে পারে। প্রত্যেক মূলের আগায় থাকে মূলটুপি (Root cap)। এটি মুলত কোষের শক্ত আবরণ যা মুলকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। মূলের যে অংশ মাটির গভীরে প্রবেশ করে তা হলো প্রধান মূল। আবার ভূপৃষ্ঠতলের কাছাকাছি শাখামূল বিস্তৃত থাকে। এরা পানি শোষণের জন্য সুবিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করে। মাটি থেকে পানি মূলে প্রবেশের পর মূল কোষে সৃষ্ট তরল

চাপের প্রভাবে পানি কাণ্ডের মধ্য দিয়ে পাতার দিকে যেতে থাকে। আবার, প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় গাছ পাতা থেকে পানি পত্ররন্ধ্র দিয়ে পরিবেশে ছেড়ে দেয়। এভাবে পানি হ্রাসের ফলে তৈরি হওয়া পানিশূন্যতা পূরণে মূল থেকে জাইলেমের মাধ্যমে পানি উপরে উঠতে থাকে।
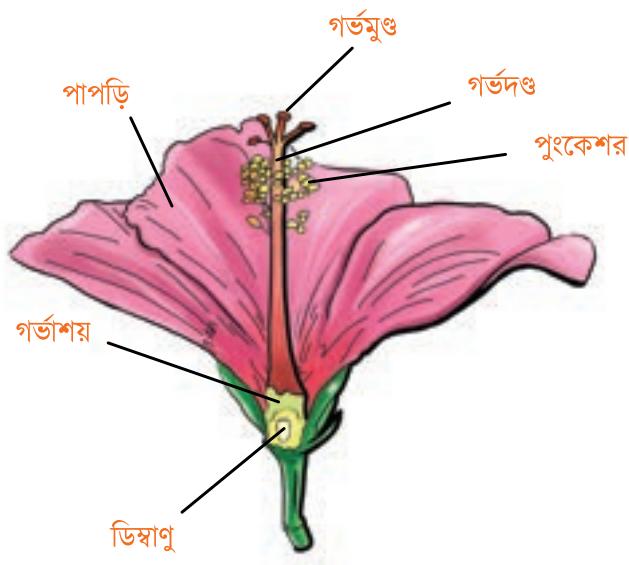
পাতা

একটি উদ্ভিদের দিকে তাকালে যে দিকে সবচেয়ে বেশি চোখ পড়ে তা হচ্ছে পাতা। বিভিন্ন রঙের, আকার-আকৃতির পাতা রয়েছে। আম, কাঁঠাল, জাম, বট প্রভৃতি গাছে একক ও সরল পাতা দেখা যায়। গোলাপ, নিম, সজনে প্রভৃতি গাছের পাতায় ছোট ছোট পত্রফলক (Lamina) থাকে। এদের যৌগিক পাতা বলে। কিছু গাছের পাতা সুঁচের মতো চিকন কিংবা কারো ক্ষেত্রে কাঁটাযুক্ত থাকে। পাতার বাইরের আবরণ হলো ত্বকীয় বহিস্তর বা এপিডার্মিস (Epidermis)। একে ঘিরে থাকে কিউটিকল (Cuticle) নামক মোম-জাতীয় আবরণ। চিরহরিৎ জাতীয় গাছ, যেমন—পাইন গাছে সারা বছর সবুজ পাতা থাকে। পাতার কিউটিকল খুব ঠান্ডা বা শুষ্ক আবহাওয়ায় পাতা থেকে অতিরিক্ত পানির বের হওয়া রোধ করে। পাতার নিচের পৃষ্ঠে পত্ররন্ধ্র (stomata) নামক ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। এসব ছিদ্রকে ঘিরে থাকে রক্ষীকোষ (guard cell), যারা গাছ থেকে জলীয়বাষ্প ও বায়ুর নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যখন গাছে পর্যাপ্ত পানি থাকে, রক্ষীকোষ স্ফীত হয়ে পত্ররন্ধ্রের মুখ খুলে যায়। পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানি হ্রাস কমানোর জন্য পত্ররন্ধ্রের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। প্রস্বেদনের জন্য গাছ অতিরিক্ত পানি হারায়। মূল দিয়ে শোষিত পানির শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগই প্রস্বেদনের মাধ্যমে পরিবেশে ফিরে আসে।

পাতার বিভিন্ন অংশ

সালোকসংশ্লেষণ

অধিকাংশ উদ্ভিদের বড় বড় চ্যাপ্টা পাতা থাকে যেগুলোর মাধ্যমে তারা সূর্যের আলো শোষণ করে। এই সূর্যের আলো ব্যবহার করে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে তাকে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) বলে। সালোকসংশ্লেষণ গাছের পাতায় হয়। সূর্যের আলো ছাড়াও পানি, খনিজ লবণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এর প্রয়োজন সালোকসংশ্লেষণ করার জন্য। গাছের শিকড় এবং কাণ্ড এসব উপাদান সংগ্রহ করে। গাছ পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। উদ্ভিদ কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast) নামক অঙ্গাণুতে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে। কার্বন ডাই অক্সাইড, পানি ও সৌরশক্তি ব্যবহার করে ক্লোরোপ্লাস্ট গ্লুকোজ রূপে গাছের খাদ্য তৈরি করে থাকে। সালোকসংশ্লেষণের প্রক্রিয়ার কারণেই অক্সিজেন তৈরি হয়। এই অক্সিজেন গাছ দ্রুত পরিবেশে ছেড়ে দেয়। তৈরিকৃত গ্লুকোজের কিছু অংশ গাছের পাতায় সঞ্চিত থাকলেও অধিকাংশই ফ্লোয়েমের মাধ্যমে কাণ্ড ও মূলে চলে যায় এবং সেখানেই জমা থাকে। যেসব পশুপাখিরা গাছ, গাছের পাতা কিংবা ফল খেয়ে থাকে, তারা এসবে বিদ্যমান গ্লুকোজ থেকে শক্তি পায়।

ছবি: ফুলের বিভিন্ন অংশ

উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি

সকল জীবেরই প্রজনন ঘটে। প্রজনন হলো বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমেই একই প্রজাতির নতুন নতুন বংশধর সৃষ্টি হয়। প্রজনন বিভিন্নভাবে হতে পারে। যৌন প্রজননে পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলনের নতুন সদস্য তৈরি হয়। আবার, অযৌন প্রজননে শুধু এক ধরনের কোষ থেকে নতুন বংশধর তৈরি হয়। কোনো কোনো উদ্ভিদ, প্রাণী কিংবা অণুজীবে উভয় ধরনের প্রজনন দেখা যায়।

বীজযুক্ত উদ্ভিদ

বীজ হলো উদ্ভিদের জীবনচক্রে তৈরি এমন একটি গঠন যা নতুন চারা গাছের জন্ম দিতে পারে। বীজে খাদ্য জমা থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে বীজ থেকে নতুন গাছ বেড়ে ওঠে।

কখনো কী ভেবে দেখেছ বীজ কীভাবে তৈরি হয়?

নিচের ছবিটি ভালোভাবে লক্ষ করো। এতে বীজ সৃষ্টির প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে। বীজযুক্ত গাছের যৌন প্রজনন ঘটে থাকে। গাছের পুংজনন কোষ বা পরাগরেণুর (Pollen) মিলন ঘটে স্ত্রী জনন কোষের ডিম্বাণুর (Egg cell) সাথে। ফুলের পরাগধানীতে পরাগরেণু আর গর্ভাশয়ে ডিম্বাণু সৃষ্ট হয়। গর্ভদণ্ডের নিচেই গর্ভাশয় থাকে। পরাগধানী থেকে পরাগরেণু বাতাস, মৌমাছি কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে ফুলের গর্ভমুণ্ডে যে প্রক্রিয়ায় যায়, তাকে পরাগায়ন (Pollination) বলে। পরাগায়নের ফলেই ডিম্বাণুর সাথে পরাগরেণুর মিলন ঘটে। যখন একই ফুলের কিংবা একই গাছের ভিন্ন ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ঘটে তাকে স্ব-পরাগায়ন বলে। আবার, দুইটি ভিন্ন গাছের ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ঘটলে তাকে পর-পরাগায়ন বলে। ফুলের মাঝে পরাগরেণু আদান-প্রদানে নিযুক্ত থাকা মাধ্যমকে পরাগরেণু বাহক বলে, যেমন- পাখি, কীটপতঙ্গ, বায়ু কিংবা পানি।

পরাগরেণু এসে পরাগমুণ্ডে পতিত হলে পরাগনালিকার সৃষ্টি হয়। এই নালিকা বেয়ে পরাগরেণু নিচে গর্ভাশয়ের দিকে যেতে থাকে। একসময় সেই গর্ভাশয়ে থাকা ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়। এই মিলন প্রক্রিয়া নিষেক (Fertilization) নামে পরিচিত। নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ফল এবং বীজ তৈরি হয়।

ছবি: নিষেক

বীজহীন ফলের উদ্ভিদ
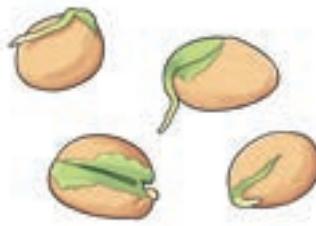
কিছু কিছু উদ্ভিদের ফলে বীজ তৈরি হয় না। এসব ক্ষেত্রে স্পোরের (Spore) মাধ্যমে গাছের বংশবৃদ্ধি ঘটে। স্পোর হলো এক বিশেষ ধরনের ছোট কোষ। স্পোর ক্যাপসুলের (Spore capsule) ভেতরে স্পোর সৃষ্টি হয়। সংবাহী টিস্যুহীন উদ্ভিদ, যেমন- শ্যাওলার প্রজনন স্পোরের মাধ্যমে ঘটে। আবার কিছু কিছু সংবাহী টিস্যুযুক্ত উদ্ভিদেও প্রজননে স্পোরের ব্যবহার দেখা যায়।

বীজের ভিন্নতা

বীজের আবরণ থাকার উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে আবৃতবীজী (Angiosperm) ও অনাবৃতবীজী (Gymnosperm)- এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিস্তার ফুলের উপর নির্ভরশীল হলেও অনাবৃতবীজী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তা নয়। অনাবৃতবীজী উদ্ভিদের বীজ কোণের (Cone) মধ্যে তৈরি হয়, যেমন পাইন গাছের বীজ। অনাবৃতবীজী উদ্ভিদ হলো প্রাচীনতম উদ্ভিদ। যখন পৃথিবীতে ডাইনোসর ছিল, তখন স্থলজ উদ্ভিদের মধ্যে অনাবৃতবীজী উদ্ভিদ ছিল প্রধান। এই উদ্ভিদগুলোর পৃথিবীতে আবির্ভাব প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বছর পূর্বে হয়েছে। এ সময়ের প্রায় ১০০ মিলিয়ন বছর পরেও আবৃতবীজী উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটেনি। কিছু কিছু অনাবৃতবীজী উদ্ভিদ আকারে অনেক ছোট হয়। বাকিরা অনেক বড় উদ্ভিদে পরিণত হয়।

ছবি: কাঁঠালের বিচি

উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চয়

বাজারে গেলে ফল এবং সবজির দিকে খেয়াল করে দেখো। সব ফল এবং সবজি উদ্ভিদ থেকে আসে, যারা সূর্যের আলোর শক্তি (আলো এক ধরনের শক্তি। শক্তির নানা রূপ রয়েছে, যেমন- শব্দ, তাপ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি) খাদ্য হিসেবে জমা করে। মিষ্টি আলু এবং গাজর তাদের মূলে খাদ্য সঞ্চয় করে, যা আমরা খেয়ে থাকি। আলু, আখ এবং আদা তাদের কাণ্ডে খাদ্য সঞ্চয় করে। যখন মানুষ এক কাপ চা পান করে অথবা পালংশাক বা বাঁধাকপি জাতীয় সবজি খায়, তখন তারা মূলত পাতা খায়, চায়ের

ক্ষেত্রে পাতার নির্যাস। ফুলকপি এবং ব্রকলি হলো মূলত ফুল যেগুলো আমরা খাই। এমনকি বীজও আমরা খেয়ে থাকি। যেমন- শিমের বীজ, চাল, বাদাম। উদ্ভিদের বীজ অনেক পুষ্টি সম্পন্ন হয়, কারণ বীজের মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে।

প্রাণী

তুমি কি কখনো চিড়িয়াখানায় গিয়েছ? যদি নাও যেয়ে থাকো তাহলে একটু ভেবে দেখো তো, তোমার প্রিয় প্রাণী কোনটি? এসব প্রাণীদের ভেতরে কি বিশেষ কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে?

মেরুদণ্ডী প্রাণী

পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তাদের ভেতর রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। যেমন—তোমার পোষা বিড়ালটির একটা শক্ত শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড রয়েছে। তোমারও পিঠের মাঝ বরাবর একটি মেরুদণ্ড রয়েছে, যা তোমাকে সোজা হয়ে চলতে সহযোগিতা করে। আবার অনেক প্রাণী আছে যাদের এমন গঠন নেই। যেমন- কেঁচো। নিশ্চয়ই দেখে থাকবে কেঁচো কীভাবে বুকে ভর দিয়ে চলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা হচ্ছে সেসব প্রাণী যাদের শরীরে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত একটি মেরুদণ্ড থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। স্থল পরিবেশ ও সমুদ্রের বৃহত্তম প্রাণীরাও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ

মেরুদণ্ডী প্রাণী হলো মেরুরজ্জু (Nerve cord) যুক্ত প্রাণী। এটি তাদের পিঠ বরাবর নিচের দিকে নেমে আসে। এসব প্রাণী মূলত কর্ডেট নামে পরিচিত। মেরুদণ্ড মেরুরজ্জুকে রক্ষা করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সুরক্ষা এবং চলাচলের জন্য অন্তঃকঙ্কাল (Endoskeleton) থাকে। এই অন্তঃকঙ্কাল হাড় (Bones) ও তরুণাস্থি (Cartilage) দিয়ে তৈরি। তরুণাস্থি হলো নরম, হাড়ের মতো উপাদান যা প্রাণীর সাথে বৃদ্ধি পায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে সরীসৃপ, উভচর, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী। কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী হলো চার পা (Tetrapod) বিশিষ্ট প্রাণী, যেমন: গরু, ছাগল, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি। অন্যরা দুই পা (Bipod) বিশিষ্ট প্রাণী, যেমন—মানুষ। বিভিন্ন ধরনের মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণীর শ্রেণিগুলোকে পরিপূর্ণ করে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সাতটি শ্রেণি
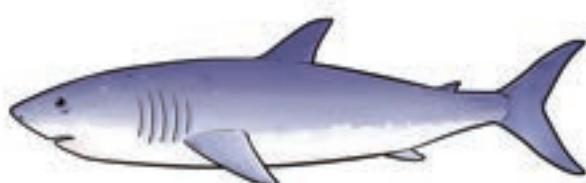
১) চোয়ালবিহীন মাছ

প্রায় ৭০টি মাছের প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যাদের চোয়াল নেই। এদের মাঝে হ্যাগফিশ ও ল্যাম্প্রে অন্যতম। ফুলকাযুক্ত এসব মাছের কঙ্কাল অত্যন্ত নমনীয় হয়।

২) অস্থিযুক্ত মাছ

প্রায় ২০,০০০ প্রজাতির মাছ আছে যাদের সুগঠিত কঙ্কাল থাকে, যার গঠন অস্থির মতো। শক্ত অস্থিবিশিষ্ট কঙ্কালের এসব মাছ শ্বসনের জন্য ফুলকা ব্যবহার করে। এই শ্রেণির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো রুই, ইলিশ ইত্যাদি।
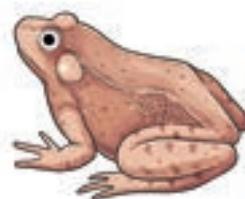
৩) তরুণাস্থিযুক্ত মাছ

কোমল তরুণাস্থি নিয়ে স্টিং রে, করাত মাছ ও নানা জাতের হাঙরের কঙ্কাল গঠিত হয়। এদেরও শ্বসনের জন্য সুগঠিত ফুলকা থাকে। তরুণাস্থিযুক্ত মাছের প্রায় ৭৫০টি প্রজাতি রয়েছে।

৪) উভচর প্রাণী

জল ও স্থল উভয় পরিবেশে বসবাস করার জন্য উভচর প্রাণীদের বিশেষ দেহ গঠন থাকে। তরুণ বয়সে এরা পানিতে থাকার সময় ফুলকা দিয়ে শ্বসন কাজ চালালেও পরিণত বয়সে স্থলে বাস করার সময় ফুসফুস দিয়ে চালায়। এসব প্রাণীর শক্ত চোয়াল, মসৃণ ত্বক ও অস্থিযুক্ত কঙ্কাল থাকে। প্রায় ৪৭০০ প্রজাতির উভচর প্রাণীর মধ্যে ব্যাঙ, স্যালামেন্ডার বহুল পরিচিত।

৫) সরীসৃপ

সরীসৃপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা বুকে ভর দিয়ে চলাফেরা করে। টিকটিকি, গিরগিটি, কুমির, কচ্ছপ, সাপসহ প্রায় ৮০০০ প্রজাতির সরীসৃপ পাওয়া যায়। কিছু সরীসৃপ জলে বাস করে। আবার কিছু স্থলে বাস করে। এদের সুগঠিত ফুসফুস থাকে। আঁশযুক্ত ত্বকের আবরণে শক্ত অস্থিযুক্ত কঙ্কাল থাকে।

৬) পাখি

প্রায় ৯৭০০ প্রজাতির পাখি পাওয়া গিয়েছে। অধিকাংশ পাখিই উড়তে পারে, ব্যতিক্রম উটপাখি। ফাঁপা অস্থিযুক্ত কঙ্কালের জন্য পাখিরা বেশ হালকা হয়। পালকযুক্ত ডানার সাহায্যে এরা উড়তে পারে। পাখিদের ফুসফুস থাকে। আমাদের অতিপরিচিত পাখিদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো কাক, চড়ুই, কবুতর, দোয়েল, ঈগল প্রভৃতি।

৭) স্তন্যপায়ী

মানুষ, কুকুর, বিড়াল, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক, জলহস্তীসহ বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণী স্থলে বাস করে। কিন্তু তিমি স্তন্যপায়ী হয়েও সমুদ্রে থাকে। স্তন্যপায়ীরা শিশুকালে মায়ের দুধ পান করে। এরা সবচেয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। এদের দেহ লোমশ হয়। অস্থিযুক্ত কঙ্কাল এদের দেহ গঠন করে। সুগঠিত চোয়ালের জন্য এরা নানা ধরনের খাবার খেতে পারে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪৭০০টি স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজাতি শনাক্ত হয়েছে।

অমেরুদণ্ডী প্রাণী

সহজ কথায় বলা যায়—যাদের মেরুদণ্ড থাকে না তারাই অমেরুদণ্ডী প্রাণী। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা সকল পরিবেশে বিস্তৃত হলেও এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি নয়। সমস্ত প্রাণীর ৯৫ শতাংশেরও বেশি অমেরুদণ্ডী বা মেরুদণ্ডহীন প্রাণী। অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা নানা পরিবেশে বাস করে। মরুভূমিতে, সমুদ্রের তলদেশে এবং এমনকি অন্যান্য জীবের ভিতরেও এদের পাওয়া যায়। আর্থ্রোপড (Arthropod) হলো অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৃহত্তম দল, যাদের ১০ লক্ষেরও বেশি প্রজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে কীটপতঙ্গ, মাকড়সা, কাঁকড়া, চিংড়ি, প্রভৃতি। চ্যাপ্টাকৃমি ও গোলকৃমি পানিতে, স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বা অন্যান্য প্রাণীর ভিতরে বাস করে। তাদের একটি সাধারণ কাঠামো রয়েছে। কিছু কিছু কীটের দেহ বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত থাকে, যেমন: কেঁচো। চ্যাপ্টাকৃমি বা গোলকৃমির ক্ষেত্রে এরকমটি দেখা যায়না। কেঁচোর মতো বেশিরভাগ দেহখণ্ড যুক্ত কীটগুলো স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বাস করে। আবার, কিছু কীট জলজ পরিবেশে বাস করতে পারে, যেমন: জোঁক। জেলিফিশ এবং প্রবাল নিডারিয়া (Cnidaria) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কোষ রয়েছে, যা তারা মাছ এবং অন্যান্য জীবকে ধরতে ব্যবহার করে। হাইড্রা (Hydra) এবং সামুদ্রিক অ্যানিমোনগুলিও (Anemone) নিডারিয়া শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। স্পঞ্জ (Sponge)
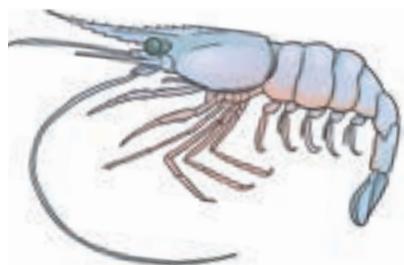
পরিফেরা (Porifera) পর্বের অন্তর্গত। তারা বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। স্পঞ্জগুলো সমুদ্রের তলদেশে নিজেদেরকে সংযুক্ত করে এবং পানি থেকে ছোট ছোট কণা গ্রহণ করে। ঝিনুক এবং শামুক মলাস্কা (Mullusk) পর্বের অন্তর্ভুক্ত। বেশিরভাগ মলাস্কা পর্বভুক্ত প্রাণী জলে বাস করে। কিন্তু কিছু প্রাণী স্থলেও বাস করে, যেমন—শামুক।

আর্থ্রোপড

আর্থ্রোপড হলো অমেরুদণ্ডী প্রাণী, যাদের বহিঃকঙ্কাল (Exoskeleton) শক্ত প্রকৃতির এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে রক্ষায় কাজ করে। বহিঃকঙ্কাল প্রাণীর বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায় না; ফলে প্রাণীর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে এটিকে অবশ্যই দেহ থেকে মুক্ত করে দিতে হয়। আর্থ্রোপডদেরও সন্ধিযুক্ত পা থাকে যা তাদের চলাফেরা করতে সাহায্য করে। তাদের দেহ কয়েকটি বিশেষ খণ্ডে বিভক্ত থাকে। আর্থ্রোপডের তিনটি বৃহত্তম গ্রুপ হলো ক্রাস্টাসিয়ান (Crustaceans), কীটপতঙ্গ (Insects) এবং অ্যারাকনিড (Arachnids)। ক্রাস্টাসিয়ানরা মিঠা জলে বা নোনা জলে কিংবা মাটিতে বাস করে। অ্যারাকনিডরাই সম্ভবত প্রথম প্রাণী যারা মাটিতে বাস করা শুরু করেছিল।
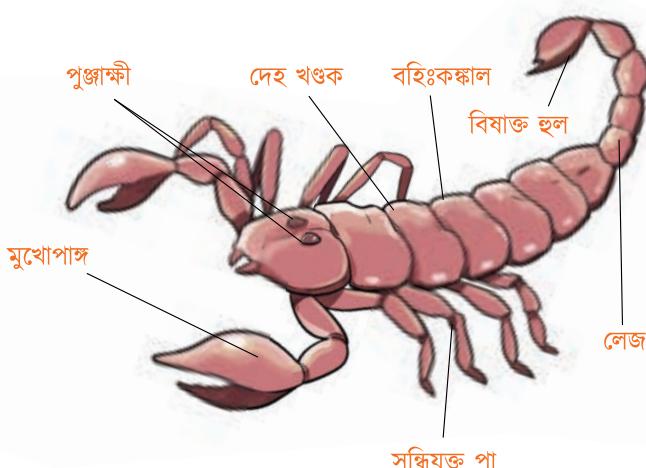
ক্রাস্টাসিয়ান:

কাঁকড়া, চিংড়ি এবং লবস্টার ক্রাস্টাসিয়ানের উদাহরণ। ক্রাস্টাসিয়ানদের ৩০,০০০ টিরও বেশি পরিচিত প্রজাতি রয়েছে। সমুদ্রে এদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়।

কীটপতঙ্গ বা ইনসেক্ট:

আর্থ্রোপডের বৃহত্তম দল হলো কীটপতঙ্গ, যাদের মধ্যে ১০ লক্ষেরও বেশি প্রজাতি রয়েছে। ইনসেক্ট গ্রুপের প্রাণীরা মস্তিষ্ক, বক্ষ এবং উদর এই ৩টি খণ্ডে বিভক্ত থাকে। তিন জোড়া পা এদের বক্ষের সাথে যুক্ত থাকে। অ্যান্টেনা এবং চোখ কীটপতঙ্গকে তার আশেপাশের পরিবেশ বুঝতে সাহায্য করে।
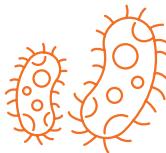
অ্যারাকনিড:

অ্যারাকনিডের মধ্যে রয়েছে মাকড়সা, টিক, বিছা এবং মাইট (উকুন জাতীয় প্রাণী)। তাদের চার জোড়া উপাঙ্গ, একটি বা দুটি

দেহ খণ্ড আছে। এদের কোনো অ্যান্টেনা নেই। মাকড়সা এক ধরনের শিকারী প্রাণী যারা প্রধানত কীটপতঙ্গ খাওয়ার উপর নির্ভরশীল। সকল মাকড়সা শক্তিশালী রেশম ফাইবার উৎপাদন করে। কিছু মাকড়সা এই রেশমের জাল বুনে শিকার ধরে থাকে।
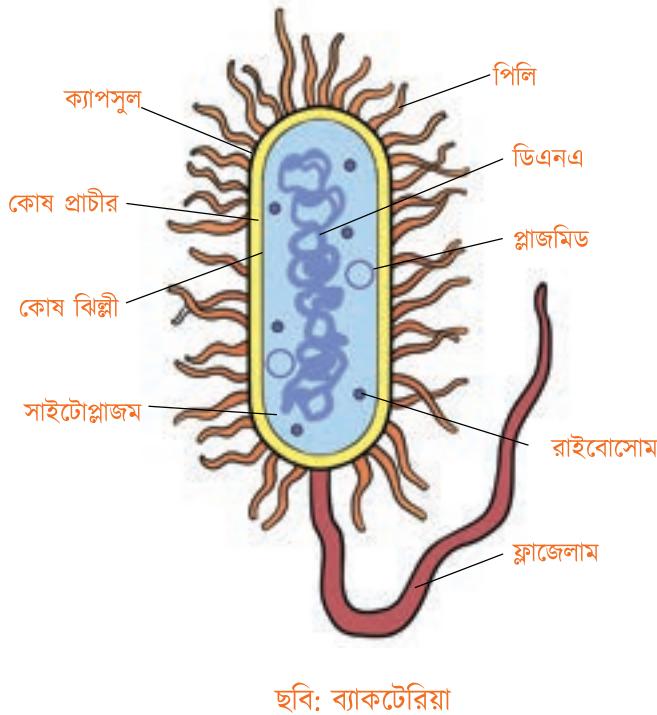
অণুজীব

খালি চোখে দেখা যায়না এমন জীবন্ত বস্তু হলো অণুজীব। অণুজীবগুলো এককোষী হতে পারে অর্থাৎ যাদের শুধু একটি কোষ আছে। কিছু অণুজীব বহুকোষী, যার একাধিক কোষ থাকে। অণুজীবদের জন্য খাদ্য, বায়ু, পানি, বর্জ্য নিষ্পত্তির উপায় এবং তারা বসবাস করতে পারে এমন পরিবেশ প্রয়োজন। কিছু অণুজীব উৎপাদক (Producer) অর্থাৎ সূর্যালোক ব্যবহার করে সরল পদার্থ থেকে নিজেদের খাদ্য তৈরি করে (উদ্ভিদের মতো)। কিছু অণুজীব পরজীবী/ভোক্তা (consumer), যারা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারেনা এবং খাদ্যের জন্য অন্যান্য জীবের উপর নির্ভরশীল। বেশিরভাগ অণুজীব রোগ সৃষ্টি করে না বরং অনেক অণুজীব সহায়ক হিসেবে কাজ করে। অণুজীব বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের মতোই অণুজীবদের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। এই শ্রেণিবিন্যাসগুলো অণুজীবের আকার, গঠন, খাদ্যের উৎস, বাসস্থান, এবং চলাচল দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই অণুজীবের মধ্যে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং প্রোটিস্ট।

ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় এবং সুপ্রচুর জীবগোষ্ঠী। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে জানত না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অ্যান্টোনি ভন লিউয়েনহুক, একজন ডাচ বণিক তার দাঁতের স্ক্র্যাপিং পর্যবেক্ষণ করতে একটি সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্র (মাইক্রোস্কোপ) ব্যবহার করেছিলেন। লিউয়েনহুক জানতেন না যে, তিনি যে ক্ষুদ্র জীবগুলি দেখেছিলেন তা ব্যাকটেরিয়া। ২০০ বছর পর এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে, ব্যাকটেরিয়ারও জীবন রয়েছে। ব্যাকটেরিয়া প্রায় সকল পরিবেশে বাস করে। এদের সমুদ্র, মাটি এবং প্রাণী এমনকি মানুষের অন্ত্রে (ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র) পাওয়া যায়। পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে গভীর শিলাগুলিতেও এদের পাওয়া যায়। জীবাণুমুক্ত করা হয়নি এমন কোনো পৃষ্ঠ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আবৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীতে মোট ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা আশ্চর্যজনক। এটি অনুমান করা হয়েছে পাঁচ মিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন (পাঁচের পর ত্রিশটি শূন্য!) ! তোমার দেহে কোষের তুলনায় অনেক বেশি ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে।

ছবি: ব্যাকটেরিয়া

ব্যাকটেরিয়া একটি নির্দিষ্ট আকার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তারপর দ্বিবিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রজনন করে। এটি ঘটে যখন একটি মাতৃকোষ বিভক্ত হয়ে দুটি অভিন্ন অপত্যকোষ তৈরি করে। এর ফলে খুব দ্রুত ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আদর্শ পরিবেশে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রতি ২০ মিনিটে দ্বিগুণ হতে পারে। এই ধরনের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি একটি অস্থিতিশীল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়াকে অভিযোজন করতে সহায়তা করে।

ব্যাকটেরিয়া দুটি রাজ্যে বিভক্ত। ইউব্যাকটেরিয়া এবং আর্কিব্যাকটেরিয়া। ইউব্যাকটেরিয়া বা "প্রকৃত ব্যাকটেরিয়া" প্রায় সব জায়গায় বসবাস করতে পারে, যেমন মাটি, পানি, বায়ু এমনকি তোমার শরীরেও। আর্কিব্যাকটেরিয়া, অর্থাৎ "আদি ব্যাকটেরিয়া" অনেক প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করতে পারে যেমন উষ্ণ প্রস্রবণ, সমুদ্রের তলদেশে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ এবং অতি লবণাক্ত পরিবেশ। কিছু আর্কিব্যাকটেরিয়াকে তাদের উৎপত্তিস্থলের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। ইউব্যাকটেরিয়াকে আকারের উপর ভিত্তি করে বিভক্ত করা হয়, যেমন—রড, গোলাকার বা সর্পিল আকৃতির। বৃত্তাকার ইউব্যাকটেরিয়াগুলি গুচ্ছ বা দীর্ঘ চেইন আকারে জন্মাতে পারে।

ছত্রাক

ছত্রাক আসলে কী? তুমি কি কখনো রুটির উপর নীলাভ সবুজ কিছু জন্মাতে দেখেছ? এগুলো হলো ছত্রাক। ছত্রাক, ফানজাই (Fungi) (একবচন- ফাঙ্গাস) রাজ্যের অন্তর্গত জীব। তারা প্রাণী বা উদ্ভিদ নয়। ফলে তারা সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে না এবং শোষণের (Absorption) মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করে। বেশিরভাগ ছত্রাক বহুকোষী, তবে কিছু এককোষী হিসাবে বিদ্যমান। ছত্রাক বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যেমন ইস্ট, মোল্ড এবং মাশরুম। ছত্রাকের প্রায় ১.৫ মিলিয়ন প্রজাতি থাকতে পারে। তোমরা সহজেই একটি মাইক্রোস্কোপ ছাড়া রুটির মোল্ড এবং মাশরুম দেখতে পারবে, কিন্তু অধিকাংশ ছত্রাক খালি চোখে

ছবি: ছত্রাক

দেখতে পাবে না। ছত্রাক নানা পরিবেশে বাস করে যেখানে তোমরা এদের সহজে দেখতে পারবেনা; যেমন, মাটির গভীরে, ক্ষয়প্রাপ্ত গাছের গুঁড়ির নিচে বা গাছপালা অথবা প্রাণীর ভিতরে। কিছু ছত্রাক অন্যান্য ছত্রাকের মধ্যে বা তার উপরে বসবাস করতে পারে। আমাদের পরিবেশের জন্য ছত্রাক খুব প্রয়োজন। ছত্রাক বিভিন্ন পদার্থকে পচিয়ে তা থেকে পুষ্টি উৎপাদন এবং অন্যান্য জীবের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করতে সাহায্য করে। ছত্রাক আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন উপায়ে আমাদের জন্য উপকারী।

প্রোটিস্টা

এই রাজ্যের জীবগুলো ব্যাকটেরিয়ার ন্যায় এককোষী কিংবা দেখতে অনেক সময় ছত্রাকের মতো। তারা প্রাণীর মতো খাবার খোঁজে বা উদ্ভিদের মতো সালোকসংশ্লেষণ করে। এত মিল থাকার পরেও ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ কিংবা ছত্রাক কোনোটির সাথেই তাদের মিল পাওয়া যায়না। প্রোটিস্টরা সুকেন্দ্রিক জীবের একটি বৃহৎ এবং বৈচিত্র্যময় শ্রেণি। যেসব সুকেন্দ্রিক জীব এই প্রোটিস্টা রাজ্যটি তৈরি করে, অন্যান্য রাজ্যের প্রাণীদের সাথে তাদের খুব বেশি মিল নেই। তারা তুলনামূলকভাবে সরল প্রকৃতির। প্রোটিস্টরা গঠনগতভাবে একে অপরের থেকে খুব আলাদা। কোনোটি অ্যামিবার মতো ক্ষুদ্র ও এককোষী, আবার কোনোটি সামুদ্রিক শৈবালের মতো বড় এবং বহুকোষী। অবশ্য, উদ্ভিদের তুলনায় বহুকোষী প্রোটিস্ট গঠনগতভাবে সহজ।
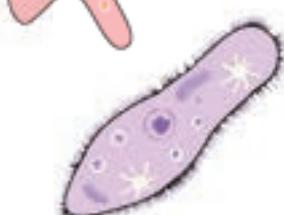
প্রাণী-সদৃশ প্রোটিস্ট

এরা এককোষী সুকেন্দ্রিক জীব (Eukaryote) যাদের মধ্যে প্রাণীর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রাণীদের মতো এরা চলাফেরা করতে পারে এবং তারা পরভোজী। অর্থাৎ নিজেরা খাদ্য তৈরির পরিবর্তে তারা খাদ্যের জন্য অন্য উৎসের উপর নির্ভরশীল।
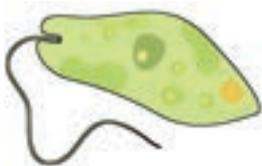
বিভিন্ন ধরনের প্রাণী-সদৃশ প্রোটিস্ট রয়েছে। প্রাণী-সদৃশ প্রোটিস্টদেরকে চলন অঙ্গ এবং চলনের প্রকৃতির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

(১) সিউডোপডস (Pseudopods) : এদের কোষপৃষ্ঠ প্রসারিত হয়ে অস্থায়ী পায়ের মতো কাঠামো তৈরি করে যা কোষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

(২) সিলিয়েট (Ciliate) : এদের সিলিয়া (Cilia) নামক পাতলা, চুল-সদৃশ অভিক্ষেপ থাকে যা কোষদেহ থেকে বাইরের দিকে প্রসারিত হয়। সিলিয়া সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে এসব প্রোটিস্ট স্থান পরিবর্তন করে। প্যারামেসিয়াম (Paramecium) সিলিয়ার মাধ্যমে চলাচল করে থাকে।

ছবি: তিন ধরণের প্রাণী সদৃশ প্রোটিস্ট

(৩) ফ্ল্যাজেলেট (Flagellate) : এদেরদের লম্বা ফ্ল্যাজেলা (Flagella) থাকে। ফ্ল্যাজেলা পাখার মতো ঘুরে পরিবেশের মধ্য দিয়ে প্রোটিস্টের চলনে সাহায্য করে।

উদ্ভিদ-সদৃশ প্রোটিস্ট

এরা শৈবাল নামে পরিচিত, বড় এবং বৈচিত্র্যময় একটি শ্রেণি। উদ্ভিদের মতো, এই উদ্ভিদ-সদৃশ প্রোটিস্টরাও স্বভোজী বা উৎপাদক। অর্থাৎ তারা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে। উদ্ভিদের মতো এরা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা তৈরি করতে পারে। তবে, উদ্ভিদের মতো এদের প্রকৃত কাণ্ড, মূল বা পাতা নেই। বেশিরভাগ উদ্ভিদ-সদৃশ প্রোটিস্টরা সমুদ্র, পুকুর বা হ্রদে বাস করে। প্রোটিস্টরা এককোষী বা বহুকোষী হতে পারে।

সামুদ্রিক শৈবাল এবং কেল্প (kelp) বহুকোষী, উদ্ভিদ-সদৃশ প্রোটিস্টের উদাহরণ। কেল্প আকারে উদ্ভিদের মতো বড় হয়ে সমুদ্রে একটি "বন" তৈরি করে ফেলতে পারে। এ ধরনের প্রোটিস্ট বাস্তুতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য এবং সামুদ্রিক খাদ্য শৃঙ্খলের ভিত্তি। তারা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাণীদের শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তৈরি করে।

শৈবালকে কেন উদ্ভিদের মতো বলে মনে করা হয়?

ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতি এবং সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকার জন্যই এমন ভাবা হয়। তারপরেও দেখা যায়, শৈবালে প্রকৃত উদ্ভিদ কোষের অনেক কিছুই থাকে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শৈবালের মূল, কাণ্ড বা পাতা নেই। কিছু শৈবাল দেখা যায়, যারা আবার চলাফেরা করতে সক্ষম। এরা সিউডোপড (Pseudopod) বা ফ্ল্যাজেলার (Flagella) সাহায্যে চলাফেরা করতে পারে, ফলে উদ্ভিদ থেকে বেশ আলাদা হয়ে থাকে। যদিও শৈবাল নিজেরা উদ্ভিদ না; এরা সম্ভবত উদ্ভিদের পূর্বপুরুষ ছিল।

ছত্রাক-সদৃশ প্রোটিস্ট

ছত্রাক-সদৃশ প্রোটিস্টগুলোর সাথে ছত্রাকের অনেক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। তারা উভয়েই পরভোজী (Heterotroph), এর মানে হলো এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে অক্ষম। খাদ্যের জন্য তারা অন্য জীবের উপর নির্ভরশীল। ছত্রাকের সাথে এসব প্রোটিস্টের আরো কিছু উল্লেখযোগ্য মিল হলো কোষ প্রাচীরের উপস্থিতি এবং স্পোর ব্যবহার করে প্রজনন। এসব প্রোটিস্টরা সাধারণত চলাচলে অক্ষম, তবে কিছু প্রোটিস্ট পাওয়া গিয়েছে যারা তাদের জীবন চক্রের কোনো এক পর্যায়ে চলাচলে সক্ষমতা অর্জন করে। ছত্রাক সদৃশ প্রোটিস্টের দুটি উদাহরণ হলো—স্লাইম মোল্ড এবং জলীয় মোল্ড।

ভাইরাস

ছবি: SARs-CoV-2 ভাইরাস

আমরা সবাই এখন SARs-CoV-2 ভাইরাস সম্পর্কে জানি, যেটি COVID-19 এর কারণ। ভাইরাস আসলে কী? ভাইরাস কোনো জীব নয়। তারা কোষ দিয়ে গঠিত নয় এবং তাদের শক্তির উৎস নেই অর্থাৎ ভাইরাস কোনো অণুজীব নয়। ভাইরাস মূলত প্রোটিন আবরণে মোড়ানো জেনেটিক বস্তু- ডিএনএ (DNA) কিংবা আরএনএ (RNA)। এসব অতিক্ষুদ্র জীব বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। আমাদের অতি পরিচিত রোগসর্দি-কাশি; এর পেছনেও ভাইরাস দায়ী। ভাইরাসের তো কোনো কোষ নেই তাই অন্য কোষের মতো এদের কোনো কোষ ঝিল্লী, সাইটোপ্লাজম কিংবা রাইবোসোম নেই। এখন প্রশ্ন হলো, ভাইরাস কি জীবিত? আমরা জানি সমস্ত জীবের কোষ থাকে; সেই সাথে তারা প্রজননেও সক্ষম। কিন্তু ভাইরাস নিজেরা প্রজনন করতে পারে না। ভাইরাস এমন একটি সত্তা যা অন্য একটি জীবের কোষকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কোষগুলিকে পোষক (Host) কোষ বলা হয়। জীবকোষে একবার ভাইরাস ঢুকে গেলে, সেটি কোষে তার সংখ্যাবৃদ্ধির নির্দেশ দেয়। তারপর, কোষটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা ফেটে যায় এবং ভাইরাসগুলি মুক্ত হয়। প্রতিটি নতুন ভাইরাস তখন একটি নতুন পোষক কোষ দখল করতে পারে। পোষক কোষ একদিনেই ১০ বিলিয়ন পর্যন্ত অনুরূপ ভাইরাস তৈরি করতে পারে। ভেবে দেখো, ভাইরাস যদি একটি পয়সার সমান হতো! তাহলে একদিনে ১০ বিলিয়ন ভাইরাস পুরো একটা ফুটবল মাঠকে ১ মিটারের বেশি (৩ ফুট) গভীরতায় ভরে ফেলতে পারতো। সংক্রমণের সময় পোষক কোষগুলো ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব ডিএনএ (DNA) বা আরএনএ (RNA) অনুলিপি তৈরি করে। ঠিক এই কারণে, বেশিরভাগ বিজ্ঞানী ভাইরাসকে জীবন্ত বস্তু বলে মনে করেন না।

অনুশীলনী

১। ৩৯ নং পৃষ্ঠায় দেখানো প্রাণিগুলোর নাম বলতে পারবে?
২। মানুষ ছাড়া আর কোন কোন প্রাণী দুই পায়ে হাঁটে বলো দেখি?
৩। খাবার কিছুদিন ফেলে রাখলে, কিংবা ফ্রিজে অনেক বাসী খাবার রয়ে গেলে তার উপর যে সাদাটে
ধূসর তুলোর মতো আস্তর পড়ে খেয়াল করেছ? এগুলো আসলে কী বলতে পারো?

অধ্যায় ৫

আবহাওয়া ও জলবায়ু

আবহাওয়া ও জলবায়ু

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ুচাপ, বাতাসে আর্দ্রতা ইত্যাদির ভিত্তিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- ☑ গ্রিনহাউজ গ্যাস ও গ্রিনহাউজ ইফেক্ট: কারণ ও প্রতিকার
- ☑ অ্যাসিড বৃষ্টি
- ☑ ওজোন স্তর ক্ষয়
- ☑ জলবায়ুর উপর মানবসৃষ্ট প্রভাব

আবহাওয়া ও জলবায়ু

শীতকালে স্কুল আগে ছুটি হয়ে গেলে তোমরা নিশ্চয়ই কখনো না কখনো দুপুরে বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে গল্পের বই পড়েছ। বিছানার পাশে জানালা থাকলে দুপুরে প্রতিদিন জানালা দিয়ে বিছানায় রোদ পড়তে দেখবে। শীতের দুপুরে দেখবে সূর্যের আলো ও তাপ (যাকে আমরা এক সাথে রোদ হিসেবে জানি) বিছানায় সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। আবার গরমের সময় দেখবে একই সময়ে সূর্যের আলো বিছানার উপর অনেক কম জায়গা নিয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, সূর্যের আলোর দিকও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। গ্রীষ্মকালে বিছানার সাথে যত ডিগ্রি কোণে সূর্যের আলো পড়ে শীতকালে তার চাইতে অনেক কম কোণে সূর্যের আলো পড়ে। আবার শীতকালে বিছানার বেশি অংশ জুড়ে সূর্যের আলো পড়লেও গরম সময়ের তুলনায় অনেক কম তাপ পাওয়া যায়।

তেমনি গ্রীষ্ম বা বর্ষায় যেদিন খুব ঝড় বৃষ্টি হয় তার কিছু সময় (কয়েক ঘন্টা বা দিন) আগে থেকে ভ্যাপসা গরম লাগে। এই সকল ঘটনা ঘটে আবহাওয়ার নানান পরিবর্তনের জন্য।

আবহাওয়া

আবহাওয়া ও জলবায়ু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত দুটি শব্দ। প্রতিদিন টেলিভিশনের খবরে একটা অংশ থাকে আবহাওয়ার প্রতিবেদন। এছাড়া রেডিও, দৈনিক পত্রিকা এমনকি স্মার্টফোনেও আমরা প্রতিদিনের আবহাওয়ার প্রতিবেদন দেখতে পাই। এই প্রতিবেদনে আবহাওয়ার যে বিষয়গুলোর কথা জানানো হয় তার মধ্যে রয়েছে,

- ☑ রোদ
- ☑ বৃষ্টি
- ☑ বায়ুর তাপমাত্রা
- ☑ বায়ুর আর্দ্রতা
- ☑ বায়ু প্রবাহের দিক
- ☑ বায়ুচাপ ইত্যাদি।
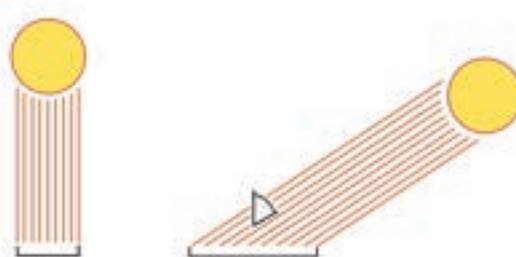
এগুলোকে বলা হয় আবহাওয়ার উপাদান। এগুলোর বিভিন্ন মানের ভিত্তিতে আবহাওয়া কেমন হবে তা বোঝা যায়।

পৃথিবীতে শক্তির প্রধান উৎস সূর্য। তাপ ও আলো আকারে এই শক্তি সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসে। একে সূর্যালোক বা রোদ এবং ইংরেজিতে ইন্সলেশন (Insolation) বলা হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যালোক বিভিন্ন পরিমাণে পৃথিবীতে আসে। এটা নির্ভর করে সূর্য আকাশে কত সময়ব্যাপী থাকে এবং আকাশ কতটা পরিষ্কার তার ওপর। এখন বলো তো বছরের কোন সময় (মাস অথবা ঋতু) আকাশ বেশি সময় ধরে পরিষ্কার ও নীল থাকে এবং কোন সময় মেঘলা থাকে?

ছবি: গ্রীষ্ম এবং শীতকালে সূর্যের আলোক রশ্মি পড়ার কোণ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে

একইভাবে সূর্য আকাশে কত সময় ধরে অবস্থান করছে তার উপরেও সূর্যালোকের পরিমাণ নির্ভর করে। সূর্য যদি বেশি সময় ধরে আকাশে অবস্থান করে তাহলে স্বাভাবিকভাবে সেই স্থানের পৃথিবীপৃষ্ঠ বেশি সূর্যালোক পাবে। এখানে পৃথিবী পৃষ্ঠ বলতে পৃথিবীর মাটি, পানি এবং বাতাসকে বোঝানো হচ্ছে। আবার দিনের কম সময়ব্যাপী যদি সূর্য আকাশে থাকে তাহলে পৃথিবী পৃষ্ঠ কম সূর্যালোক পাবে। শীতকালে দেরিতে সূর্য ওঠে এবং তাড়াতাড়ি সূর্য অস্ত যায়। ফলে আকাশে সূর্যের অবস্থানকাল সংক্ষিপ্ত হয়। কম সময় ধরে সূর্যালোক পাওয়ার কারণে পৃথিবীর পৃষ্ঠ তুলনামূলকভাবে শীতল থাকে। তাহলে বলো তো বছরের কোন সময়ে সূর্য বেশি সময় ধরে আকাশে থাকে? তখন পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কেমন হবে?

রোদ বেশি সময়ব্যাপী এবং তীব্র হলে সেই স্থানে বাষ্পীভবনের পরিমাণও বেড়ে যায়।

বায়ুর তাপমাত্রা

গ্রীষ্মকালে রোদে না গিয়ে ছায়ায় বা ঘরে থাকলেও গরম অনুভূত হয়। এর কারণ তখন আমাদের চারপাশে বায়ুর তাপমাত্রা বেশি থাকে। এই তাপমাত্রা কেমন হয় তা নির্ভর করে—

- সূর্যের আলোর ভূমিতে পড়ার কোণের উপর : কোণ বেশি (৯০ ডিগ্রী বা তার কাছাকাছি) হলে সূর্যের আলো ও তাপের পরিমাণ বেশি হয় এবং ভূপৃষ্ঠ ও তার সংলগ্ন বায়ু বেশি উত্তপ্ত হয়। আবার শীতকালে সূর্যালোক কম কোণে ভূপৃষ্ঠে পড়ার কারণে সূর্যালোকের তীব্রতা কমে যায়। ফলে বায়ুর তাপমাত্রা কমে যায় এবং ঠান্ডা অনুভূত হয়।
- সূর্যালোকের উপস্থিতির সময়ের উপর : তোমরা খেয়াল করে দেখো গ্রীষ্ম এবং শীতকালের মধ্যে কোন সময়ে সূর্য বেশি সময় আকাশে দেখা যায়। সূর্যালোক যত বেশি সময়ব্যাপী কোনো স্থানে উপস্থিত থাকবে, সেই স্থানের বায়ু তত বেশি গরম হবে।
- বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ : জলীয়বাষ্প বেশি তাপ ধারণ করতে পারে। এর ফলে কোনো স্থানের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি হলে সেখানে বেশি গরম অনুভূত হবে।
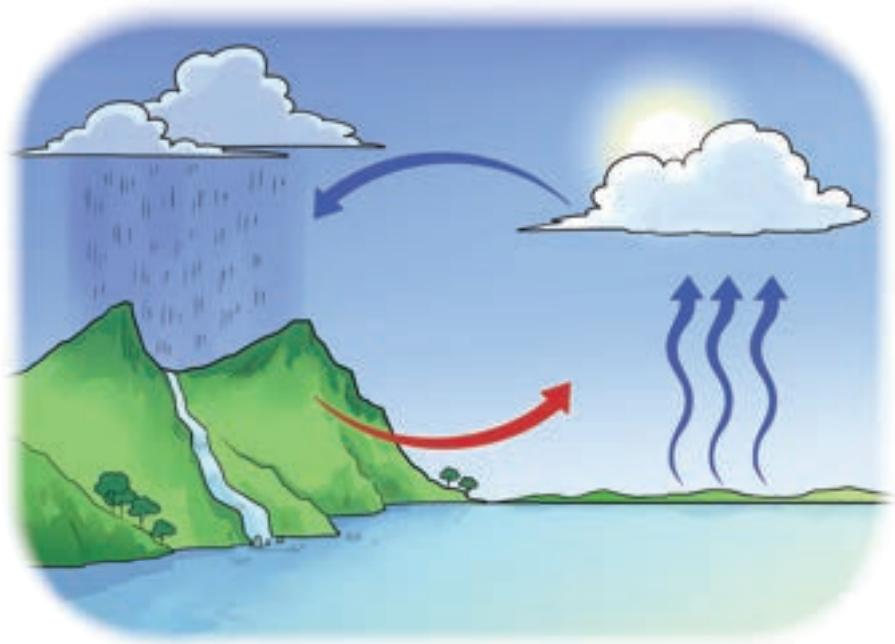
থার্মোমিটার (Thermometer) দিয়ে বায়ুর তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়।

বৃষ্টি

আবহাওয়ার একটি অন্যতম উপাদান হলো বৃষ্টি। বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে বর্ষাকালে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে । আকাশ থেকে বিভিন্ন আকারের পানির অসংখ্য ফোঁটা ঝরে পড়ে । এই পানি আসলো কোথা থেকে?

এখন কয়েকটি ঘটনা দেখা যাক। চুলায় ভাত রান্না করার সময় অথবা পানি গরম করলে সেই পাত্র থেকে পানির বাষ্প উপরে উঠতে দেখা যায়। আবার ভেজা কাপড় দড়িতে বিশেষ করে রোদে মেলে দিলে তা শুকিয়ে যায়। এই পানি যায় কোথায়? এই পানি বাতাসের সাথে মিশে যায়। একইভাবে দিনের বেলা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ভূপৃষ্ঠ বা পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত মাটি, পানি এবং উদ্ভিদ থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে মিশে যায়। বাতাসে এই জলীয়বাষ্প কিন্তু অনির্দিষ্ট পরিমাণে মিশে থাকতে পারে না। যে কোনো স্থানের বাতাসে জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা সীমিত এবং তা নির্ভর করে ঐ স্থানের তাপমাত্রার উপর। এটিকে আমরা একটি পানি খাবার গ্লাসের সাথে তুলনা করতে পারি। ঐ গ্লাসের পানি ধারণক্ষমতা নির্দিষ্ট । তাই গ্লাসে ইচ্ছেমতো পানি ঢাললে গ্লাসের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পানি গ্লাস থেকে উপচে বাইরে পড়ে। পৃথিবীপৃষ্ঠে বাতাসের ক্ষেত্রে (পৃথিবীর বায়ুর এই স্তরকে বায়ুমণ্ডল বলা হয়) কোনো স্থানের বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ সেখানকার বায়ুর ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত হয়ে গেলে সেই অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তরল পানির ছোট ছোট কণায় রূপান্তরিত হয় এবং তা পুনরায় পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে । বৃষ্টি এই ফিরে আসা পানির অনেকগুলো রূপের একটি রূপ মাত্র । এক্ষেত্রে জলীয়বাষ্প ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠে গেলে তা ক্রমশ ঠান্ডা ও ঘনীভূত হয়ে প্রথমে মেঘ (যা অত্যন্ত ছোট তরল পানির কণা এমনকি বরফের কণা দিয়েও গঠিত হতে পারে) এবং তারপর বৃষ্টির পানির ফোঁটায় পরিণত হয়। পানির সূক্ষ্ম কণা যখন

ছবি: বৃষ্টিপাতের উৎপত্তি এবং এর পানির পরিবর্তন
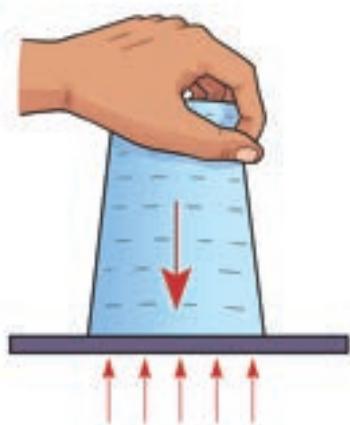
একীভূত হয়ে আরো বড় পানির কণায় পরিণত হয় তখন তা আর বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকতে পারে না এবং বৃষ্টির পানির ফোঁটা আকারে ঝরে পড়ে। পরবর্তীতে তা নদী, নালা, খাল, বিল ইত্যাদির মাধ্যমে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়। বৃষ্টিপাত পরিমাপের যন্ত্র হলো রেইন গজ (Rain gauge)।

বায়ুচাপ

আমাদের চারপাশে যে বায়ু আছে তার উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একটা প্রভাব রয়েছে। ফলে তারও কিন্তু একটা ওজন রয়েছে এবং এই বায়ু যা কিছু স্পর্শ করে তার উপরই চাপ প্রয়োগ করে। ভূপৃষ্ঠের উপরস্থ যে কোনো বস্তু বা স্থানের উপর বায়ুমণ্ডল একক ক্ষেত্রফলে যে চাপ প্রয়োগ করে সেটাই বায়ুচাপ। এই চাপ সবদিক দিয়ে প্রয়োগ হয়। যদি আমরা একটা পানির গ্লাস কানায় কানায় পানি দিয়ে পূর্ণ করি এবং তার মুখের উপর একটি শক্ত কাগজ বা কার্ডবোর্ড দিয়ে আটকিয়ে গ্লাসটি উল্টাই তবে দেখা যাবে পানিসহ গ্লাসটি উল্টে থাকা সত্ত্বেও পানি পড়ে যাচ্ছে না। বায়ু সবদিক থেকে চাপ দেয় বলেই এমন হয়। আমরা পানিতে নেমে ডুব দিলে পানির নিচে শরীরের যতটুকু অংশ আছে তার উপর চাপ অনুভব করি। কারণ পানি বাতাসের তুলনায় অনেক ভারী। বায়ুমণ্ডলও আমাদের

ছবি: বায়ুচাপের পরীক্ষা

উপর চাপ প্রয়োগ করছে যা আমরা সহজে বুঝতে পারি না। তবে অনেক উঁচু স্থানে গেলে বা বিমানে ভ্রমণ করার সময় বায়ুচাপের পরিবর্তন কিছুটা টের পাওয়া যায়। এই বায়ুচাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুচাপের একক হলো মিলিবার (Millibar)। বাতাসের গড় বায়ুচাপ হলো ১০১৩ মিলিবার। এর চেয়ে বায়ুচাপ বেশি হলে তাকে উচ্চচাপ এবং কম হলে নিম্নচাপ বলা হয়। বায়ুচাপ কমে গেলে বা নিম্নচাপ হলে তা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা নির্দেশ করে। বায়ুচাপ মাপার যন্ত্রের নাম ব্যারোমিটার (Barometer)।

বায়ুচাপ যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হলো—
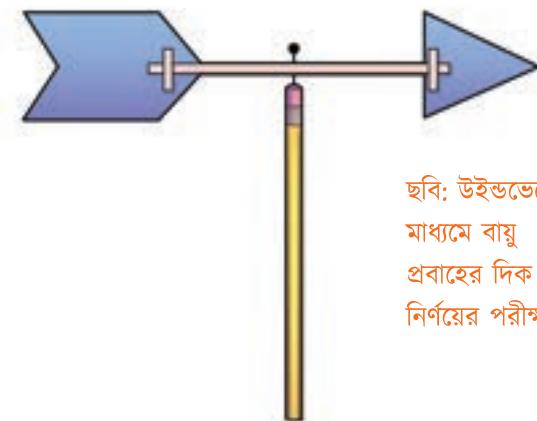
- **সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার তারতম্য :** যত উপরে যাওয়া হবে, বায়ুচাপ তত কমবে।
- **বায়ুর উষ্ণতার তারতম্য :** বায়ুর উষ্ণতা বাড়লে বায়ুচাপ কমে এবং উষ্ণতা কমলে বায়ুচাপ বাড়ে। এই কারণে শীতকালে বাতাস তুলনামূলকভাবে শুষ্ক ও ভারী থাকে এবং উচ্চচাপ দেখা যায়।
- **বায়ুতে জলীয়বাষ্পের তারতম্য :** বায়ুর উষ্ণতা বাড়লে বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণও বেড়ে যায়। এর ফলে বায়ুচাপ কমে যায় ও ব্যারোমিটারে নিম্নচাপ দেখায় (১০১৩ মিলিবারের কম)। কারণ বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে বায়ু আর্দ্র হয়ে যায় যা শুষ্ক বায়ুর তুলনায় হালকা।
- **পৃথিবীর আবর্তন গতি :** পৃথিবী তার নিজ অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘোরে যাকে আবর্তন গতি বলা হয়। এর কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে নিম্নচাপ হয়ে থাকে।

বায়ু প্রবাহের দিক

বাতাস কোন দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস। যেমন, বাংলাদেশে শীতকালে উত্তর দিক থেকে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং বায়ুর তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। আবার গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু প্রবাহিত হয়। অধিক জলীয়বাষ্পের উপস্থিতির কারণে এই বায়ু প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বায়ুর নাম মৌসুমী বায়ু । বায়ুপ্রবাহের দিক বের করার যন্ত্রের নাম উইন্ডভেন (Wind vane)।

ছবি: উইন্ডভেনের মাধ্যমে বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয়ের পরীক্ষা

বাতাসের আর্দ্রতা

বায়ুতে একক আয়তনে উপস্থিত জলীয়বাষ্পের পরিমাণ হলো বায়ুর আর্দ্রতা। এই আর্দ্রতা পরিমাপের দুইটি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন,

- প্রকৃত আর্দ্রতা : প্রকৃত আর্দ্রতা বলতে বোঝায় বায়ুতে বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের মধ্যে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণ।

- আপেক্ষিক আর্দ্রতা : একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো স্থানের বায়ু সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে, তার তুলনায় শতকরা কত পরিমাণ আছে—তা-ই হলো আপেক্ষিক আর্দ্রতা। যদি কোথাও আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০% বলা হয় তবে বুঝতে হবে সেই স্থানের বায়ুতে আর জলীয়বাষ্প যোগ হতে পারবে না। আর্দ্রতা বেশি হলে সেই স্থানে ভেজা বস্তু সহজে শুকানো যায় না।

বাতাসের আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয় হাইগ্রোমিটার (Hygrometer) এর মাধ্যমে।

জলবায়ু

জলবায়ু হলো কোনো একটি এলাকার নির্দিষ্ট সময়ের গড় আবহাওয়া। কোনো একটি এলাকার জলবায়ু বুঝতে হলে কমপক্ষে ৩০ বছরের আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের তথ্য দরকার। তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত হচ্ছে জলবায়ু বিষয়ে জানার প্রধান দুটি উপাদান। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, আবহাওয়ার যে সকল উপাদান আছে তা একই সাথে জলবায়ুরও উপাদান (রোদ, বৃষ্টি, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ইত্যাদি)।

কোনো এলাকার জলবায়ু ব্যাখ্যা করার জন্য জলবায়ু বিজ্ঞানীরা যে তিনটি বিষয় বিবেচনা করে থাকেন তা হলো,

(১) সেই স্থানের গড় তাপমাত্রা কত?

(২) সেই স্থানের গড় বৃষ্টিপাত কত?

(৩) বিভিন্ন ঋতুতে সেখানে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন কতটা হয়?

সুতরাং জলবায়ু বলতে আমরা একটি এলাকার আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের কয়েক বছরের (৩০ বছর বা তার বেশি) পরিবর্তনের ধারা (Pattern) বুঝে থাকি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং মানুষের সৃষ্টি করা কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়ে থাকে যা অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, কলকারখানা ও বিভিন্ন যানবাহন থেকে নির্গত গ্রিনহাউজ গ্যাস জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অনেকাংশে জড়িত। সেক্ষেত্রে যে সকল দেশে অধিক কলকারখানা এবং তেল গ্যাস চালিত যানবাহন রয়েছে সেসব দেশ অধিক পরিমাণে গ্রিনহাউজ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নির্গত করে যা জলবায়ুর পরিবর্তনে অধিক দায়ী।

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া (greenhouse effect)

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া এমন একটি প্রক্রিয়া যেটির কারণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হয়ে যায়। এই নামটি এসেছে শীতপ্রধান দেশে কৃষিকাজ করার জন্য ব্যবহৃত কাচ বা অন্য স্বচ্ছ বস্তু দিয়ে নির্মিত গ্রিনহাউস নামক ঘরের নাম থেকে। এই গ্রিনহাউস দিনের বেলা সূর্য থেকে যে তাপ ও আলো পায়, তা রাতের বেলায় অপেক্ষাকৃত লম্বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে পুনরায় বিকিরণ করে। যার ফলে গ্রিনহাউসের ভিতরের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রার তুলনায় বেশি থাকে। ঠিক একই প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের কিছু গ্যাস সূর্যের তাপে উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের পুনরায় বিকিরণ করা তাপ শোষণ করে বায়ুর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া নামে পরিচিত। জলীয়বাষ্প, মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসের কারণে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং এই গ্যাসগুলোকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলা হয়। গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণগুলো হলো,

তেল, গ্যাস ও কয়লা পোড়ানোর ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রাস অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাণী তথা জৈব বস্তুর পচনের ফলে মিথেন বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। এই মিথেন গ্যাস গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় ৩০ গুণ বেশি শক্তিশালী।

গবাদিপশু পালন বেড়ে গেলে মিথেন গ্যাসের পরিমাণও বাড়তে থাকে। গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গবাদিপশু তাদের খাদ্য হজমের কারণে প্রচুর মিথেন গ্যাস বাতাসে ছাড়ে।
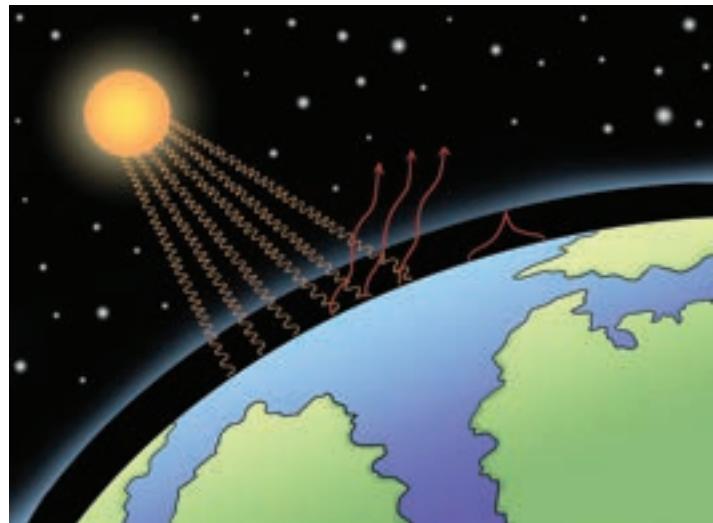
কৃষিজমিতে নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহার করলে সেখান থেকে নাইট্রাস অক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এই গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায়

অন্তত ১০ গুণ ক্ষতিকর এবং সর্বোচ্চ প্রায় ৩০০ গুণ বেশি ক্ষতি করতে সক্ষম।

বন ধ্বংস এবং গাছ কাটার ফলে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করার জন্য গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিছু যন্ত্রপাতি এবং দ্রব্যাদি (যেমন, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, ফোম, অ্যারোসল ইত্যাদি) থেকে ফ্লোরিনেটেড গ্যাস বের হয়। এই গ্যাসের গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় প্রায় ২৩,০০০ গুণ বেশি।

ছবি: গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া

এই গ্যাসগুলোর পরিমাণ যত বাড়বে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া তত বেশি হবে। গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবীর দুই মেরুতে (উত্তর ও দক্ষিণ মেরু) জমে থাকা বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি অনেক ধরনের রোগ জীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠায় বিভিন্ন রোগব্যাধির প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে।

অ্যাসিড বৃষ্টি

বৃষ্টির পানির সাথে অ্যাসিড বা অ্যাসিড জাতীয় উপাদান মিশ্রিত থাকলে সেটাকে অ্যাসিড বৃষ্টি বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বৃষ্টির পানির সাথে সালফিউরিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিড মিশ্রিত অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে ঝরে পড়ে। এমনকি তুষার, কুয়াশা, শিলা বৃষ্টির বরফ খণ্ড, ধূলিকণার সাথেও কঠিন বা তরল অবস্থায় অ্যাসিড জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো বৃষ্টির পানি, কুয়াশা, তুষার ইত্যাদিতে এই অ্যাসিড আসলো কী করে? বিভিন্ন মানুষসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে নির্গত সালফার ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড বাতাসে উপস্থিত জলীয়বাষ্প, অক্সিজেন এবং অন্যান্য রাসায়নিকের সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি হয়। তারপর তা পানি এবং অন্যান্য বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। সালফার ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের সামান্য অংশ প্রাকৃতিক উৎস (যেমন, আগ্নেয়গিরি) থেকে আসলেও অধিকাংশ আসে মানুষসৃষ্ট বিভিন্ন উৎস থেকে । উৎসগুলো হলো—

» বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি (যেমন, তেল, গ্যাস বা কয়লা) পোড়ানো। বাতাসের ২/৩ অংশ সালফার ডাই অক্সাইড এবং ১/৪ অংশ নাইট্রোজেন অক্সাইড বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী জেনারেটর থেকে নির্গত হয়।

» বিভিন্ন যানবাহন এবং ভারী যন্ত্রপাতি।

» বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনকারী, তেল শোধনাগার এবং অন্যান্য কলকারখানা।

বায়ু এসব উৎস থেকে নির্গত দূষণকারী গ্যাস ও অন্যান্য কণাকে অনেক দূর পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং সেখানে অ্যাসিড বৃষ্টি ঘটাতে পারে। এর ফলে দূষণকারী দেশ ছাড়াও দূরের অন্য দেশে অ্যাসিড বৃষ্টি হয়ে সেই এলাকার ক্ষতি হতে পারে। অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে যে সকল ক্ষতি হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হলো—

» মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর জীবনধারণ কঠিন করে তোলে।

» উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের ক্ষতি হয়।

» মাটির গুণাগুণ (যা উদ্ভিদ এবং মাটির মধ্যে বসবাসকারী অন্যান্য অণুজীবের জন্য প্রয়োজন) নষ্ট হয়ে যায়।

» বিভিন্ন ধাতু নির্মিত যন্ত্রপাতি, অন্যান্য স্থাপনা এমনকি দালানকোঠারও ক্ষতি হয়ে থাকে। অ্যাসিড বৃষ্টির পানি ধাতু ও কংক্রিটের সাথে বিক্রিয়া করে সেগুলো ক্ষয় করতে থাকে।

ওজোন স্তর ক্ষয়

বায়ুমণ্ডলের নিচের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তরে (স্ট্র্যাটোমণ্ডল) ওজোন গ্যাসের একটি অংশ আছে যা ওজোন স্তর নামে পরিচিত। এই স্তর সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন জীবকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কিন্তু কিছু দূষণকারী উপাদানের উপস্থিতির কারণে এই স্তর ক্ষয়ে যাচ্ছে। যার ফলে ক্ষতিকর অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করে জীবজগতের ক্ষতি করছে। ওজোন স্তর ক্ষয়ের জন্য দায়ী দূষণকারী উপাদানগুলো হচ্ছে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, হাইড্রো ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি। ওজোন স্তরের ক্ষয়ের ফলে নিম্নরূপ ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ করা যায়,

» মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব : ওজোন স্তর ক্ষয়ের ফলে মানুষ ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির সরাসরি স্পর্শে আসে। ফলে তাদের মধ্যে নানানরকম শারীরিক সমস্যা যেমন, চর্মরোগ, ক্যান্সার, সূর্যের তাপে চামড়া পোড়ার মতো লাল হয়ে যাওয়া, চোখে ছানি পড়া, তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাওয়া, দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখা দেয়।

» প্রাণীর উপর প্রভাব : অতিবেগুনি রশ্মির সরাসরি স্পর্শে প্রাণীদের চোখ ও চামড়ার ক্যান্সার হয়ে থাকে।

» উদ্ভিদের উপর প্রভাব : শক্তিশালী অতিবেগুনি রশ্মি গাছের বৃদ্ধি কমিয়ে দিতে পারে, খাদ্য তৈরি (একে সালোকসংশ্লেষণ বলা হয়) এমনকি ফুল ফোটার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ফলে বনের গাছপালাগুলোকে এই ক্ষতিকর প্রভাব বহন করতে হয়।

» জলজ ও সামুদ্রিক জীবের উপর প্রভাব : অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী (যেগুলো প্ল্যাংকটন নামে পরিচিত) অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের খাদ্যের উৎস হলো এই প্ল্যাংকটন। এগুলো ধ্বংস হলে জলজ জীবও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জলবায়ুর উপর মানবসৃষ্ট প্রভাব

মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে পুরো পৃথিবীর জলবায়ুর উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। এই ক্ষতি হচ্ছে মূলত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন, ওজোন স্তরের ক্ষয়, বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র কণা (এগুলোকে এরোসল বলা হয়) এবং গাছপালা কেটে বন পরিষ্কার করে ফেলার মাধ্যমে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে যায় যাচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে যে সকল ঘটনা ঘটে তা নিম্নরূপ—

- মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ভারী বৃষ্টি এবং শক্তিশালী ঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কিছু কিছু জায়গায় বন্যা হচ্ছে এবং পানির গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। আবার কিছুকিছু স্থানে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে।
- ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ইউরোপের দক্ষিণ এবং মধ্য অঞ্চলগুলোতে নিয়মিত গরম আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে, খরা হচ্ছে ও বনে আগুন ধরে যাচ্ছে।
- বাংলাদেশ সহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ এবং অনুন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের (যেমন: ঝড়, ভারী বৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদি) সম্মুখীন হচ্ছে।
- অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারায় পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

অনুশীলনী ?

১। উঁচু পাহাড়ের উপরে বায়ুচাপ কি বেশি হবে নাকি কম?

২। তোমার আশপাশের মানুষদের কিংবা কলকারখানার কোন কোন কর্মকাণ্ড বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া বাড়াতে কাজ করছে? লক্ষ করে দেখো।

অধ্যায় ৬

পৃথিবী ও মহাবিশ্ব

পৃথিবী ও মহাবিশ্ব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ পৃথিবী ও মহাবিশ্ব
- ☑ বিগ ব্যাং ও মহাবিশ্বের প্রসারণ
- ☑ গ্যালাক্সি ও নক্ষত্র; কাঠামো ও উপকাঠামো
- ☑ নক্ষত্রমণ্ডলী; কালপুরুষ ও সপ্তর্ষী পর্যবেক্ষণ
- ☑ মহাকাশ নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার: জ্যোতিষবিদ্যা

মহাবিশ্বের সৃষ্টি

ছবি: আমাদের সৌরজগৎ

তোমরা সবাই জানো আমদের এই পৃথিবীটা একটা গ্রহ। এরকম আটটি গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সূর্যের আকার বিশাল, কিন্তু পৃথিবী থেকে অনেক দূরে বলে এটাকে ছোট দেখায়। তোমরা এটাও জানো সূর্য থেকে আলো এবং তাপ বের হয়—কারণ এটা একটা নক্ষত্র।

তোমরা যদি রাতের আকাশের দিকে তাকাও তাহলে সূর্যের মতো অসংখ্য নক্ষত্র দেখবে। সেগুলো অনেক দূরে, তাই সূর্যের মতো উজ্জ্বল না দেখে মিটমিট করে জ্বলতে দেখবে।

মহাবিশ্বের গঠন

তোমাদের নিশ্চয়ই জানার কৌতুহল হয়—এই মহাবিশ্ব কত বড়। মজার বিষয় হচ্ছে মহাবিশ্ব কিন্তু ক্রমাগত বড় হচ্ছে এবং পৃথিবীর মানুষ তার পুরোটুকু কখনো দেখতে পারবে না। তারা যেটুকু দেখতে পায় সেটি এত বড় যে সেটাকে বর্ণনা করার জন্য বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, আলোকে তার একমাথা থেকে অন্যমাথায় যেতে একশ বিলিয়ন (দশ হাজার কোটি) বছর লেগে যাবে! এই মহাবিশ্বে অসংখ্য নক্ষত্র কিন্তু সেগুলো আলাদা আলাদা সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে না, সেগুলো থাকে বিশাল বিশাল গ্যালাক্সির মাঝে। গ্যালাক্সি হচ্ছে অসংখ্য নক্ষত্রের সমষ্টি, মহাকর্ষ বলের কারণে গ্যালাক্সির ভেতর নক্ষত্রগুলো আঁটকে থাকে। মহাবিশ্বে এই গ্যালাক্সি গুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং একটি গ্যালাক্সি অন্য গ্যালাক্সি থেকে অনেক দূরে দূরে থাকে। মহাবিশ্বকে আমরা যদি একটা অনেক বড় মহাসমুদ্র হিসেবে কল্পনা করি তাহলে গ্যালাক্সিগুলো হবে বহুদূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট দ্বীপের মতো। অনুমান করা হয় দৃশ্যমান মহাবিশ্বে প্রায় এক ট্রিলিয়ন (লক্ষ কোটি) গ্যালাক্সি আছে যার প্রত্যেকটিতে প্রায় এক বিলিয়ন (একশ কোটি) নক্ষত্র!

আমাদের গ্যালাক্সি

তোমরা সবাই জানো সূর্য একটা নক্ষত্র, কাজেই সেটাও আসলে একটা গ্যালাক্সির মাঝে আছে। সেটি হচ্ছে আমাদের গ্যালাক্সি, এবং আমাদের এই গ্যালাক্সির নাম ছায়াপথ (Milky Way)। বেশিরভাগ গ্যালাক্সির আকার একটি থালার মতো, সূর্য এই গ্যালাক্সির কিনারার দিকে, তাই আমরা রাতের আকাশের দিকে তাকালে গ্যালাক্সির অসংখ্য তারাকে সাদা ধোঁয়ার মতো দেখতে পাই। তোমরা যারা এখনও রাতের আকাশের এই ছায়াপথ দেখো নি তারা শহর থেকে দূরে গিয়ে যখন রাতের আকাশে চাঁদ থাকবে না, তখন অবশ্যই এই ছায়াপথটি দেখে আসবে।

আমাদের গ্যালাক্সির নাম ছায়াপথ

আমরা আমাদের গ্যালাক্সির ভিতর থাকি বলে এটা দেখতে পাই না, দেখতে কেমন হবে সেটা শুধু অনুমান করতে পারি। কিন্তু যদি আমরা শরৎকালে বা শীতকালে আকাশের দিকে তাকাই

তাহলে আমাদের গ্যালাক্সির সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সি এন্ড্রোমিডাকে দেখতে পাই। যদি আমরা টেলিস্কোপে দিয়ে মহাকাশের আরও গভীরে তাকাই তাহলে দেখব আরও গ্যালাক্সি- মনে হবে গ্যালাক্সির বুঝি শেষ নেই।

আমাদের সবচেয়ে কাছের গ্যালাক্সি এন্ড্রোমিডা

শিল্পীর আঁকা আমাদের গ্যালাক্সিতে সূর্যের অবস্থান

মহাবিশ্বের সৃষ্টি

বিজ্ঞানীরা যখন দেখলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু গ্যালাক্সি আর গ্যালাক্সি তখন তারা সেগুলোকে নিয়ে গবেষণা করা শুরু করলেন এবং অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন গ্যালাক্সিগুলো একটি থেকে আরেকটি দূরে সরে যাচ্ছে। যার অর্থ একসময় সেগুলো নিশ্চয়ই কাছাকাছি ছিল!

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন আজ থেকে ১৪ বিলিয়ন (এক হাজার চারশত কোটি) বছর আগে পুরো এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি বিন্দুতে ছিল। অবিশ্বাস্য একটি বিস্ফোরণের পর সেই বিন্দুটি প্রসারিত হয়ে বর্তমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রূপ নিয়েছে। সেই বিস্ফোরণটির নাম বিগ ব্যাং (Big Bang)। ১৪ বিলিয়ন বছর আগে যে প্রসারণ শুরু হয়েছিল সেটি কিন্তু এখনও চলছে এবং চলতেই থাকবে।

টেলিস্কোপ দিয়ে আমরা যদি মহাকাশের আরও গভীরে তাকাই তাহলে দেখব গ্যালাক্সি আর গ্যালাক্সি, এবং প্রতিটি গ্যালাক্সিতে প্রায় এক বিলিয়ন নক্ষত্র

বিগ ব্যাংয়ের অনেক খুঁটিনাটি আছে, তোমরা যখন বড় হবে তখন সেগুলো ধীরে ধীরে জানবে। আপাতত জেনে রাখো বিগ ব্যাংয়ের পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রথমে ছিল শুধু শক্তি এবং ধীরে ধীরে সেখানে নানা ধরনের কণা তৈরি হতে থাকে। প্রথমে তৈরি হয় সবচেয়ে সহজ পরমাণু, যেটার নাম হচ্ছে হাইড্রোজেন।

তোমরা শুনে অবাক হবে, এই সময়টিতে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিন্তু ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয়ে উঠে যখন সেখানে নক্ষত্রের জন্ম হতে শুরু করে।

নক্ষত্রের জন্ম

নক্ষত্র জীবিত প্রাণী নয়, তারপরেও আমরা কিন্তু নক্ষত্রের জন্য জন্ম এবং মৃত্যু এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করি। কারণ সত্যি সত্যি নক্ষত্রের জন্ম হয়, তার একটি খুবই ঘটনাবহুল জীবন থাকে, এবং তারপরে এক সময় নক্ষত্রের মৃত্যু হয়।

তোমাদের একটু আগে বলা হয়েছে বিগ ব্যাংয়ের পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রথমে ছিল শক্তি এবং তারপর তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন। এই হাইড্রোজেন কোথাও কোথাও একত্রিত হয়ে একটা গ্যাস পিণ্ডের আকার নেয়, এই গ্যাস পিণ্ডকে বলে নেবুলা। সেই নেবুলাতে যদি যথেষ্ট গ্যাস থাকে তাহলে মহাকর্ষ বলের কারণে যখন সংকুচিত হতে থাকে তখন তার তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে এতই বেড়ে যাওয়া সম্ভব যে তখন ভেতরের হাইড্রোজেন একটি অন্যটার সাথে নিউক্লিয়ার ফিউসান নামে একটি বিক্রিয়া করে প্রচুর শক্তি জন্ম দিতে থাকে। সেই নক্ষত্র থেকে আলো বের হতে থাকে, এবং আমরা বলি নক্ষত্রের জন্ম হয়েছে! পাঁচ বিলিয়ন (পাঁচশ কোটি) বছর আগে আমদের সূর্য ঠিক এইভাবে জন্ম নিয়েছিল। আরও পাঁচ বিলিয়ন বছর সূর্য এইভাবে আলো দিবে তারপর একসময় যখন তার হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে সেটি ফুলে ফেঁপে নিষ্প্রভ হয়ে (যে রূপটাকে বলে রেড জায়ান্ট) মৃত্যুবরণ করবে, আলোহীন নিষ্প্রভ নক্ষত্রের এই অবশেষকে বলা হয় হোয়াইট ডোয়ার্ফ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বেশিরভাগ নক্ষত্রের জীবন এরকম।

নাসা থেকে পাওয়া সুপারনোভা বিস্ফোরণের ছবি

ব্ল্যাক হোল:

যদি কোনো নক্ষত্র শুরুতে সূর্য থেকে অনেক বড় হয়ে জন্ম হয় তাহলে সেই নক্ষত্রের জীবন হয় অনেক বেশি চমকপ্রদ। নক্ষত্রের জীবনটি বিচিত্র, যে নক্ষত্রের ভর যত বেশি সেটি তত দ্রুত তার জ্বালানি শেষ করে ফেলে। যদি নক্ষত্র অনেক বড় হয় তাহলে তার জ্বালানি শেষ করে অনেক ধরনের মৌল তৈরি করে এক সময় অবিশ্বাস্য একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তার জীবন শেষ করে দেয়। সেই বিস্ফোরণকে বলে সুপার নোভা বিস্ফোরণ এবং সুপার নোভা বিস্ফোরণের আলোতে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয়ে যায়!

সুপার নোভা বিস্ফোরণে নক্ষত্রের বাইরের অংশটুকু ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যায়। কিন্তু ভিতরের অংশটুকু মহাকর্ষ বলের প্রচণ্ড আকর্ষণে সংকুচিত হতে হতে এক সময় ব্ল্যাকহোলে রূপান্তরিত হয়। ব্ল্যাকহোলের আকর্ষণে সেখান থেকে আলো পর্যন্ত বের হতে পারে না বলে তার নাম ব্ল্যাকহোল।

ব্ল্যাকহোলের রহস্য আরও চমকপ্রদ। তোমরা যখন আরও বড় হবে তখন সেটি সম্পর্কে আরও জানবে।
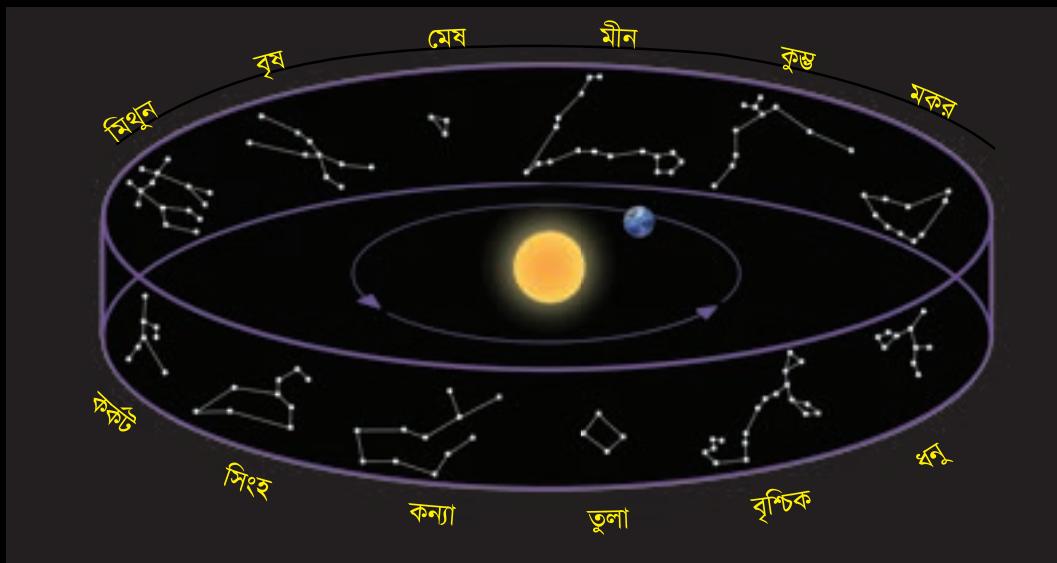
নক্ষত্রমণ্ডলী

তোমরা যদি রাতের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাও তাহলে সেখানে অসংখ্য নক্ষত্রকে দেখবে, কোনো কোনোটা জ্বলজ্বল করছে, আবার কোনো কোনোটা মিটমিট করছে। শুধু তাই নয়, তুমি সেগুলোর মাঝে রঙের বৈচিত্র্যও দেখতে পাবে। তোমার যদি কল্পনা শক্তি থাকে, নিশ্চিতভাবেই তুমি সেই নক্ষত্রগুলো দিয়ে কোনো একটা ছবি কল্পনা করে নিতে পারবে! সেই প্রাচীন কাল থেকেই অনেক ধরনের কল্পনা করে অনেক ধরনের পৌরাণিক কাহিনীর ছবি কল্পনা করা হয়েছে, তোমাদের সেরকম কয়েকটি ছবি দেখানো হলো।

নক্ষত্রের বিন্যাস দেখে প্রাচীন মানুষের কল্পনার ছবি:

- উপরে বামে 'অরায়ন' বা 'কালপুরুষ'
- উপরে ডানে 'উরসা মেজর' বা 'বড় ভাল্লুক'
- নিচের ছবিতে 'স্করপিও' বা 'বৃশ্চিক'

নক্ষত্রমণ্ডলী যেহেতু আমাদের সৌরজগৎ থেকে অনেক দূরে তাই আকাশের কোথায় কখন দেখা যাবে তার পরিবর্তন হলেও তাদের আকারের পরিবর্তন হয় না। একটি নক্ষত্রকে আকাশে খুঁজে পাওয়া কঠিন হলেও কয়েকটি নক্ষত্র মিলে যখন একটি বিশেষ আকার তৈরি করে তখন সেটি বেশ সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। কাজেই আকাশে নক্ষত্রের একটা ম্যাপ তৈরি করার জন্য নক্ষত্রমণ্ডলীকে ব্যবহার করে আকাশকে বারো ভাগে ভাগ করা হয়েছে—নক্ষত্রমণ্ডলীর সাথে একটা করে ছবি কল্পনা করে তাদেরকে সেরকম নামও দেয়া হয়েছে। (ছবিতে তোমাদের সেরকম উদাহরণ দেখানো হলো) জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের এই বিভাজনকে ব্যবহার করেন।

তোমরা জেনে নিশ্চয়ই অবাক হবে আমাদের বাংলা মাসগুলো এই নক্ষত্রমণ্ডলীর উদয়ের সাথে সম্পর্ক রেখে তৈরি করা হয়েছে। পৃথিবীর খুব বেশি জাতির নিজস্ব ক্যালেন্ডার নেই, আমাদের আছে। শুধু তাই নয়, সেটি আমদের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর সাথে মিলিয়ে করেছেন, সেটি নিয়ে তোমরা গর্ব করতে পারো!

জ্যোতিষবিদ্যা

এবারে তোমরা জানবে, কীভাবে বিজ্ঞানের একটা বিষয়কে কুসংস্কারের জন্য ব্যবহার করা হয়। তোমাদের যে কয়েকটি নক্ষত্রমণ্ডলীর কথা বলা হয়েছে, তোমরা সবাই নিশ্চয়ই কখনো না কখনো সেগুলোর নাম শুনেছ, কারণ ভাগ্য গণনার জন্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীকে ব্যবহার করা হয়। শুভ সময় এবং অশুভ সময় নির্ণয় করার জন্যও এগুলো ব্যবহার করা হয়।

জ্যোতিষচর্চার জন্য জন্মক্ষণে কোন নক্ষত্রমণ্ডলীর উদিত হচ্ছিল—সেটি দিয়ে একজনের রাশি নির্ণয় করা হয়। তারপর এগুলোর অবস্থান ব্যবহার করে বিভিন্ন মানুষের ভাগ্য নির্ণয় করা হয়। পৃথিবীর ৮ বিলিয়ন (আটশত কোটি) মানুষের ভাগ্য মাত্র বারোটি ভাগে ভাগ করা যায়—এটি কী বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? দুঃখের কথা হচ্ছে, দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পত্রপত্রিকা এই রাশিচক্র দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় বর্ণনা করে থাকে। তাদের সবার উচিত শুরুতে ঘোষণা দেওয়া যে, এই পদ্ধতিতে ভাগ্য নির্ণয়ের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।
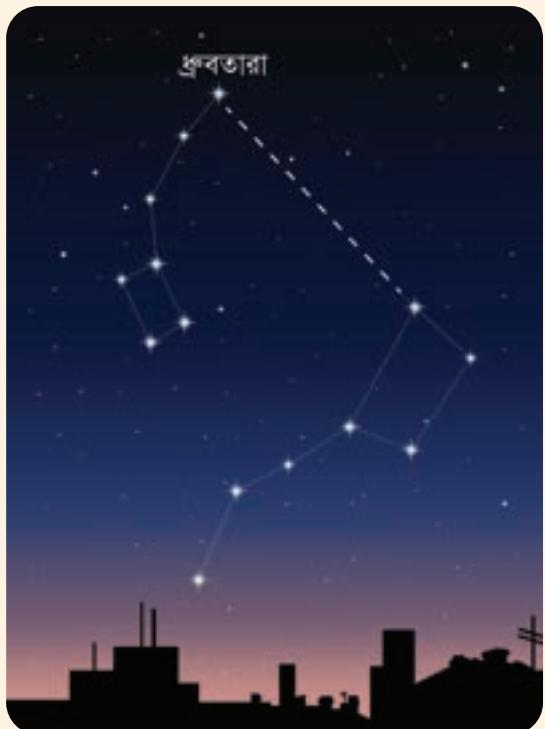
নক্ষত্রমণ্ডলী পর্যবেক্ষণ
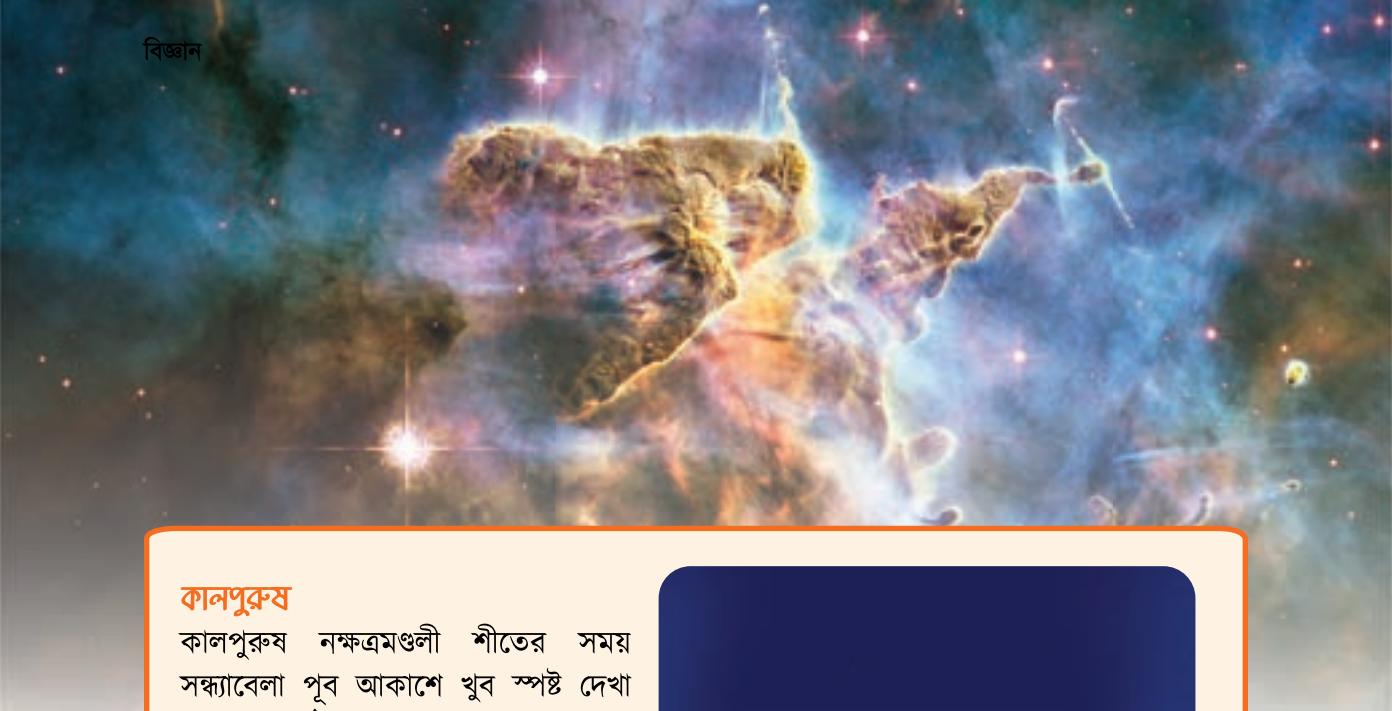
আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলীর সাথে পরিচিত হওয়া একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা। কেউ যখন নিজ দেশ ছেড়ে বিদেশে যায়, তখন সবকিছু অপরিচিত থাকলেও আকাশের দিকে তাকালে তার পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল দেখে এক ধরনের আনন্দ পেতে পারে। এখানে তোমার জন্য দুটি নক্ষত্রমণ্ডলীর কথা বলা হলো, তোমরা ইচ্ছা করলে আরও নক্ষত্রমণ্ডলী খুঁজে বের করতে পারবে।

সপ্তর্ষিমণ্ডল

পৃথিবী যেহেতু তার অক্ষের উপর ঘুরছে তাই আমাদের সকল গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য এবং চাঁদকে পৃথিবীকে ঘিরে বিপরীত দিকে ঘুরছে দেখতে পাই। শুধু একটা নক্ষত্র পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির থাকে, কখনো ঘুরে না—সেটি হচ্ছে ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির কারণ পৃথিবীর অক্ষ উত্তর দক্ষিণ বরাবর এবং ধ্রুবতারা পৃথিবীর ঠিক উত্তর দিকে! সেটি খুঁজে পাওয়া সহজ। তোমরা যদি রাতের আকাশের উত্তর দিকে তাকাও তাহলে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো সাজানো সাতটি তারা দেখবে (ইংরেজিতে তাকে Big Dipper বলে) এর উপরের দুটি তারা দিয়ে একটা সরল রেখা কল্পনা করে খানিকদূর এগিয়ে গেলে সেটি ধ্রুবতারাকে স্পর্শ করবে। সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুবতারাকে ঘিরে ঘড়ির কাটার মতো ঘুরছে, তাই বছরের কোন সময় এবং রাতের কোনক্ষণে সেটি দেখছ তার উপর নির্ভর করবে সেটি কোথায়, সেটি সোজা না উল্টা!

কালপুরুষ
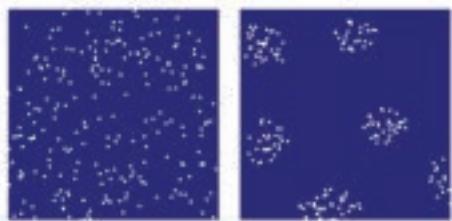
কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী শীতের সময় সন্ধ্যাবেলা পূব আকাশে খুব স্পষ্ট দেখা যায়। এর গঠন এত চমকপ্রদ এটি চিনতে কোনো ভুল হয় না। তোমাদেরকে আগেই দেখানো হয়েছে যে, এটাকে তরবারি হাতে একজন যোদ্ধা কল্পনা করা হয়। যোদ্ধার বেল্টের নিচে যে তরবারি ঝুলছে তার মাঝামাঝি নক্ষত্রটি একটি নেবুলা, এবং তার কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য থেকে ২০০ গুণ ভারী একটি ব্ল্যাকহোল।

তুমি এই নক্ষত্রটি একবার নিজের চোখে দেখে নিলে সবার কাছে গর্ব করে বলতে পারবে "আমি নিজের চোখে একটি ব্ল্যাকহোল দেখেছি।"

অনুশীলনী ?

১। একটি বিন্দু যদি একটি নক্ষত্র বোঝায় তাহলে কোন ছবিটি আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বেশি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করবে?

২। বিগব্যাং-এর কত বছর পর সূর্যের জন্ম হয়েছে?

অধ্যায় ৭

গতি

অধ্যায় ৭ গতি (Motion)

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ বিভিন্ন ধরনের গতি
- ☑ বেগের পরিমাপ
- ☑ ত্বরণ

সরল গতি (Linear Motion)

তোমরা হয়তো খবরের কাগজে কিংবা টেলিভিশনের খবরে জেনে থাকতে পারো যে মাঝে মাঝেই পৃথিবী থেকে কোনো একটা মহাকাশযান বহুদূরে কোনো একটি গ্রহে যাত্রা করেছে। কোনো কোনো গ্রহ এতদূরে যে মহাকাশযানকে সেখানে পৌঁছাতে কয়েক বছর সময় লেগে যায়। তোমাদের হয়তো অনেকেরই মনে হচ্ছে এত দূরে যাওয়ার জন্য মহাকাশযানগুলোকে বিশাল পরিমাণ জ্বালানি নিয়ে রওনা দিতে হয়। সে জন্য নিশ্চয়ই মহাকাশযানগুলোর আকারও হয় বিশাল! মহাকাশযানগুলোর ইঞ্জিন এই বিশাল পরিমাণ জ্বালানি জ্বালিয়ে মহাকাশযানকে দূরগ্রহে নিয়ে যায়।

তোমরা যারা এখনো জানো না তারা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হবে যে আসলে মহাকাশযানগুলোকে এই দূর গ্রহে যাওয়ার জন্য কোনো জ্বালানি খরচ করতে হয় না। গতির একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কোনো কিছু যদি সোজা সরল রেখায় সমান বেগে যেতে থাকে, তাহলে সেটা সেভাবেই যেতে থাকবে, সেটাকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য কোনো কিছুই করতে হবে না। যদি বস্তুটির গতি বাড়াতে হয় কিংবা কমাতে হয় কিংবা বস্তুর গতিপথ পরিবর্তন করতে হয়, শুধু তাহলে তার ওপর বল প্রয়োগ করার জন্য একটুখানি জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে। বিজ্ঞানের ভাষায় বল বলতে কী বোঝায় আমরা সেটি একটু পরেই জেনে নেব, আপাতত আমরা বল প্রয়োগ কথাটিকে তার পরিচিত

ছবি: মেরিনার ৪ নামে ছোট এই মহাকাশযানটি ১৯৬৫ সালে পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে গিয়েছিল।

অর্থ—অর্থাৎ কোনো কিছুকে ধাক্কা দেওয়া, টানা বা আকর্ষণ করাকে বুঝে নেব।

তোমাদের দৈনিন্দন জীবনে তোমরা সেটা ঘটতে দেখোনা বলে নিশ্চয়ই সবার মনে হচ্ছে, এটি কীভাবে সম্ভব! তোমরা যারা মেঝেতে একটা মার্বেল কিংবা একটি খেলনা গাড়ি গড়িয়ে দিয়েছ, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে গাড়িটি মোটেই সরলরেখার সমবেগে অনন্তকাল ধরে চলছে না। আগে হোক কিংবা পরে হোক মার্বেল কিংবা খেলনা গাড়ি থেমে গেছে। তার কারণ হচ্ছে, মেঝের সঙ্গে ঘর্ষণ কিংবা বাতাসের ঘর্ষণ। তুমি যদি সত্যি সত্যি ঘর্ষণের বল কমিয়ে আনতে পারতে, তাহলে অবাক হয়ে দেখতে মার্বেল কিংবা খেলনা গাড়ি থেমে না গিয়ে চলছে তো চলছেই।

তোমরা যারা সাইকেল চালাও তারা সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে চালানো শুরু করার পর প্রথমে একটু পরিশ্রম করে প্যাডেলে চাপ দিয়ে সাইকেলের বেগটি বাড়াতে হয়। একবার সাইকেলের বেগ লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেলে প্যাডেল না করলেও সাইকেল একই বেগে যেতে থাকে। তখন ঘর্ষণের কারণে কমে আসা বেগটুকু ধরে রাখার জন্য মাঝে মাঝে প্যাডেলে চাপ দিয়েই সাইকেল চালানো যায়।

যারা গাড়ি, বাস বা ট্রাক চালায় তাদের সঙ্গে কথা বললেও তোমরা জানতে পারবে যে তারা যখন প্রথম স্থির অবস্থা থেকে গাড়ির বেগ বাড়াতে থাকে, তখন ইঞ্জিনের অনেক পেট্রোল ডিজেল কিংবা গ্যাস খরচ করতে হয়। যখন গাড়ি, ট্রাক বা বাসের গতিবেগ তার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে সেই গতিবেগকে ধরে রাখার জন্য খুবই অল্প পেট্রোল, ডিজেল বা গ্যাস খরচ করতে হয়। কাজেই তোমরা গতির একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশেষত্বের কথা জেনে গেছ আর সেটি হচ্ছে:

> কোনো কিছু সরলরেখায় সমান বেগে যেতে থাকলে সেটি সেভাবেই যেতে থাকবে শুধু বেগ বাড়াতে কিংবা কমাতে হলে, কিংবা বেগের দিকের পরিবর্তন করতে হলে বল প্রয়োগ করতে হবে।

ছবি: কোনো একটা কিছু উপরে ছুড়ে দিলে মাধ্যাকর্ষণ
বলের জন্য বাঁকা হয়ে নিচে পড়ে।

বক্রগতি (Curve motion)

তোমাকে যদি কেউ বলে, তুমি মেঝেতে একটা মার্বেল এমনভাবে গড়িয়ে দেবে যেন সেটা সোজা না গিয়ে বাঁকা একটা গতিপথে যায়, তাহলে তুমি দেখবে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তুমি যতই চেষ্টা করো মার্বেলটা সোজা পথে যাবে। তোমরা নিশ্চয়ই এখন কারণটা নিজেরাই বুঝে গেছ, মার্বেলটাকে বাঁকা পথে পাঠাতে হলে তার ওপর বল প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু ফাঁকা মেঝেতে মার্বেলটা গড়িয়ে দেওয়ার পর তার ওপর কোনো কিছু বল প্রয়োগ করতে পারে না।

তবে একটা বস্তুকে বক্রগতিতে চালানোর একটা খুব সহজ পদ্ধতি আছে। তুমি যদি কোনো কিছুকে ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে ছুড়ে দাও, তাহলে দেখবে, সেটা সোজা সরল পথে না গিয়ে একটা বাঁকা পথে যাচ্ছে অর্থাৎ তার মধ্যে একটা বক্রগতি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার কারণটাও বুঝতে পারছ। তুমি যখন কোনো কিছু ছুড়ে দাও তখন তার উপর মধ্যাকর্ষণ বল নিচের দিকে কাজ করে এবং সেই কারণে বস্তুটা সোজা সরল পথে না গিয়ে একটা বাঁকা পথে যায়।

ঘূর্ণন গতি (Circular Motion)

বক্রগতির আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ঘূর্ণন গতি। তুমি একটা ছোট পাথরকে সুতা দিয়ে বেঁধে মাথার উপর দিয়ে ঘোরাতে পারো, এটা ঘূর্ণন গতির একটা চমৎকার উদাহরণ। পাথরটি যেহেতু ঘোরার জন্য প্রতি মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করছে তার অর্থ নিশ্চয়ই তার ওপর বল প্রয়োগ করতে হচ্ছে। সেই বলটি কোথা থেকে আসছে?

সুতা দিয়ে পাথরটাকে বেঁধে তুমি নিজেই পাথরটাকে টেনে ধরে রেখে তার ওপর কেন্দ্রের দিকে বল প্রয়োগ করছ বলে পাথরটা তোমাকে ঘিরে ঘুরছে। তুমি যদি হঠাৎ সুতাটা ছেড়ে দাও, তাহলে পাথরটার ওপর আর কোনো বল থাকবে না বলে সেটা সোজা ছুটে যাবে, সেটা কিন্তু আর বাঁকাভাবে যাবে না।

তোমরা কি এ রকম ঘূর্ণন গতির আর কোনো উদাহরণ দিতে পারবে? একটি উদাহরণ তোমরা
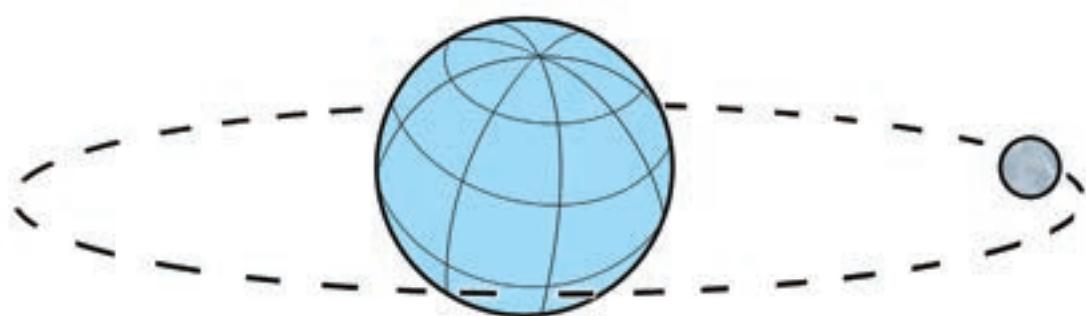
সবাই দেখেছ, সেটি হচ্ছে আকাশের চাঁদ। আমরা সবাই আকাশের চাঁদকে সরু একটা রূপ থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে পূর্ণিমার চাঁদ হতে দেখি, তারপর আবার সেটি ধীরে ধীরে সরু হতে হতে অমাবস্যায় পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রতি ২৯ দিনে একবার করে এই ব্যাপারটি ঘটে, কারণ পুরো পৃথিবীকে একবার পুরোপুরি ঘুরে আসতে চাঁদটির ২৯ দিন সময় লাগে! চাঁদটি সরু দেখাবে নাকি পূর্ণিমার ভরাট চাঁদ দেখাবে, সেটা নির্ভর করে সূর্যের তুলনায় সেটি পৃথিবীর কোন দিকে আছে তার ওপর। পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদের এই ঘূর্ণন গতিটি চলমান থাকতে পারে কারণ, পৃথিবী তার মধ্যাকর্ষণ বল দিয়ে চাঁদকে নিজের দিকে টেনে রাখে—ঠিক যে রকম তুমি পাথরের টুকরাকে সুতা দিয়ে বেঁধে তোমার কাছে টেনে রেখেছিলে! ঠিক একই ভাবে পৃথিবী সূর্যের আকর্ষণের কারণে সূর্যকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। আবার সূর্য আমাদের গ্যালাক্সিতে ছায়াপথের কেন্দ্রে থাকা বিশাল ব্ল্যাকহোলের আকর্ষণে তার কেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরতে থাকে!

ছবি: একটা ছোট পাথরকে সুতা দিয়ে বেঁধে ঘোরাতে হলে সেটাকে কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরে রাখতে হয়।

তুমি যদি সব সময় তোমার চোখ খোলা রাখো তাহলে আমাদের চারপাশে ঘূর্ণন গতির অনেক উদাহরণ খুঁজে পাবে। এখন থেকে যখনই তুমি এ রকম গতি দেখতে পাবে, সেটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। এর মধ্যে অনেক মজার বিষয় লুকিয়ে থাকে।

ছবি: পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল চাঁদকে টেনে ধরে রেখেছে বলে সেটি পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে পারে।

ছবি: দোলনায় দোল খাওয়া হচ্ছে পর্যাবৃত্ত গতির একটি উদাহরণ

পর্যাবৃত্ত গতি (Periodic Motion)

আমরা এতক্ষণ সরল গতি, বক্র গতি এবং ঘূর্ণন গতির কথা বলেছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই তিনটি গতির পাশাপাশি আরও একটি বিশেষ ধরনের গতি দেখতে পাই, সেটার নাম পর্যাবৃত্ত গতি বা Periodic Motion, এই গতিটিকে খুব সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। তুমি যখন দোলনায় দুলতে থাকো সেটি হচ্ছে পর্যাবৃত্ত গতির একটা উদাহরণ। পুকুরের ভেসে থাকা কচুরিপানা যখন একটা ঢেউয়ের কারণে উপরে নিচে যেতে থাকে, সেটি হচ্ছে পর্যাবৃত্ত গতির আরেকটি উদাহরণ। আবার একটা স্প্রিংয়ের সঙ্গে একটা ভর যুক্ত করে সেটাকে নিচে টেনে ছেড়ে দিলে যখন সেটা উপর-নিচ করতে থাকে, সেটাও পর্যাবৃত্ত গতির উদাহরণ। অর্থাৎ কোনো গতিশীল বস্তুর ওপর প্রয়োগ করা বল নিয়মিতভাবে দিক পরিবর্তনের কারণে যখন তার গতির পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, তখন তাকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে। পর্যাবৃত্ত গতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার একটা দোলন কাল থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট অবস্থার জন্য সেই দোলন কাল সব সময় নির্দিষ্ট থাকে, সেটাকে বাড়ানো বা কমানো যায় না। দোলন কাল পরিবর্তন করতে হলে সেই অবস্থার পরিবর্তন করতে হয়।

উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় তুমি যদি একটা ৩০ cm সুতার সঙ্গে ছোট একটা পাথর বেঁধে ঝুলিয়ে দাও, তাহলে দেখবে সেটি মোটামুটি এক সেকেন্ডে ডান থেকে বামে গিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে। তুমি জোরে বা আস্তে দুলিয়ে দিয়ে যত চেষ্টাই করো, সেটি সবসময় পুরো একবার দুলতে এক সেকেন্ড সময় নেবে। যদি সুতার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন করো শুধু তাহলে তুমি দোলনকালটার পরিবর্তন করতে পারবে।

তোমরা যখন উপরের ক্লাসে যাবে তখন পর্যায়বৃত্ত গতি সম্পর্কে আরও বিষয় জানতে পারবে। আপাতত তুমি শুধু এর গুরুত্বপূর্ণ অংশটা মনে রেখ, যেহেতু পর্যায়বৃত্ত গতিতে একটি বস্তুর গতির পরিবর্তন হয়, কাজেই তার অর্থ যে বলটি বস্তুকে গতিশীল করছে, সেই বলটিরও দিক পরিবর্তন হয়।

তোমরা কি উপরের উদাহরণগুলো বিশ্লেষণ করে বস্তুর ওপর কী বল কাজ করছে এবং কীভাবে দিক পরিবর্তন করছে, সেটি অনুমান করতে পারবে?

বেগের পরিমাপ

একটি নির্দিষ্ট সময় একটি বস্তু কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে, সেটি থেকে আমরা বস্তুটির বেগ পরিমাপ করতে থাকি। একটা গাড়ি যদি এক ঘণ্টায় ৩৬ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে তার বেগ v আমরা ইচ্ছা করলে মিটার এবং সেকেন্ডে প্রকাশ করতে পারি।

$$v = \frac{৩৬\times১০০০}{৬০\times৬০}\ \frac{\text{মিটার}}{\text{সেকেন্ড}} = \text{১০ মিটার প্রতি সেকেন্ডে}$$

পাশের টেবিলে বিভিন্ন যানবাহনের প্রতি ঘণ্টায় সম্ভাব্য বেগ দেওয়া হয়েছে।

যানবাহন	বেগ (কিমি প্রতি ঘণ্টায়)
সাইকেল	২০
গাড়ি	১০০
প্লেন	৮০০
রকেট	৩০,০০০

এখানে তোমাদের একটি বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া যাক, আমরা ইচ্ছা করলেই কিন্তু একটি বস্তুর গতিবেগ অনির্দিষ্টভাবে বাড়াতে পারব না। একটি বস্তুর সর্বোচ্চ একটি বেগ রয়েছে, বস্তুর বেগ তার থেকে বেশি বাড়ানো সম্ভব নয়। সেই বেগটি হচ্ছে আলোর বেগ। আলোর বেগ সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার!

ত্বরণ (Acceleration)

তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে চলমান একটি বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করা না হলে বস্তুটি সমবেগে সরলরেখায় যেতে থাকে। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি, একটা বস্তুর বেগ পরিবর্তন করতে হলে বল প্রয়োগ করতে হয়। তোমরা এটাও জেনে গেছ, বস্তুর বেগ দুইভাবে পরিবর্তন করা যায়। যদি সরলরেখায় গতিশীল হয় তাহলে বস্তুর বেগ বাড়িয়ে বা কমিয়ে এবং গতিশীল বস্তুর দিক যদি পরিবর্তন হয়, তাহলেও তার বেগের পরিবর্তন হয়।

বস্তুর বেগের পরিবর্তন করার জন্য যেহেতু বল প্রয়োগ করতে হয়, তাই বলকে ভালোভাবে বোঝার জন্য বেগের পরিবর্তন খুব ভালোভাবে বুঝতে হয়। সে জন্য বেগের পরিবর্তনের জন্য আলাদা একটা নামকরণ হয়েছে, সেটি হচ্ছে ত্বরণ। যখনই বেগের পরিবর্তন হয়, আমরা বলে থাকি 'ত্বরণ' হয়েছে। সরলরেখার গতিশীল বস্তুর ত্বরণ কীভাবে পরিমাপ করা যায় আমরা এখন সেটি দেখব। দিক পরিবর্তন হলে কিংবা বক্ররেখায় গতিশীল বস্তুর ত্বরণ আমরা উপরের ক্লাসে জেনে নেব।

কতটুকু সময়ে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে, সেখান থেকে আমরা যেরকম বেগ বের করেছি ঠিক সেইভাবে কতটুকু সময়ে কতটুকু বেগের পরিবর্তন হয়েছে, সেখান থেকে আমরা ত্বরণ বের করতে পারি। অর্থাৎ,

$$\text{ত্বরণ} = \frac{\text{শেষবেগ-আদিবেগ}}{\text{অতিক্রান্ত সময়}}$$

ত্বরণ যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে বুঝতে হবে গতিবেগ আসলে কমে যাচ্ছে। কমে যাওয়া বোঝানোর জন্য অনেক সময় আমরা মন্দন কথাটা ব্যবহার করি।

অনুশীলনী ?

১। বইয়ের উদাহরণের বাইরে তুমি কি কোনো সরল, বক্র, ঘূর্ণন এবং পর্যাবৃত্ত গতির উদাহরণ দিতে পারবে?

২। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যদি ৬০০০ কিমি হয় তাহলে প্লেনে করে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে কত সময়য় লাগবে? রকেটে করে?

অধ্যায় ৮
বল ও শক্তি

ছবিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটার
সানজিদা ইসলাম

অধ্যায় ৮ বল ও শক্তি

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ বল
- ☑ ঘর্ষণ বল
- ☑ ঘর্ষণ বল বাড়ানো ও কমানোর উপায়
- ☑ সরল যন্ত্র

আমরা আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় অনেকভাবে 'বল' শব্দটা ব্যবহার করি, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় বল কথাটার একটা নির্দিষ্ট অর্থ আছে! সত্যি কথা বলতে কি তোমরা এর মধ্যে বিজ্ঞানের ভাষায় বল বলতে কী বোঝায় সেটা জেনে গেছ:

> যেটা কোনো কিছুর গতি পরিবর্তন করতে পারে অর্থাৎ কোনো কিছুর মধ্যে ত্বরণ সৃষ্টি করতে পারে, সেটাই হচ্ছে বল (Force)।

তোমরা যখন একটু উপরের ক্লাসে নিউটনের জগদ্বিখ্যাত সূত্রগুলো পড়বে, তখন দেখতে পাবে বলকে কীভাবে ত্বরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়!

বস্তুর গতি পরিবর্তন ছাড়াও বল আরও একটি কাজ করতে পারে, সেটি অনেক সময় একটা বস্তুর আকার পরিবর্তন বা বিকৃত করতে পারে। তোমরা বলপ্রয়োগ করে একটা রডকে বাঁকা করতে পারবে, একটা স্প্রিংকে লম্বা করতে পারবে কিংবা একটা তারকে প্যাঁচাতে পারবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতিমুহূর্তে বল ব্যবহার করতে থাকি। কখনও কখনও আমরা সরাসরি বল প্রয়োগ করি, কখনও কখনও কোনো একটা যন্ত্র দিয়ে বল ব্যবহার করি, আবার কখনও কখনও অপ্রয়োজনীয় বল থেকে নিজেদের রক্ষা করি।

বল সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের বল নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়, সে জন্য আমাদের সঠিক পরিমাণ বল প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। তোমরা কি জানো প্রকৃতিতে আমাদের জন্য অত্যন্ত নিখুঁত পরিমাণ বল প্রয়োগ করার ব্যবস্থা রয়েছে? সেটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ বল। তুমি যদি কোনো কিছু ওপর থেকে নিচে ফেলো, তাহলে তার ওপর সব সময় মাধ্যাকর্ষণের এই সুনির্দিষ্ট বল প্রয়োগ হতে থাকে এবং সেই সময়

ছবি: একটা ঢালের কোণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে আমরা একটা বস্তুর ওপর বেশি কিংবা কম বল প্রয়োগ করতে পারি।

ছবি: চুম্বকের আকর্ষণ বলের একটি উদাহরণ

বস্তুটি একটি নির্দিষ্ট ত্বরণে নিচে পড়তে থাকে। একটা ঢালু তলে কোনো কিছু গড়িয়ে পড়তে দিয়েও আমরা এই বলকে ব্যবহার করতে পারি। কতটুকু ঢালু হবে, সেটা বাড়িয়ে কমিয়ে আমরা বলটাকেও বাড়াতে কিংবা কমাতে পারি।

মাধ্যাকর্ষণ বল ছাড়াও আমরা আমাদের চারপাশের নানা ধরনের বল দেখতে পাই। তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ, আমরা যখন কোনো কিছুকে ধাক্কা দেই কিংবা কোনো কিছুকে টানি তখন আমরা আসলে বল প্রয়োগ করি। একটা স্প্রিংয়ের মাঝে কিছু ঝুলিয়ে দিলে স্প্রিংটি একটা বলে বস্তুটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তোমরা নিশ্চয়ই কখনও না কখনও চুম্বক ব্যবহার করেছ। চুম্বক লোহাকে একটা বল দিয়ে আকর্ষণ করে। শুধু আকর্ষণ নয়, একটা চুম্বক দিয়ে অন্য একটা চুম্বকের সমমেরুকে বিকর্ষণও করা যায়। তোমরা শীতের দিনে চিরুনি দিয়ে চুল আচঁড়ানো পর সেই চিরুনি দিয়ে কাগজের টুকরাকে একধরনের বলে আকর্ষণ করতে দেখেছ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখতে পাই না এরকম কয়েক ধরনের বলও প্রকৃতিতে কাজ করে, বড় হয়ে সেগুলো সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে।
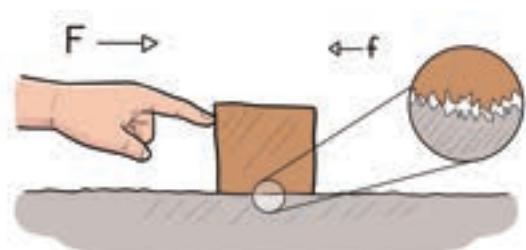
ঘর্ষণ বল (friction force)

তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে যদি ঘর্ষণের জন্য একটা বস্তুর গতিবেগ কমে না যেত, তাহলে সেটি অনন্তকাল চলতে থাকত। সে কারণেই তোমাদের অনেকের ধারণা হতে পারে, ঘর্ষণের ব্যাপারটাও বুঝি একধরনের ক্ষতিকর বল। কিন্তু সেটি পুরোপুরি সত্যি নয়। আমাদের জীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ঘর্ষণ বল কমানোর চেষ্টা করি আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বল বাড়ানোর চেষ্টা করি। সেই বিষয়গুলো দেখার আগে আমরা ঘর্ষণ বল কোথা থেকে আসে সেটি এককথায় বুঝে নিই।

তুমি যদি খুবই মসৃণ টেবিলে একটা কাঠের টুকরাকে রেখে সেটাকে বাম দিক থেকে ডান দিকে ঠেলে দাও, তাহলে সেই টুকরার উপরে ডান থেকে বাম দিকে পাল্টা একটা বল কাজ করবে, যেটা তোমার দেওয়া বলটিকে কমিয়ে দেবে। তুমি যদি কাঠের টুকরাটিকে ডান দিক থেকে বাম দিকে ঠেলে দাও, তাহলে কাঠের টুকরাটি বাম দিক থেকে ডান দিকে কাজ করে তোমার দেওয়া বলটিকে কমিয়ে দেবে। অর্থাৎ তুমি যেদিক থেকেই বল প্রয়োগ করো এটি সবসময় তার বিপরীত দিক থেকে কাজ করে বলটিকে কমিয়ে দেবে। এটাই হচ্ছে ঘর্ষণ বল।

কেন ঘর্ষণ বল এভাবে কাজ করে সেটা বোঝার জন্য কাঠের টুকরাটি যেখানে টেবিলকে স্পর্শ করেছে সেই অংশটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে বহুগুণে বড় করে দেখলে তুমি দেখতে পাবে, কাঠের যে টুকরা বা টেবিলের যে অংশটাকে মসৃণ ভেবে এসেছ, সেটি আসলে মোটেও মসৃণ নয়। সেই অংশগুলো এবড়ো-থেবড়ো এবং সেখানে অসংখ্য উঁচুনিচু খাঁজ রয়েছে। কাজেই যখন একটা খাঁজ

ছবি: অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে মসৃণ একটি তলকেও এবড়ো থেবড়ো মনে হয়।

কাটা এবড়ো-থেবড়ো অংশ একই ধরনের অন্য অংশের ওপর বসে তখন একটি খাঁজ অন্য খাঁজের ভেতরে ঢুকে যায়। যখন ধাক্কা দেওয়া হয়, তখন এই ক্ষুদ্র অংশগুলো ভেঙেচুরে নিয়ে যেতে হয়। খুবই স্বাভাবিক ভাবে আমরা তখন এক ধরনের বাধার সম্মুখীন হই, যে বাধাটিকে আমরা ঘর্ষণ বল বলে থাকি। যদি কাঠের উপরে ভারী কিছু রেখে চাপ দেওয়া হয় তাহলে ঘর্ষণ বলের পরিমাণ বেড়ে যায়। কারণ, যত চাপ দেওয়া হবে উপরের অংশের এবড়ো-থেবড়ো এবং খাঁজগুলো নিচের এবড়ো-থেবড়ো অংশ এবং খাঁজের ভেতর তত গভীরভাবে ঢুকে গিয়ে ঘর্ষণ বল তত বাড়িয়ে দেবে।

যখন ঘর্ষণ কমাতে চাই

অনেক সময়ই আমরা ঘর্ষণ বল কমাতে চাই। ঘর্ষণের কারণে তাপ সৃষ্টি হয়—শীতকালে আমরা হাত ঘষে গরম করে থাকি। গাড়ির সিলিন্ডারে ঘর্ষণের জন্য তাপ সৃষ্টি হয়—তাপ সৃষ্টি হওয়ার অর্থ শক্তি নষ্ট হওয়া। তা ছাড়া তাপটুকু সরাতে না পারলে গাড়ির ইঞ্জিন উত্তপ্ত হয়ে যায়, সে জন্য সেখানে ঘর্ষণ কমাতে হয়। গাড়ি কিংবা বিমান সব সময় এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন বাতাসের ঘর্ষণ কম থাকে। সমুদ্রে জাহাজ কিংবা সমুদ্রের তলদেশের সাবমেরিনেও পানির সঙ্গে ঘর্ষণ কমানোর চেষ্টা করা হয়। নিচে ঘর্ষণ কমানোর কয়েকটি পদ্ধতি কথা বলা হলো:

১. মসৃণ পৃষ্ঠে ঘর্ষণ কম হয় তাই যে পৃষ্ঠদেশে ঘর্ষণ হয়, সেটাকে মসৃণ করার চেষ্টা করা হয়।
২. ঘর্ষণরত দুটি তলের মধ্যে তেল, মবিল বা গ্রিজ জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঘর্ষণ কমানো যায়।
৩. চাকা যেহেতু ছোট এক জায়গায় স্পর্শ করে, তাই চাকা ব্যবহার করে ঘর্ষণ কমানো যায়।
৪. ঘুরন্ত চাকায় বল-বিয়ারিং ব্যবহার করে ঘর্ষণ কমানো যায়।

ছবি: বল বিয়ারিং দিয়ে ঘর্ষণ অনেক কমানো যায়।

ছবি: বাতাসের ঘর্ষণ ব্যবহার করে প্যারাসুট নিচে নামতে পারে।

যখন ঘর্ষণ বাড়াতে চাই

আমরা অনেক সময়ই ঘর্ষণ বাড়াতে চাই। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, ঘর্ষণ না থাকলে আমরা হাঁটতে পারতাম না, হাঁটার চেষ্টা করলে পিছলে পড়ে যেতাম। আমরা গাড়ির চাকার সঙ্গে রাস্তার ঘর্ষণ বাড়াতে চাই যেন গাড়িগুলো দৃঢ়ভাবে রাস্তা আঁকড়ে থেকে দ্রুত যেতে পারে। বাতাসের ঘর্ষণ ব্যবহার করে আমরা প্যারাসুট দিয়ে নিরাপদে নিচে নামতে পারি। নিচে ঘর্ষণ বাড়ানোর কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলা হলো:

১. যে দুটো তলে ঘর্ষণ হয়, সেই দুটো তলকে আরও খসখসে করা।
২. যে দুটো তলে ঘর্ষণ হয়, সেই দুটো তল জোরে চেপে ধরা।
৩. ঘর্ষণরত তলের মাঝে খাঁজ কাটা জুতার তলা কিংবা গাড়ির চাকায় যেটা করা হয়।
৪। ঘর্ষণরত তল দুটি স্থির থাকলে ঘর্ষণ বেশি হয় বলে সেগুলোকে স্থির রাখার ব্যবস্থা করা।

সরল যন্ত্র

তোমরা কি জানো ২০১৫ সালে বাংলাদেশে যে বিল্ডিং কোড সরকারিভাবে পাস করা হয়েছে, সেই কোড অনুযায়ী সব বিল্ডিংয়ের প্রবেশপথে একটি ramp বা হেলানো তল বসানো বাধ্যতামূলক, যেন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী যে কোনো মানুষ কারও সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে বিল্ডিংয়ের ভেতর প্রবেশ করতে পারে। ramp বা হেলানো তল এক ধরনের সরল যন্ত্র, এটি ব্যবহার করে এক ধরনের 'যান্ত্রিক সুবিধা' পাওয়া যায়।

একটি ভারী বস্তু বা হুইলচেয়ারকে উপরে তোলা খুব সহজ নয়। কিন্তু যদি একটি হেলানো তল বা ramp ব্যবহার করা হয়, তাহলে বেশ সহজেই একটি হুইলচেয়ার বা অন্য ভারী বস্তুকে উপরে তোলা যায়, বা আমরা বলতে পারি একধরনের যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।
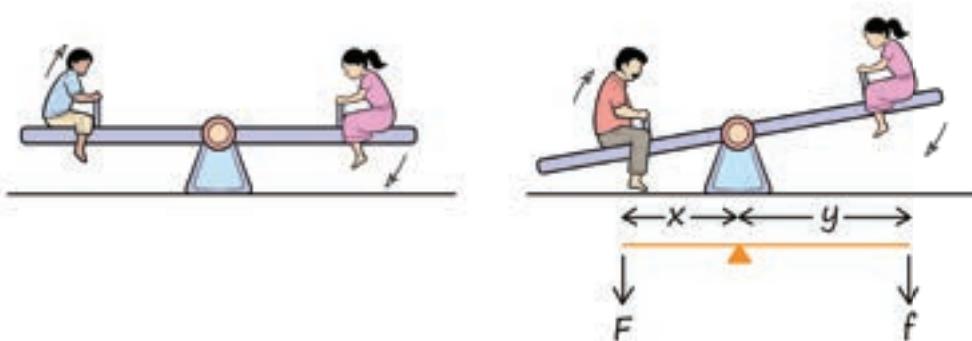
> সরল যন্ত্র বলতে আমরা এই ধরনের যন্ত্রকে বোঝাই যার গঠন খুবই সহজ এবং যেটা ব্যবহার করে ব্যবহারের সুবিধার জন্য প্রয়োগ করা বলকে বৃদ্ধি করতে পারি বা বল প্রয়োগের দিক পরিবর্তন করতে পারি। সরল যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধাটুকুকে আমরা যান্ত্রিক সুবিধা বলে থাকি।

আমাদের চারপাশে যে সরল যন্ত্র রয়েছে আমরা সেগুলো কে ৬টি ভাগে ভাগ করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে :

১. লিভার

তোমরা নিশ্চয়ই পার্কে ছেলেমেয়েদের উপর-নিচ করে খেলায় কাঠের তক্তার তৈরি সি-স (see-saw) দেখেছ। এটি দুই পাশে মুক্তভাবে নড়ার জন্য মাঝখানে একটু উচু করে বসানো হয়, তখন দুই পাশে দুজন সমান ওজনের শিশু উঠে সেটাকে নিজেদের ইচ্ছামতো উপর-নিচ করতে পারে। যদি এটির এক মাথায় একটি শিশু কিন্তু অন্য মাথায় শিশুটির থেকে অনেক বেশি ওজনের একজন বড় মানুষ বসে যায়, তাহলে শিশুটি সেটাকে আর ইচ্ছামতো উপর-নিচে করতে পারে না।

সি-স মাঝখানে যেখানে বসানো থাকে, সেটার নাম ফালক্রম। শিশুটিকে তার জায়গাতে বসিয়ে রেখেই বড় মানুষটিকে যদি ফালক্রমের কাছাকাছি নিয়ে আসা যায় তাহলে কিন্তু শিশুটি খুব সহজেই তার

ছবি: বাম দিকে সি-সয়ের দুই পাশে দুইজন সমান ওজনের শিশু। ডান পাশের ছবিতে ফালক্রামের কাছে থাকায় বেশি ওজনের বড় মানুষকে যান্ত্রিক সুবিধা ব্যবহার করে উপরে তুলতে পারে ছোট একজন শিশু!

থেকে অনেক বেশি ওজনের একজন বড় মানুষকে উপর-নিচে করতে পারবে। তার কারণ, ফালক্রমের অবস্থান দিয়ে লিভারের একধরনের যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।

লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা একটি সহজ সূত্র দিয়ে বের করা যায়। ছবিতে দেখানো উপায়ে ফালক্রমের দুই পাশের দূরত্ব যদি x এবং y হয়, তাহলে y দূরত্বটি x থেকে যতগুণ বেশি হবে, ছোট f বল প্রয়োগ করে ততগুণ বেশি বড় F বলকে সামাল দেওয়া যাবে।

অর্থাৎ

$$\frac{x}{y} = \frac{f}{F}$$

যান্ত্রিক সুবিধা:
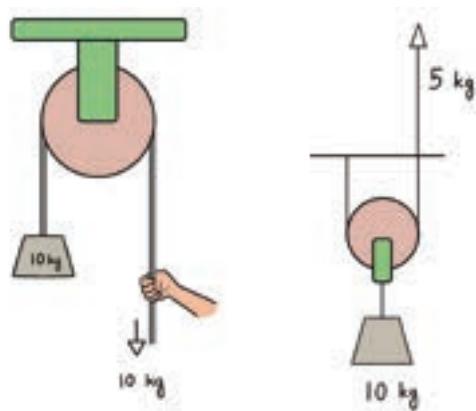
$$\frac{F}{f} = \frac{y}{x}$$

লিভারের এই যান্ত্রিক সুবিধার বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস বলেছিলেন, ‘আমাকে মহাকাশে একটা দাঁড়ানোর জায়গা করে দাও, আমি পৃথিবীটাকে নাড়িয়ে দেব!’

২. কপিকল

তোমাদের স্কুলের জাতীয় পতাকা তোলার সময় তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, তোমাদের শিক্ষক একটি দড়িকে নিচের দিকে টানছেন, তখন অন্যদিকে পতাকাটি উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। কারণ, পতাকাকে বাঁধা দড়িটি একটি কপিকলের ভেতর দিয়ে ঘুরে এসেছে। পাশের ছবিতে তোমাদের দুটি কপিকলের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। প্রথম ছবিতে কপিকলের এক পাশে একটি ১০ কেজি ওজন আছে। অন্য পাশ থেকে একজন দড়ি দিয়ে ওজনটিকে টেনে উপরে তুলছে। এখানে যখন দড়িটি টেনে নামানো হচ্ছে, তখন ওজনটি উপরে উঠে যাচ্ছে। এখানে আমরা বল প্রয়োগের দিক পরিবর্তন করে ফেলছি, নিচের দিকে বলপ্রয়োগ করে ওজনটিকে উপরে তুলে ফেলেছি—এটি একধরনের যান্ত্রিক সুবিধা হতে পারে।

ছবি: বাম পাশের ছবিতে বল প্রয়োগের দিক পরিবর্তিত করা হয়েছে। ডান পাশের ছবিতে কম বল প্রয়োগ করে বেশি ওজনের বস্তুকে উপরে তোলা হচ্ছে।

দ্বিতীয় ছবিতে ওজনটি ঝোলানো আছে কপিকল থেকে, কিন্তু সেটি কোথাও লাগানো নেই বলে মুক্তভাবে নড়তে পারে। এখানে ওজনটিকে উপরে তুলতে হলে আমাদের দড়িটিকে উপরে টানতে হবে। দড়িটি টেনে যতটুকু উপরে তোলা হবে ওজনটি তার অর্ধেক দূরত্ব উপরে উঠবে। সে জন্য আমরা একটি যান্ত্রিক সুবিধা পাব—ওজনটিকে অর্ধেক বল প্রয়োগ করে উপরে তুলে ফেলতে পারব।

৩. হেলানো তল

এই অধ্যায়ের শুরুতে হুইলচেয়ারে বিল্ডিংয়ের ঢোকার জন্য ramp বা হেলানো তল নামে সরল যন্ত্রের কথা ইতোমধ্যে তোমাদের বলা হয়েছে। তোমরা নিজেরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, একটা খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য; কিন্তু যদি তলটির ঢাল অনেক কম হয়, সেটা দিয়ে উপরে ওঠা তুলনামূলকভাবে সহজ। কাজেই একটা যান্ত্রিক সুবিধা বের করার জন্য কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে কতটুকু উচ্চতায় ওঠা যায়, তার তুলনা বের করতে হয়।
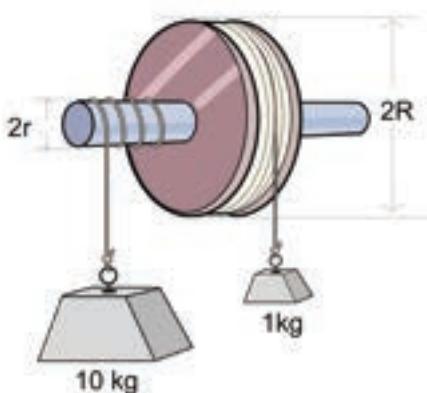
ছবি: হেলানো তল ব্যবহার করে একজন খুব সহজেই হুইল চেয়ারে উপরে উঠে যেতে পারে।

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{অতিক্রান্ত উচ্চতা}}$$

একটি হুইল চেয়ার ওঠানোর জন্য যান্ত্রিক সুবিধা কমপক্ষে ১২ হওয়া প্রয়োজন।

৪. চাকা এবং অক্ষ
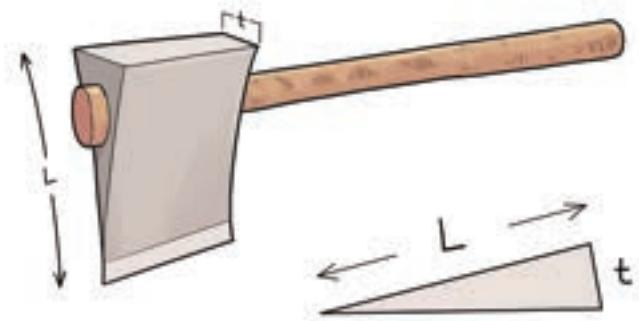
তোমরা সবাই চাকা দেখেছ এবং সবাই জানো যে চাকা একটা অক্ষের সাপেক্ষে ঘোরে। যদি একটা চাকার ব্যাসার্ধ বড় হয় এবং তার তুলনায় অক্ষের ব্যাসার্ধ ছোট হয়, তাহলে এই অক্ষ-চাকার সমন্বয়টি একটা সরল যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কল্পনা করে নাও একটা বড় চাকা এবং তার অক্ষদণ্ড দুটিতেই এমনভাবে দড়ি প্যাঁচানো আছে যে বড় চাকার দড়ি টেনে সেটাকে ঘোরালে অক্ষদণ্ডটি ঘুরতে থাকে এবং সেখানে অন্য একটা দড়ি প্যাঁচাতে থাকো। এখন তুমি যদি অক্ষদণ্ডে একটা ভারী ওজন বেঁধে দাও তাহলে দেখবে বড় চাকাটিকে দড়ি টেনে ঘুরিয়ে তুমি সহজেই সেটাকে টেনে তুলতে পারবে। যদি বড় চাকার ব্যাসার্ধ অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের দশ গুণ হয় তাহলে তুমি ১০ কেজি ওজনকে ১ কেজির সমান বলপ্রয়োগ করে টেনে তুলতে পারবে। অর্থাৎ যান্ত্রিক সুবিধা হচ্ছে:

ছবি: সরু অক্ষের উপর ঝুলানো ভারী ওজন বড় চাকার উপর ঝুলানো কম ওজন দিয়ে উপরে তোলা সম্ভব।

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{বড় চাকার ব্যাসার্ধ}}{\text{অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধ}}$$

৫. ফাল বা wedge
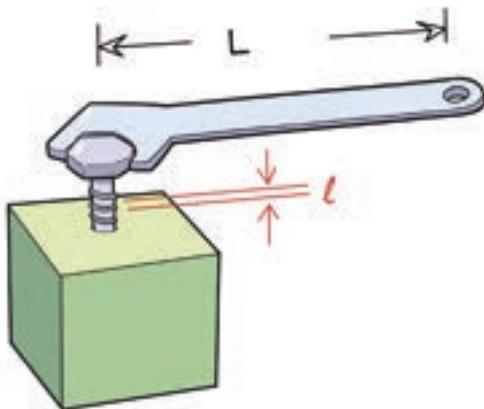
তোমরা নিশ্চয়ই কুড়াল দেখেছ। তোমরা কি কখনো কুড়ালের ফলাটি লক্ষ্য করেছ? যদি করে থাকো, তাহলে দেখবে কুড়ালের ফলার মাথাটি সরু এবং ক্রমে সেটি চওড়া হয়ে গেছে। কুড়ালের ফলার এই বিশেষ আকার হওয়ার কারণে এটি ব্যবহার করলে একটি যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়। কাঠ কাটার সময় কুড়াল দিয়ে আঘাত করলে তুমি যত বলে আঘাত করবে, কুড়ালের ফলাটি তার থেকে বেশি বলে কাঠের ভেতরে ঢুকে যাবে। ফলার দৈর্ঘ্য যদি L এবং ফলাটি যদি t পুরু হয় তাহলে তার যান্ত্রিক সুবিধা হচ্ছে:

ছবি: কুড়ালের ফলা ফাল বা wedge এর উদাহরণ।

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ফলার দৈর্ঘ্য}}{\text{ফলার পুরুত্ব}} = \frac{L}{t}$$

৬. স্ক্রু

তোমরা সবাই স্ক্রু দেখেছ কিংবা ব্যবহার করেছ। একটা স্ক্রুর মাঝে খাঁজকাটা থাকে এবং সেটাকে ঘুরিয়ে একটা কঠিন বস্তুর মাঝে ঢোকানো যায়। স্ক্রুর মাথায় একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে ঘুরিয়ে সেটাকে গর্তে ঢোকানো যায়। যদি স্ক্রু ড্রাইভারের গোড়ায় কোনোভাবে একটা লম্বা দণ্ড লাগিয়ে স্ক্রুটাকে ঘোরানো যেত, তাহলে সেটাকে আরও সহজে সেটির গর্তে ঢোকানো যেত। অর্থাৎ এখানে যান্ত্রিক সুবিধা পেতে হলে একটা দীর্ঘ দণ্ড লাগিয়ে নিয়ে সেটাতে ঘোরাতে হবে, রেঞ্চে যেভাবে সেটা করা হয়। তোমরা লক্ষ করে থাকবে একটা গাড়ির চাকার বোল্ট খোলার সময় রেঞ্চটাকে প্রয়োজনে একটা পাইপ ঢুকিয়ে লম্বা করে নেওয়া হয়। এখানে যান্ত্রিক সুবিধাটুকু রেঞ্চের দৈর্ঘ্য (L) এবং দুটো খাঁজের মাঝখানের দূরত্বের (ℓ) ওপরে নির্ভর করে।

ছবি: একটি রেঞ্চের দৈর্ঘ্য যত বড় হবে তত বেশি যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাবে।

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{রেঞ্চের দৈর্ঘ্য}}{\text{দুটো খাঁজের মাঝখানের দূরত্ব}} = \frac{L}{\ell}$$

অনুশীলনী ?

প্রশ্ন: নিচে নানা ধরনের যন্ত্রের ছবি দেওয়া হয়েছে, কোনটি কোন ধরনের সরল যন্ত্র বলতে পারবে?

শক্তি (Energy)

আমরা সবাই শক্তি শব্দটার সঙ্গে পরিচিত। কোনো কিছুর ক্ষমতা অনেক বেশি হলে আমরা সেটাকে শক্তিশালী কিংবা বলশালী বলি। তোমরা কি জানো বিজ্ঞানের ভাষায় কিন্তু শক্তি এবং বল কথা দুটোর সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে এবং শক্তি এবং বল সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় বুঝিয়ে থাকে।

বল বলতে কী বোঝায় তোমরা সেটা এর মধ্যে জেনে গেছ। যেটি গতি পরিবর্তন করতে পারে সেটা হচ্ছে বল। যেটা কোনো ধরনের 'কাজ করতে পারে' সেটা হচ্ছে শক্তি। এখানে কাজ বলতে বল প্রয়োগ করে কোনো কিছুকে নাড়ানো বোঝানো হয়। উপরের ক্লাসে উঠে তোমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

গতি শক্তি

পৃথিবীতে নানা ধরনের শক্তি আছে। যেমন তাপ এক ধরনের শক্তি, আলো এক ধরনের শক্তি, বিদ্যুৎ এক ধরনের শক্তি, শব্দ একধরনের শক্তি। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে পরিচিত শক্তি হচ্ছে গতি শক্তি। যে কোনো বস্তুকে গতিশীল করলেই তার ভেতরে এক ধরনের শক্তি সৃষ্টি হয়, সেই শক্তিটার নাম হচ্ছে গতি শক্তি। তোমরা নিশ্চয়ই বিষয়টা নানাভাবে অনুভব করেছ, একটা ইটের ওপর একটা হাতুড়ি রাখলে কিছুই হয় না, কিন্তু তুমি যদি হাতুড়িটাকে প্রচণ্ড বেগে ইটের ওপর আঘাত করো, এটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তার কারণ গতি শক্তির কারণে হাতুড়িটার মধ্যে একটা শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। একটা বস্তুর ভর যদি m হয় আর সেটা যদি v বেগে যায়, তাহলে তার গতি শক্তি হবে:

$$\text{গতিশক্তি} = \frac{1}{2} m(v \times v)$$

একটি গাড়ি যদি ঘণ্টায় 40 কিলোমিটার বেগে যায় তাহলে তার একটা গতিশক্তি থাকবে। গাড়িটার গতিবেগ যদি দ্বিগুণ করে ফেলা যায়, তাহলে তার শক্তি কিন্তু দ্বিগুণ বাড়বে না, সেটি বাড়বে চার গুণ। এ জন্য গাড়ি দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতির একটা বড় কারণ গতিবেগ। একটা গাড়ি যখনই বেশি গতিতে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনায় পড়ে তখন ক্ষয়ক্ষতি হয় অনেক বেশি।

ছবি: দুর্ঘটনার শিকার একটি গাড়ির ভাস্কর্য

শক্তির রূপান্তর

শক্তির কিন্তু ধ্বংস নেই, আবার সৃষ্টিও নেই, এটির শুধু রূপান্তর আছে। কাজেই যদি একটা গাড়ি স্থির অবস্থা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে গতিশীল হয়, তাহলে তার মধ্যে যে শক্তি সৃষ্টি হয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো শক্তি থেকে রূপান্তরিত হয়েছে। তুমি কি বলতে পারবে সেই শক্তিটি কোথা থেকে রূপান্তরিত হয়েছে?

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে সেই শক্তিটি সৃষ্টি করেছে গাড়ির ইঞ্জিন এবং সেটি সৃষ্টি করার জন্য ইঞ্জিন ব্যবহার করেছে গাড়ির জ্বালানি- পেট্রোল, ডিজেল অথবা গ্যাস। এই জ্বালানিতে যে শক্তি সঞ্চিত আছে আমরা সেটাকে বলি রাসায়নিক শক্তি। এই রাসায়নিক শক্তিটাও এসেছে বহু লক্ষ বছরে পৃথিবীর

তাপ এবং চাপ থেকে।

রাসায়নিক শক্তি আমাদের পরিচিত শক্তি। আমাদের টেলিফোনের ব্যাটারির মধ্যে যে রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত থাকে, ব্যবহারের সময় সেটা বৈদ্যুতিক শক্তি হিসেবে বের হয়ে আসে। যখন সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি কমে আসে, তখন ব্যাটারি চার্জ করার সময় আমরা বিদ্যুৎপ্রবাহ করিয়ে বিদ্যুৎ শক্তিকে আবার রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা করে রাখতে পারি।

আমরা যখন ঘরে বাতি জ্বালাই তখন বৈদ্যুতিক শক্তিকে আলোতে রূপান্তর করি, যখন হিটার ব্যবহার করি তখন তাপে রূপান্তর করি, যখন লাউডস্পিকারে গান শুনি তখন সেটাকে শব্দে রূপান্তরিত করি, যখন ফ্যান চালাই তখন তাকে গতি শক্তিতে রূপান্তর করি। কাজেই তোমরা একটু চিন্তা করলেই দেখবে শক্তির জন্ম নেই কিংবা ধ্বংস নেই; কিন্তু এটি শুধু এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়।

স্থিতি শক্তি

একটা ব্যাটারির ভেতর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা রাখা যায় এবং প্রয়োজনে সেটাকে ব্যবহার করা যায়। আমরা চাইলে অন্যভাবেও এভাবে শক্তি জমা করতে পারি। একটা ছোট পাথরের টুকরা মেঝের ওপরে থাকলে সেটার ভেতরে কোনো শক্তি নেই কিন্তু যদি পাথরের টুকরাটাকে তুলে একটা টেবিলের ওপর রাখা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পাথরের টুকরোর মধ্যে এক ধরনের স্থিতি শক্তি জমা হয়ে যাবে। কারণ, আমরা যদি টোকা দিয়ে পাথরের টুকরাটিকে টেবিল থেকে নিচে ফেলে দিই, তাহলে নিচে পড়ার সময় সেটির ভেতরে গতি সৃষ্টি হবে—যত বেশি নিচে পড়বে, তত বেশি গতিশীল হবে। আমরা এখন জানি, গতি থাকলেই গতিশক্তি থাকে, কাজেই পাথরের টুকরাটির মধ্যে গতিশক্তি সৃষ্টি হবে। এই গতিশক্তি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হয়েছে পাথরের টুকরাটি টেবিলের উপরে তোলার কারণে।

স্থিতি শক্তিকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে। যেখানে নদী অথবা হ্রদে বাঁধ দিয়ে পানি জমা করে রাখা হয়, তারপর অনেক উচ্চতা থেকে সেই পানি নিচে নামিয়ে এনে সেই শক্তিকে ব্যবহার করে সেটা দিয়ে জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়।
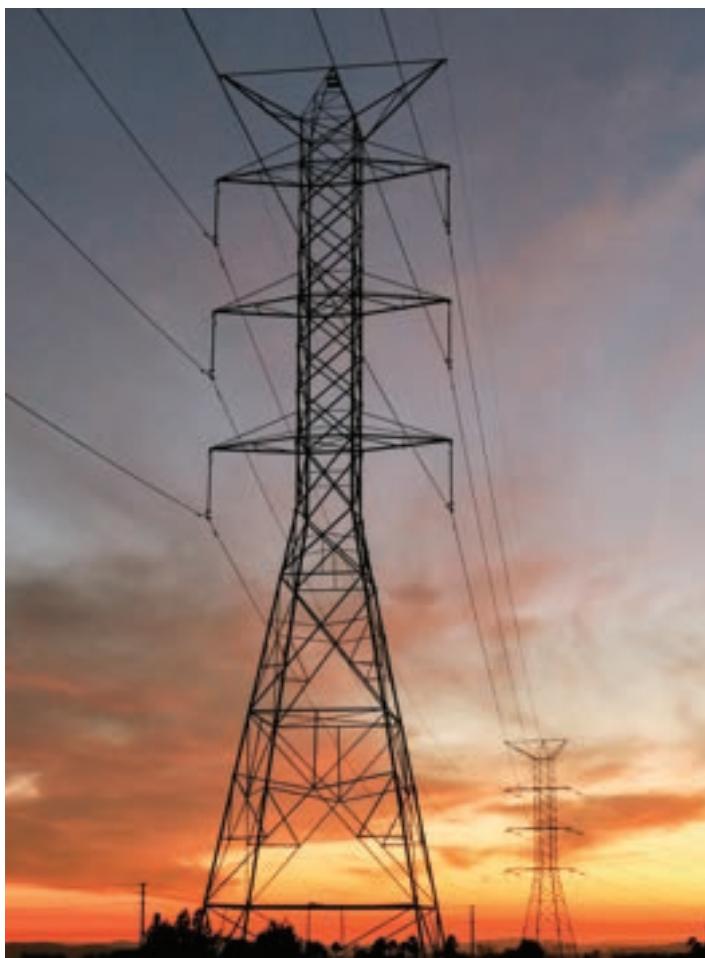
ছবি: কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

শক্তির পরিমাপ

শক্তির এককের নাম জুল। প্রতি সেকেন্ডে এক জুল শক্তি ব্যয় করা হলে, সেটাকে বলে ওয়াট। তোমরা জুল এককটির নাম না শুনে থাকলেও নিশ্চয়ই ওয়াট শব্দটির নাম শুনেছ। যে কোনো ব্যবহারিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কিনলে তুমি দেখবে, সেখানে লেখা থাকে সেই যন্ত্রটির জন্য কত ওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হয়।

শক্তির পরিবহন

আমরা যত ধরনের শক্তির সঙ্গে পরিচিত তার মধ্যে ব্যবহার করার জন্য সবচেয়ে সহজ শক্তিটির নাম হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ ব্যবহার করে খুব সহজে লাইট জ্বালানো যায়, ফ্যান ঘোরানো যায়, ফ্রিজ চালানো যায়, কম্পিউটার ব্যবহার করা যায়। সে কারণে শহরে গ্রামে এমনকি দুর্গম অঞ্চলেও আমাদের সবার বাসায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। সে জন্য বিদ্যুৎকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হয় এবং সেটাকে সকল বাসা, কলকারখানা, অফিস বা স্কুল এবং কলেজে ছড়িয়ে দিতে হয়। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ বিদ্যুতের লাইন দিয়ে খুব যত্ন করে এবং সতর্কভাবে সব জায়গায় বিদ্যুৎ বিতরণ করা হয়। আমরা গ্যাসকেও পাইপ দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরবরাহ করি এবং বিতরণ করি। গ্যাস সরাসরি শক্তি না হলেও এটার সঞ্চিত শক্তি থেকে তাপ সৃষ্টি হয়, সেই তাপ দিয়ে অন্য শক্তি সৃষ্টি করা হয়।

ছবি: বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চালন করা হয় হাই ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক লাইন দিয়ে।

ইতিহাসের সবচেয়ে চমকপ্রদ সূত্র
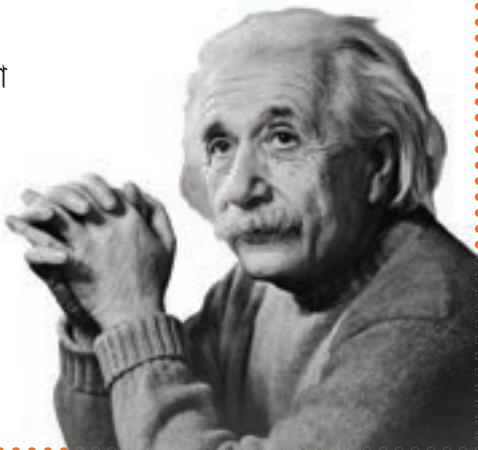
ইতিহাসের সবচেয়ে চমকপ্রদ এবং সবচেয়ে বিখ্যাত সূত্রটি শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন শক্তির এই সূত্রটি দিয়েছেন। এই সূত্র অনুযায়ী বস্তুর ভর ও শক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যদি বস্তুর ভর m হয় এবং আলোর গতি c হয়, তাহলে এই ভরকে শক্তিতে রূপান্তর করলে শক্তির পরিমাণ E হবে:

$$E = m(c \times c)$$

আলোর বেগ যেহেতু অনেক বেশি, তাই ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা হলে সেটি অচিন্তনীয় পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি করে। সূত্রটি লেখার সময় $c \times c$ না লিখে সহজ করে c^2 লেখা হয়, অর্থাৎ প্রকৃত জগদ্বিখ্যাত সূত্রটির রূপ হচ্ছে এরকম,

$$E = mc^2$$

নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে এভাবে শক্তি তৈরি করা হয়। সূর্য যদি সাধারণ জ্বালানি দিয়ে শক্তি তৈরি করত তাহলে অনেক আগেই সূর্যের সব জ্বালানি শেষ হয়ে এটি নিভে যেত, কিন্তু সূর্যের মধ্যেও $E = mc^2$ প্রক্রিয়ায় শক্তি তৈরি হয় বলে এটি ৫ বিলিয়ন বছর ধরে শক্তি দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও ৫ বিলিয়ন বছর শক্তি দিয়ে যাবে!

অনুশীলনী ?

১। স্পর্শ না করে বল প্রয়োগ করা সম্ভব এরকম কয়েকটি বলের উদাহরণ দাও।

২। পৃথিবীতে যদি ঘর্ষণ বল না থাকতো তাহলে তোমার দৈনন্দিন জীবনটি কেমন হতো বর্ণনা করো।

৩। ১ কেজি ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে সেই শক্তি দিয়ে কতগুলো ১০০ ওয়াটের বাল্বকে ২৪ ঘণ্টা জ্বালিয়ে রাখা যাবে?

অধ্যায় ৯

সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের ঘূর্ণন ও তাদের আপেক্ষিক অবস্থান

সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের ঘূর্ণন ও তাদের আপেক্ষিক অবস্থান

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ দিন-রাত ও ঋতু পরিবর্তন
- ☑ আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি
- ☑ ভৌগোলিক রেখা
- ☑ ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়ার পার্থক্য
- ☑ পৃথিবীর ওপর চাঁদের প্রভাব
- ☑ সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের আপেক্ষিক অবস্থান
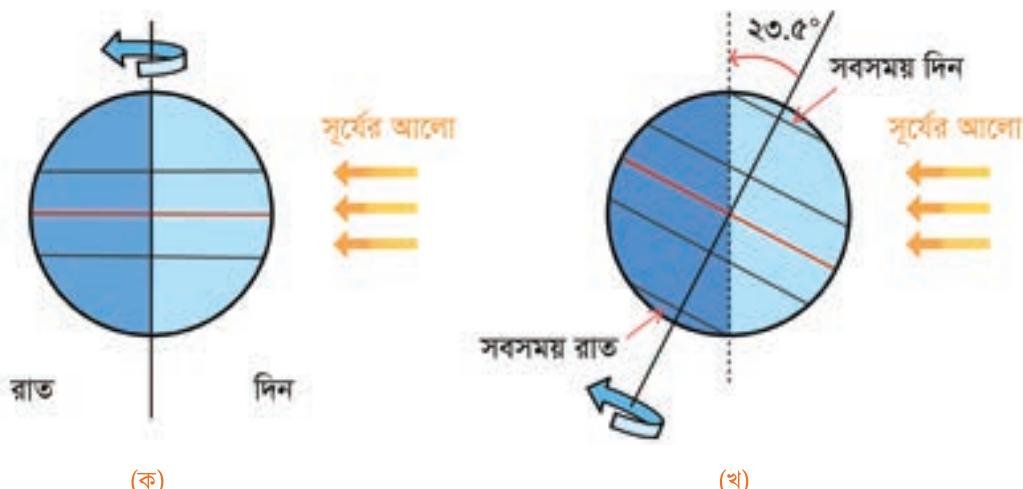
সৌরজগতে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। আবার চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সে কারণে বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদের আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অমাবস্যা-পূর্ণিমা এবং ঋতুর পরিবর্তন ঘটে থাকে।

দিন-রাত ও ঋতু পরিবর্তন

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবে যে বছরের সব সময় দিন এবং রাত সমান দৈর্ঘ্যের হয় না। গ্রীষ্মকালে দিনগুলো হয় লম্বা, বিকেলে স্কুল ছুটির পর খেলাধুলার জন্য অনেকটা সময় পাওয়া যায়। আবার শীতকালে দিন হয় ছোট, দেখা যায় সূর্য উঠতে সকালে অনেক দেরি হয়, আবার সন্ধ্যা অনেক তাড়াতাড়ি নেমে আসে। এ সবকিছুই হয় পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণন বা আহ্নিক গতি এবং সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতির কারণে।

আহ্নিক গতি

মহাকাশে পৃথিবী স্থির নয়, সেটি তার নিজের অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এই ঘূর্ণনের দিক হচ্ছে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে (ছবি ১) সে জন্য আমরা সূর্যকে পূর্বদিকে উদয় হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে দেখি। এই ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সূর্য থেকে আসা আলো এবং অন্ধকারের একটি চক্র ২৪ ঘণ্টায় সমাপ্ত হয় যাকে আমরা দিন-রাত বলি। পৃথিবী যদি পুরোপুরি খাড়াভাবে নিজ অক্ষে ঘুরত তাহলে পুরো পৃথিবীর সব জায়গায় ১২ ঘণ্টা দিন এবং ১২ ঘণ্টা রাত হতো। কিন্তু পৃথিবীর অক্ষ যেহেতু ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে নিজ অক্ষের উপর ঘোরে, তাই কোথাও দিন লম্বা, কোথাও ছোট, এমনকি উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি একটানা অনেকদিন ধরে দিন এবং অনেকদিন ধরে রাত থাকতে পারে।

(ক) পৃথিবী যদি তার অক্ষে খাড়াভাবে ঘুরতো তাহলে সবজায়গায় ১২ ঘণ্টা দিন এবং ১২ ঘণ্টা রাত হতো। ঋতুর কোনো পরিবর্তন হতো না (খ) পৃথিবী যেহেতু তার কক্ষপথের সাপেক্ষে ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে ঘুরে কোথাও লম্বা এবং কোথাও ছোট দিন পাওয়া যায়।

বার্ষিক গতি

পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে একবার ঘুরে আসে। প্রতি বছরে ৩৬৫ দিনের পর বাড়তি ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড থেকে যাওয়ায় চার বছর পর সেটি বেড়ে বেড়ে প্রায় একদিনের সমান হয়ে যায় তাই সেটাকে হিসেবের মধ্যে আনার জন্য চার দিয়ে বিভাজ্য বছরগুলোতে ফেব্রুয়ারি মাসে ১ দিন যোগ করে ২৮ এর বদলে ২৯ দিনে মাস গণনা করা হয়। এই বছরগুলোকে লিপ ইয়ার বলে। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর একটি পূর্ণাঙ্গ আবর্তনকালকে বার্ষিক গতি বলা হয়। আমরা এই সময়কে পৃথিবীতে একটি বছর হিসেবে গণনা করি।

তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ পুরোপুরি খাড়া না হয়ে ২৩.৫° (সাড়ে তেইশ ডিগ্রি) হেলে থাকার কারণে দিন-রাতের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়। সূর্যের আলো যেখানে যত খাড়া বা লম্বভাবে পড়বে, সেই স্থান তত বেশি সূর্যের উত্তাপ পাবে এবং গরম হবে। আবার বছরের অন্য সময় যখন সূর্যের আলো বাঁকাভাবে পড়বে, তখন সূর্যের আলো অনেক বড় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে বলে কম উত্তাপ পাবে।

সে কারণে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়। তবে আগে আমরা দেখি পৃথিবীর অক্ষ ২৩.৫° কোণে হেলে থাকা বলতে কী বোঝায়। পৃথিবীর কক্ষপথকে যদি আমরা একটি সমতল পৃষ্ঠ বা থালা হিসেবে ধরি তবে তার ওপর একটি লম্ব কল্পনা করলে পৃথিবীর কক্ষপথ সেই লম্বের সঙ্গে ২৩.৫° কোণ তৈরি করবে।

ভৌগোলিক রেখা

পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণ করার জন্য তার ওপর কয়েকটি কাল্পনিক রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেখাটির নাম বিষুব রেখা এবং এটি পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। বিষুব রেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভাগ করেছে। এর পরের গুরুত্বপূর্ণ রেখা দুটির নাম কর্কট ক্রান্তি এবং মকর ক্রান্তি। কর্কট ক্রান্তি রেখাটি বিষুব রেখার সাপেক্ষে ২৩.৫ ডিগ্রি উত্তরে এবং মকর ক্রান্তি ২৩.৫ ডিগ্রি দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত (ছবি)। তোমরা জেনে খুশি হবে যে কর্কট ক্রান্তি রেখাটি আমাদের বাংলাদেশের ঠিক মাঝখান দিয়ে গেছে এবং সে কারণে বছরের নির্দিষ্ট দিনে আমরা কিছু চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা পেয়ে থাকি! বিষুব রেখা ছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক রেখা আছে, সেগুলো সম্পর্কে তোমরা পরে জানতে পারবে।

ছবি: পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থা বিশ্লেষণ করার জন্য সেটিকে বিষুব রেখা, কর্কট ক্রান্তি এবং মকর ক্রান্তি এরকম কয়েকটি কাল্পনিক রেখায় ভাগ করা হয়েছে।

ঋতু
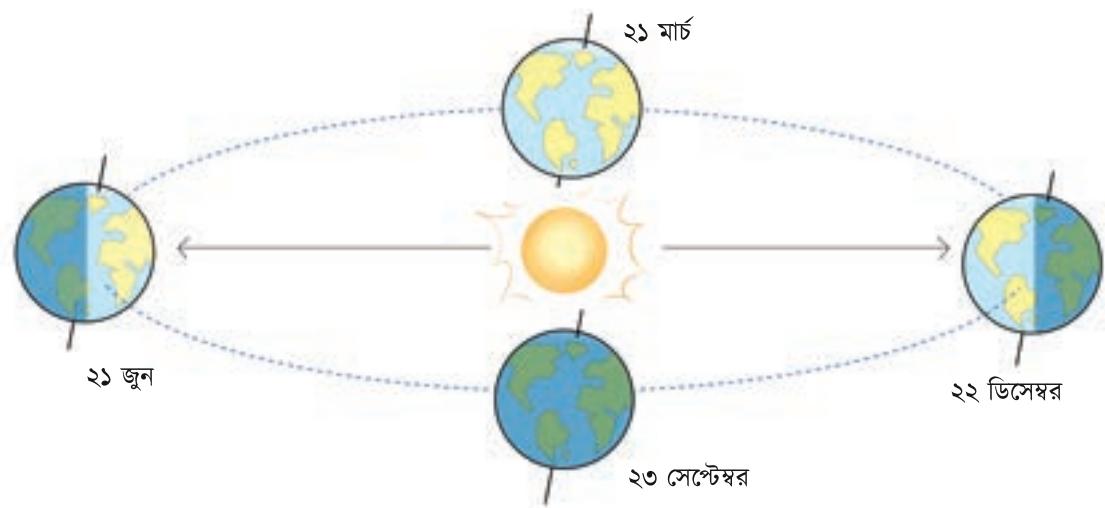
পৃথিবীর বছরের ৩৬৫ দিনকে আবহাওয়া, দিন-রাতের দৈর্ঘ্য এবং প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। বছরের এই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত সময়গুলো ঋতু নামে পরিচিত। বেশিরভাগ দেশে পুরো বছরকে শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎ এই চারটি ঋতুতে ভাগ করা হয়। আমাদের দেশ খুবই বিরল কয়েকটি দেশের একটি যার নিজস্ব ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জি আছে এবং সেই অনুযায়ী বাংলা মাস ব্যবহার করে পুরো বছরকে নিচের ছয়টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে।

- গ্রীষ্ম: বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল মাঝামাঝি —জুন মাঝামাঝি)
- বর্ষা: আষাঢ় ও শ্রাবণ (জুন মাঝামাঝি —আগস্ট মাঝামাঝি)
- শরৎ: ভাদ্র ও আশ্বিন (আগস্ট মাঝামাঝি —অক্টোবর মাঝামাঝি)
- হেমন্ত: কার্তিক ও অগ্রহায়ণ (অক্টোবর মাঝামাঝি —ডিসেম্বর মাঝামাঝি)
- শীত: পৌষ ও মাঘ (ডিসেম্বর মাঝামাঝি —ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি)
- বসন্ত: ফাল্গুন ও চৈত্র (ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি —এপ্রিল মাঝামাঝি)

বিষুব রেখার কাছাকাছি অঞ্চলকে বিষুবীয় অঞ্চল বলে, সেখানে সারা বছরই সূর্যের আলো মোটামুটি খাড়া ভাবে পতিত হয় বলে ঋতুর পরিবর্তন খুব ভালোভাবে অনুভূত হয় না।

পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ার সময় বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে আপতিত হয়। যেমন ২১ জুন সূর্যের আলো কর্কট ক্রান্তির ওপর একেবারে খাড়াভাবে আপতিত হয় (ছবি), সেই দিনটি উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে লম্বা দিন। লম্বা দিন এবং খাড়াভাবে সূর্যের আলো পড়ার জন্য এই সময়টি উত্তর গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল। আবার এই সময়টিতে দক্ষিণ গোলার্ধের মকর ক্রান্তি রেখার ওপর থেকে সূর্যকে দেখলে মনে হবে সূর্যটি উত্তরদিকে ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে হেলে আছে। দিনগুলো ছোট এবং রাত দীর্ঘ। ছোট দিন এবং হেলে থাকা সূর্যের আলোর কারণে তখন দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য শীতকাল ।

ছবি: ২১ জুন সূর্যের আলো কর্কট ক্রান্তির ওপর খাড়াভাবে আপতিত হয় এই সময়টি উত্তর গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য শীতকাল । ২২ ডিসেম্বর সূর্যের আলো মকর ক্রান্তির ওপর খাড়া ভাবে আপতিত হয় এবং সেটি দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল এবং উত্তর গোলার্ধের জন্য শীতকাল ।

তারপরের ছয় মাস সূর্যকে ঘিরে আবর্তন করার সময় পৃথিবীতে সূর্যের আলো কর্কট ক্রান্তির ওপর থেকে দক্ষিণ দিকে সরে যেতে থাকে এবং ঠিক ছয়মাস পরে ২২ ডিসেম্বর সূর্যের আলো মকর ক্রান্তির ওপর ঠিক খাড়া ভাবে আপতিত হয়। সেখানে দিন দীর্ঘ এবং খাড়াভাবে সূর্যের আলো থাকার কারণে সেটি দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য গ্রীষ্মকাল। তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ তখন কর্কট ক্রান্তির ওপর থেকে তাকালে মনে হবে সূর্য হেলতে হেলতে দক্ষিণ দিকে সবচেয়ে বেশি ২৩.৫ ডিগ্রি হেলে গেছে।

২১ জুন এবং ২২ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, অর্থাৎ ২১ মার্চ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর সূর্যের আলো আপতিত হয় কর্কট ক্রান্তি এবং মকর ক্রান্তি রেখার ঠিক মাঝখানে, অর্থাৎ বিষুব রেখার ওপর। বুঝতেই পারছ তখন দিন এবং রাত হয় ঠিক ১২ ঘণ্টা করে। এর ফলে এই সময় ঠান্ডা ও গরমের মাঝামাঝি একটা আবহাওয়া অনুভূত হয়। প্রাচীন অনেক সভ্যতার মানুষের কাছে এই দিনগুলো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি এই দিনগুলো মেনে পালন করা হতো।

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে আবহাওয়ার পার্থক্য
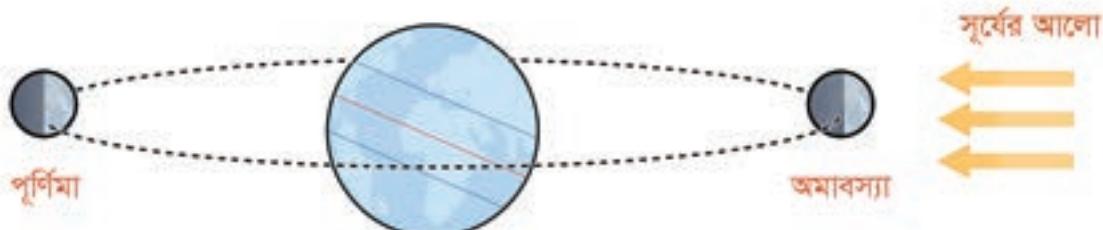
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া দেখা যায়। যেমন বাংলাদেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত বেশ ভালোভাবে অনুভূত হয়। বর্ষাকালে আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার মেরু অঞ্চলের শীতের সঙ্গে আমাদের দেশের শীতের তুলনা চলে না। মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি এলাকাগুলোতে বছরের অনেকটা সময় শীত থাকে। এমনকি কিছু কিছু এলাকা সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে। আফ্রিকা, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশের আবহাওয়া মূলত গ্রীষ্মপ্রধান এবং শুষ্ক। এই যে বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া বিভিন্ন রকম হয়, তা মূলত নির্ভর করে সেই এলাকার অবস্থান, জলাশয় বা পানির উপস্থিতি, উদ্ভিদের তথা বনাঞ্চলের উপস্থিতি ইত্যাদির ওপর। তবে সবকিছুর মূলে রয়েছে সৌরশক্তির (আলো এবং তাপ) কতটকু পাওয়া যাবে তার ওপর। বিষুবরেখা, কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি রেখা ও তার কাছাকাছি এলাকায় সূর্যরশ্মি লম্বভাবে বা ৯০° কোণের কাছাকাছি কোণে পড়ে বলে সেসব এলাকায় আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে থাকে। আবার মেরু অঞ্চল এবং তার সংলগ্ন এলাকায় সূর্যরশ্মি তির্যক বা বাঁকাভাবে পড়ে বলে সেখানে উষ্ণতা কম এবং শীত বেশি হয়ে থাকে।

তবে কোনো এলাকার উচ্চতাও সেই এলাকার আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে পারে। যেমন উঁচু পর্বতে তাপমাত্রা একই অক্ষাংশের সমতলভূমির তাপমাত্রার তুলনায় অনেক কম হতে পারে। এর কারণ হলো, বায়ুমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা নিচের স্তরে যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, বায়ুর তাপমাত্রা তত কমতে থাকে।

পৃথিবীর ওপর চাঁদের প্রভাব

চন্দ্রকলা
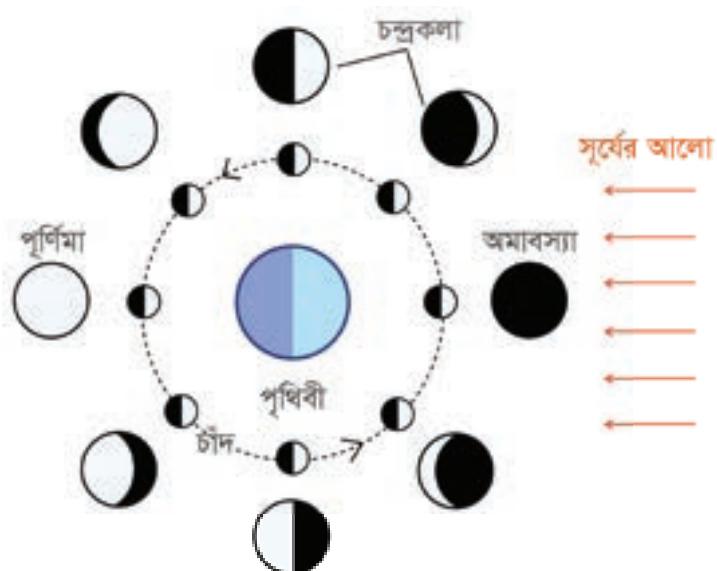
তোমরা সবাই আকাশে চাঁদ দেখে মুগ্ধ হয়েছ। পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য সূর্যের মতোই চাঁদ পূর্ব দিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এক দিন থেকে পরের দিন সূর্যের আকার আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু আমরা চাঁদের আকৃতির পরিবর্তন হতে দেখি। পূর্ণিমার ভরা চাঁদ ক্ষীণ হতে হতে অমাবস্যায় পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার নতুন চাঁদ ধীরে ধীরে বড় হয়ে পূর্ণিমার চাঁদে পরিণত হয়। আসলে চাঁদের আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না, চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই, সূর্যের আলো চাঁদের যে অংশে পড়ে, আমরা সেই অংশটা দেখতে পাই। এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ার সময়

ছবি: সূর্যের আলো দিয়ে পুরো চাঁদ আলোকিত হলে আমরা পূর্ণিমা বলে থাকি। চাঁদের বিপরীত দিক আলোকিত হলে আমরা চাঁদকে দেখতে পাই না এবং আমরা সেটাকে অমাবস্যা বলি।

সূর্যের সাপেক্ষে তার অবস্থানের জন্য চাঁদের আলোকিত অংশের আকার প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। চাঁদের আলোকিত অংশের এই পরিবর্তনের একটি সুন্দর নাম আছে, সেটি হচ্ছে 'চন্দ্রকলা'।

চন্দ্রকলার বিষয়টি বোঝার জন্য সূর্য এবং পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদ কোথায় আছে সেটি জানতে হয়। পৃথিবীকে ঘিরে ঘূর্ণনের সময় চাঁদ যখন পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে থাকে, সূর্যের আলো তখন চাঁদের পিছন দিকটি আলোকিত করে, পৃথিবী থেকে আমরা সেই আলোকিত অংশটি দেখতে পাই না বলে চাঁদ আমাদের সামনে অদৃশ্য থাকে এবং আমরা সেই

ছবি: ভেতরের বৃত্তটিতে চাঁদের প্রকৃত অবস্থান এবং তার আলোকিত অংশটি দেখানো হয়েছে। বাইরের বৃত্তটিতে পৃথিবী থেকে চাঁদকে দেখলে কেমন দেখাবে বা চন্দ্রকলা দেখানো হয়েছে।

সময়টাকে বলি অমাবস্যা। চাঁদটি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে যখন ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে, তখন চাঁদের আলোকিত অংশটুকু পৃথিবী থেকে একটু একটু দেখা যেতে শুরু করে। চাঁদের আলোকিত অংশটুকু দৃশ্যমান হতে হতে যখন চাঁদ সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবীর পেছনে থাকে, তখন পুরো চাঁদটি দৃশ্যমান হয় এবং আমরা সেটিকে পূর্ণিমার চাঁদ বলি। চাঁদের ঘূর্ণনের কারণে আবার চাঁদের দৃশ্যমান অংশটুকে কমতে কমতে একসময় অমাবস্যায় পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায়। চাঁদের দৃশ্যমান অংশ যখন বাড়তে থাকে, সেই সময়কে বলে শুক্লপক্ষ; যখন কমতে থাকে, তাকে বলে কৃষ্ণপক্ষ।

চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে প্রতি ২৭ দিন ৮ ঘণ্টায় একবার পূর্ণ আবর্তন করে বা ঘুরে আসে। কিন্তু একটি নতুন চাঁদ থেকে পরের নতুন চাঁদ দেখতে সময় নেয় ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা। তার কারণ চাঁদ যখন পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হয়, সেই সময়টাতে পৃথিবীটাও সূর্যকে ঘিরে খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করে আসে তাই সূর্যের সাপেক্ষে চাঁদকে একই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য একটু বেশি আবর্তিত হতে হয়। তোমরা যারা আকাশে চাঁদকে লক্ষ করেছ তারা নিশ্চয়ই জানো আমরা সব সময়েই চাঁদের একটি পৃষ্ঠ দেখি, অন্য পৃষ্ঠটি কখনো দেখতে পাই না। তার কারণ চাঁদ এমনভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যে চাঁদের এক পাশ সব সময় পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে। সাম্প্রতিককালে চন্দ্রাভিযান করার সময় চাঁদের পেছন দিকের ছবি তুলে আনায় আমরা প্রথমবার সেটি দেখতে পেয়েছি।
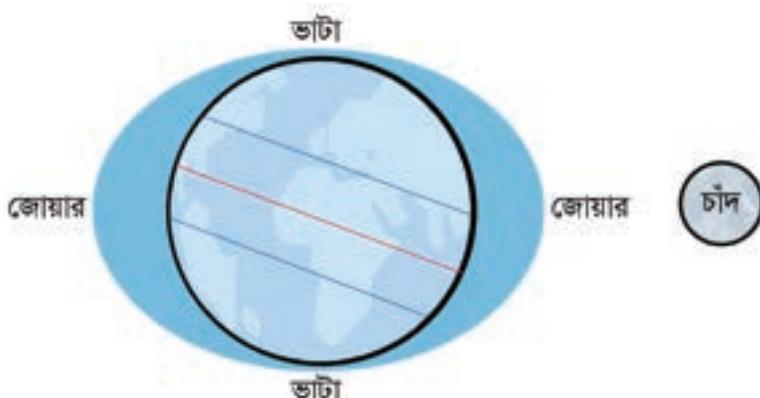
ছবি: আমরা বাম দিকে দেখানো চাঁদের পৃষ্ঠ দেখে অভ্যস্ত। মহাকাশযান দিয়ে তোলা চাঁদের বিপরীত দিকের ছবিটি ডান দিকে দেখানো হলো।

জোয়ার ও ভাটা (Tide)

তোমাদের মধ্যে যারা সমুদ্রের কাছাকাছি এলাকায় থাকো, তারা নিশ্চয় দেখে থাকবে যে সেখানে সমুদ্র এবং নদনদীর পানি দিনে দুই বার করে বাড়ে এবং কমে। উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্র এবং নদীর পানির স্তরের নিয়মিত এই ওঠা এবং নামাকে যথাক্রমে জোয়ার এবং ভাটা বলা হয়। তোমরা সবাই জানো, মহাকর্ষ বলের জন্য সবকিছুই অন্য সবকিছুকে আকর্ষণ করে। সেই হিসেবে সূর্য এবং চাঁদও পৃথিবীর সবকিছুকে আকর্ষণ করে। যদিও পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্যের আকর্ষণ চাঁদের আকর্ষণ থেকে অনেক বেশি, কিন্তু বিস্ময়করভবে পৃথিবীর জোয়ার ভাটার বিষয়টি মুলত ঘটে থাকে চাঁদের আকর্ষণের জন্য। তার কারণ পৃথিবীতে মোট আকর্ষণের পরিমাণ নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আকর্ষণের পার্থক্য জোয়ার-ভাটা ঘটিয়ে

ছবি: চাঁদের আকর্ষণে যখন পৃথিবীর পানি ফুলে ওঠে তাকে জোয়ার বলে। পানি ফুলিয়ে তোলার জন্য অন্য জায়গা থেকে পানি সরে আসে এবং সেটাকে ভাটা বলে।

থাকে। সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক দূরে থাকার কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তার আকর্ষণের পার্থক্য কম। কিন্তু চাঁদ তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর অনেক কাছে, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে চাঁদের আকর্ষণের পার্থক্য অনেক বেশি। সে জন্য চাঁদ পৃথিবীর যে অংশের ঠিক উপরে থাকে, সেই জায়গার পানিকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে স্ফীত করে তোলে এবং আমরা সেটাকে বলি জোয়ার। আবার একই সময়ে চাঁদের অবস্থানের একেবারে বিপরীত দিকে পানির ওপর বল সবচেয়ে কম, সেখানে বিপরীত দিকে বল কাজ করছে কল্পনা করা যায়, তাই সেখানেও উল্টো দিকে পানি স্ফীত হয়ে জোয়ার হয়। একই সময়ে দুই পাশে পানির স্তর স্ফীত করার জন্য যে অংশের পানির স্তর নেমে যায় তাকে ভাটা বলে। জোয়ারের মতো সেই স্থানের একেবারে উল্টোদিকেও একই সঙ্গে ভাটা হয়। অর্থাৎ এক দিনে চারবার সাগর, মহাসাগর এবং উপকূলবর্তী এলাকার নদনদীর পানি ওঠানামা করে। সেই ক্ষেত্রে ছয় ঘণ্টা পর পর জোয়ার-ভাটা হওয়ার কথা, কিন্তু আমাদের যেহেতু চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং সময়ের সাথে সাথে চাঁদের অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে সেজন্য ছয় ঘণ্টার কিছু বেশি সময় পর জোয়ার-ভাটা হয়।

যদিও জোয়ার ও ভাটা মূলত চাঁদের কারণে হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে সূর্যের অবস্থানেরও একটু ভূমিকা আছে। যখন চাঁদ পৃথিবী এবং সূর্য এক সরলরেখায় অবস্থান করে, তখন জোয়ারের পানি একটু বেশি ফুলে উঠে এবং ভাটার পানি বেশি নেমে যায়। কারণ এক্ষেত্রে সূর্য এবং চাঁদের আকর্ষণ বল একই সরলরেখায় কাজ করে বলে পানি বেশি আকর্ষিত হয়। এই অবস্থাকে ভরা কটাল বলে। প্রতি পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় ভরা কটাল হয়।

আবার যখন সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদ সমকোণে অবস্থান করে, তখন সূর্যের অবস্থানের কারণে পানির স্তর কিছুটা সূর্যের দিকে ফুলে উঠে। এ জন্য জোয়ারের পানি কিছুটা কম উঁচুতে ওঠে এবং ভাটার পানি কিছুটা কম নামে। অর্থাৎ জোয়ার ভাটার তীব্রতা কমে যায়। এই অবস্থাকে মরা কটাল বলে।

ছবি: অমাবস্যা আর পূর্ণিমাতে যখন সূর্য আর চাঁদ একই সরল রেখায় থাকে, তখন জোয়ার এবং ভাটার তীব্রতা বেশি হয় এবং সেটাকে ভরা কটাল বলে।

সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের আপেক্ষিক অবস্থান

সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদের অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে জোয়ার ভাটা, চন্দ্রকলা ছাড়াও আরও দুটি ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলো হলো সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ।

ছবি: সূর্যগ্রহণ
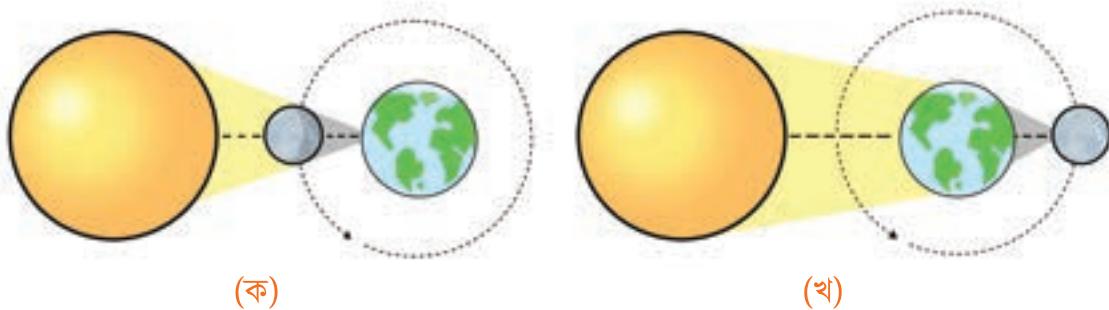
সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ

যেহেতু সূর্যগ্রহণ খুব বেশি হয় না, তাই সম্ভবত তোমরা সূর্যগ্রহণ খুব বেশি দেখার সুযোগ পাওনি, কিন্তু তোমাদের নিশ্চয়ই কখনও না কখনও পূর্ণ কিংবা আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। চন্দ্রগ্রহণের সময় পূর্ণিমার ভরা চাঁদ হঠাৎ একটা গোলাকৃতি ছায়ায় ঢেকে যেতে থাকে। পূর্ণ নাকি আংশিক চন্দ্রগ্রহণ তার ওপর নির্ভর করে পুরো কিংবা আংশিক চাঁদ ঢেকে যায়। আবার সূর্যগ্রহণ হয় অমাবস্যার সময়, তখন সূর্যটা একটা বৃত্তাকার ছায়ায় ঢেকে যেতে থাকে। অনেক সময় দিনের বেলায় অন্ধকার নেমে একটা রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কাজেই এটা মোটেও বিচিত্র কিছু নয় যে প্রাচীন কালে মানুষ যখন চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণের সময় আসলে কী হয় সেটি জানত না, তাই তারা নানা ধরনের বিচিত্র কুসংস্কার দিয়ে তারা বিচিত্র গল্প তৈরি করত!

ছবি: পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়
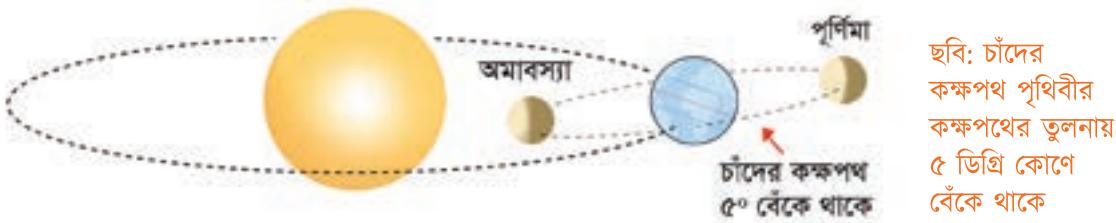
এখন আমরা জানি বিষয়টি আসলে খুবই সহজ, চাঁদ যেহেতু পৃথিবীকে ঘিরে ঘোরে, তাই ঘুরতে ঘুরতে প্রতি অমাবস্যাতেই এটি সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে চলে আসে। ঘটনা ক্রমে যদি পৃথিবী চাঁদ এবং সূর্য একই সরল রেখায় হাজির হয়, তখন চাঁদের কারণে সূর্যটা ঢাকা পড়ে এবং এই ঘটনাকে সূর্যগ্রহণ বলে। যদি সূর্য চাঁদের দ্বারা পুরোপুরি ঢেকে যায়, তবে তাকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বলে। যদি চাঁদের দ্বারা সূর্য আংশিক ঢাকা পড়ে অর্থাৎ চাঁদের আংশিক ছায়া পৃথিবীতে পড়ে, তখন আংশিক সূর্যগ্রহণ হয়।

ছবি: (ক)চাঁদ যখন অমাবস্যায় সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে চলে আসে, তখন সূর্য ঢাকা পড়ে যায় যেটাকে আমরা বলি সূর্যগ্রহণ (খ) পূর্ণিমার রাতে চাঁদে যখন পৃথিবীর ছায়া পড়ে, আমরা সেটাকে বলি চন্দ্রগ্রহণ

ঠিক একইভাবে চাঁদ প্রতি পূর্ণিমাতে পৃথিবীর পেছনে উপস্থিত হয় এবং তখন যদি ঘটনাক্রমে চাঁদ পৃথিবী এবং সূর্য একই সরল রেখায় চলে আসে, তখন চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে এবং আমরা সেটাকে চন্দ্রগ্রহণ বলি। যদি চাঁদ পৃথিবীর ছায়ায় পুরোপুরি ঢেকে যায়, তবে তাকে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ বলে। যদি পৃথিবীর ছায়ার দ্বারা চাঁদ আংশিক ঢাকা পড়ে অর্থাৎ পৃথিবীর আংশিক ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে, তখন আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হয়।

তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে কেন প্রতি অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ হয় না? চাঁদ যদি পৃথিবীর কক্ষপথের একই তলে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করত, তাহলে প্রতি পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ দেখা যেত। কিন্তু চাঁদ যেহেতু পৃথিবীর সাপেক্ষে ৫ ডিগ্রি কোণে প্রদক্ষিণ করে, তাই সেটি প্রতি অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে সূর্য আর পৃথিবীকে সংযুক্ত করে সরল রেখায় উপস্থিত হতে পারে না। তবে আগে থেকে হিসাব করে আমরা কবে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হবে সেটি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। ১৫০৩ সালের ৩০ জুন ক্রিস্টোফার কলম্বাস জামাইকার সরলপ্রাণ আদিবাসী মানুষদের চন্দ্রগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করে সেটিকে ঈশ্বরের অভিশাপ বলে ভয় দেখিয়ে তাদের প্রতারণা করে নিজেদের খাদ্য এবং রসদের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ছবি: চাঁদের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের তুলনায় ৫ ডিগ্রি কোণে বেঁকে থাকে

অনুশীলনী ?

১। আকাশে যদি ছবিতে দেখানো চাঁদটি দেখো তাহলে তুমি কি বলতে পারবে, চাঁদটি কি শুক্লপক্ষের চাঁদ নাকি কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ?

২। কর্কট ক্রান্তি রেখাটি বাংলাদেশের কোন এলাকার উপর দিয়ে গিয়েছে সেটি কি তোমরা বের করতে পারবে?

৩। তোমাদের বাসার ছাদে যদি সোলার প্যানেল লাগাতে চাও তাহলে সেটি কোন দিকে মুখ করে থাকতে হবে এবং কেন?

অধ্যায় ১০

পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং এর বাহ্যিক প্রভাব

অধ্যায় ১০

পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং এর বাহ্যিক প্রভাব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য
- ☑ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ
- ☑ ধাতু ও অধাতুর ব্যবহার, সতর্কতা এবং সংরক্ষণ কৌশল
- ☑ পরীক্ষার সাহায্যে ধাতু এবং অধাতুর তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পরিমাপন
- ☑ পরীক্ষার সাহায্যে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়
- ☑ ধাতু ও অধাতুর আকার বিকৃতি
- ☑ শীতলীকরণ (Cooling) প্রক্রিয়া
- ☑ পরীক্ষামূলক কাজের সময় নিরাপত্তা এবং সতর্কতা

পদার্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ

তোমরা আগেই জেনেছ যে পদার্থ স্থান দখল করে ও তার ভর রয়েছে এবং প্রকৃতিতে পদার্থকে কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়—এই তিনটি অবস্থায় পাওয়া যায়। পদার্থের এরকম তিনটি অবস্থা ছাড়াও তার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন, ঘনত্ব, দ্রাব্যতা, দৃঢ়তা, নমনীয়তা, তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, চৌম্বকত্ব ইত্যাদি।

ঘনত্ব

তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে একক আয়তনে বস্তুর ভরকে ঘনত্ব বলে। ঘনত্ব বস্তুর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ বিভিন্ন পদার্থের ঘনত্ব বিভিন্ন রকম, কোনোটি বেশি কোনোটি কম। যেমন লোহা, তামা, পিতল এরকম ধাতব পদার্থের ঘনত্ব বেশি, কাঠ বা প্লাস্টিকের ঘনত্ব তার তুলনায় কম এবং বাতাসের ঘনত্ব সবচেয়ে কম।

দ্রাব্যতা

পদার্থের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার দ্রাব্যতা, যে বিষয়টি সম্পর্কে তোমরা পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত জানতে পারবে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয় কিন্তু তেলে সহজে দ্রবীভূত হয় না। আবার নেইল পলিশ পানিতে দ্রবীভূত হয় না কিন্তু এসিটোনে খুব সহজে দ্রবীভূত হয়।

দৃঢ়তা ও নমনীয়তা

যখন তুমি বিভিন্ন বস্তুকে হাত দিয়ে চাপ দেবে তখন দেখতে পাবে সেগুলোর মধ্যে কিছু সহজেই

সংকুচিত হয়ে আসছে এবং কিছু খুবই শক্ত, যেগুলোকে সহজে সংকুচিত করা যাচ্ছে না। এই সংকোচন ধর্মের মাধমেই আমরা বলি কোনো পদার্থ নরম, কোনোটি শক্ত, কোনোটি নমনীয়, কোনোটি আবার অনমনীয়। নিচের কাজের মাধ্যমে এই বিষয়টি আরও সহজে বুঝতে পারবে:

কাজ: একটি ধাতব চাবি নাও এবং সেটার সাহায্যে এক টুকরা কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম, পাথর, মোম, চক, রাবারসহ যেকোনো বস্তুর উপর দাগ দেওয়ার চেষ্টা করো। কিছু বস্তুর উপর তুমি সহজেই দাগ দিতে পারবে এবং কিছু বস্তুতে সহজে পারবে না। এখন, তোমার পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে শক্ত, নরম, নমনীয় ও অনমনীয় পদার্থের একটি ছক তৈরি করো। যেসব পদার্থ সহজে সংকুচিত এবং দাগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে সেগুলোকে নরম এবং যেগুলো সহজে সংকুচিত হয়নি এবং দাগ দেওয়া খুব কঠিন মনে হয়েছে সেগুলোকে শক্ত বস্তু বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোম নরম, অন্যদিকে লোহা হলো শক্ত পদার্থ।

তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণ পদার্থের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম। যে সকল পদার্থে তাপ সহজে পরিবহণ করা যায় তাদেরকে তাপ পরিবাহী পদার্থ এবং যে সকল পদার্থে তাপ সহজে পরিবহণ করা যায় না তাদেরকে তাপ অপরিবাহী পদার্থ বলা হয়। একইভাবে যেসব পদার্থে বিদ্যুৎ সহজে পরিবহণ করা যায় তাদেরকে বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ এবং যে সকল পদার্থে বিদ্যুত সহজে পরিবহণ করা যায় না সেগুলোকে বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থ বলা হয়। সোনা, রূপা, তামা কিংবা অ্যালুমিনিয়াম একই সঙ্গে তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থের উদাহরণ।

চৌম্বকত্ব

তোমরা সবাই নিশ্চয়ই চুম্বক দেখেছ, না হয় ব্যবহার করেছ। কিছু কিছু পদার্থের চৌম্বকত্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেগুলো অন্য চৌম্বকীয় পদার্থকে আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ করতে পারে। লোহা, নিকেল কিংবা কোবাল্ট হচ্ছে চৌম্বকীয় পদার্থের উদাহরণ।

বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পদার্থ শনাক্তকরণ

যেহেতু বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাই সেগুলো ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন পদার্থকে শনাক্ত করতে পারি। যেমন কোনো পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকর্ষিত হলে আমরা বলতে পারব সেটি নিশ্চয়ই একটি চৌম্বকীয় পদার্থ। যদি সেটি তাপ এবং বিদ্যুৎ পরিবাহিত করে সেটি সম্ভবত একধরনের ধাতব পদার্থ। যদি নির্দিষ্ট কোনো ধরনের তরলে দ্রবীভূত হয়, তাহলেও আমরা পদার্থটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারব। পদার্থের ঘনত্বও আমাদেরকে পদার্থ শনাক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করে।

পদার্থের বৈশিষ্ট্য জানার মাধ্যমে সঠিক কাজে সঠিক জিনিস ব্যবহার

তুমি যদি বাড়িঘর বানাতে চাও তাহলে ইট, পাথর আর লোহার দরকার হয়; যদি নৌকা বানাতে চাও, তাহলে কাঠের প্রয়োজন হবে। আবার অ্যালুমিনিয়াম তাপ পরিবাহী এবং সহজলভ্য বলে রান্নার কাজে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিল ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ পরিবহণের জন্য আমরা বিদ্যুৎ পরিবাহী তামার তার ব্যবহার করি। আবার বই ছাপানোর জন্য কাগজ কিংবা শিশুদের খেলনা তৈরি করার জন্য ব্যাপকভাবে হালকা কিন্তু টেকসই প্লাস্টিক ব্যবহার করি। এভাবে দেখা যায় প্রতিটি জিনিসেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য জানার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক কাজে ব্যবহার করা যায়।

ধাতু ও অধাতু

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সেগুলো কিছু মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। এই মৌলিক পদার্থগুলোর সবগুলোকেই ধাতু অথবা অধাতুতে ভাগ করা যায়। সুতরাং ধাতু এবং অধাতু সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন তোমরা ধাতু এবং অধাতুর কিছু ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে।

ধাতুসমূহের ভৌতধর্ম

ধাতুগুলো সাধারণত উচ্চ ঘনত্বের, চকচকে এবং তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী হয়ে থাকে। পারদ ব্যতিক্রমী তরল পদার্থ, অন্য সকল ধাতু কঠিন পদার্থ। সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম নরম এবং চাকু দিয়ে কাটা যায়, এ ছাড়া অন্য সকল ধাতু শক্ত। ধাতু ঘাতসহ এবং নমনীয় বলে সেগুলোকে চাপ দিয়ে পাত কিংবা টেনে লম্বা তারে পরিণত করা যায়। সোনা, রূপা, তামা কিংবা অ্যালুমিনিয়াম কয়েকটি পরিচিত ধাতুর উদাহরণ।

অধাতুসমূহের ভৌতধর্ম

অধাতুগুলো ধাতুর মতো ভৌতধর্ম প্রদর্শন করে না। যেমন, এগুলো চকচক করে না, সাধারণত তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী, এবং ভঙ্গুর বলে ঘাতসহ প্রসারণশীল নয় তাই চাপ দিয়ে পাত কিংবা টেনে লম্বা তার তৈরি করা যায় না। এগুলোর ঘনত্ব কম, এবং নাইট্রোজেন বা অক্সিজেনের মতো অনেক অধাতু সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায়। কার্বন (কয়লা) আমাদের পরিচিত একটি অধাতু।

ধাতুর বিভিন্ন ধর্ম ও তার পরীক্ষা

চকচকে ভাব

কাজ: অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র, প্লাস্টিকের স্কেল, কাঠের স্কেল এবং ইস্পাতের স্কেল নাও। এগুলোকে সূর্যালোকে রেখে দাও। তারপর লক্ষ করে দেখো কোনগুলো চকচক করে এবং কোনগুলো করে না। পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো একটি ছকে লেখ।
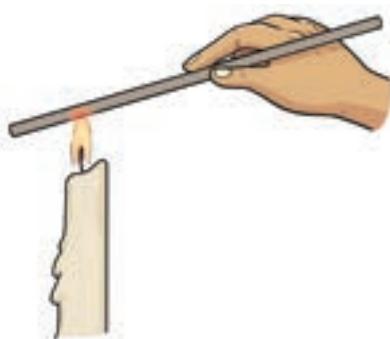
তাপ পরিবাহিতা

তাপ পরিবাহিতা বলতে কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে অথবা সংস্পর্শে থাকা দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে তাপের আদান-প্রদান ঘটাকে বোঝায়। তাপ সব সময় বেশি তাপমাত্রা থেকে কম তাপমাত্রায় পরিবাহিত হয়। এই পরিবহণের জন্য যদি সুপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাহলে তাপ তাড়াতাড়ি প্রবাহিত হবে। যদি তাপ অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাহলে তাপের প্রবাহ হবে ধীরে ধীরে। অধাতুর তুলনায় ধাতুগুলো সাধারণত তাপ-সুপরিবাহী, সেজন্য সেগুলো তাপ পরিবহণে খুবই কার্যকর। ধাতুগুলোর তাপ পরিবাহিতার প্রমাণ হিসেবে তুমি নিচের পরীক্ষাটি করে দেখতে পারো:

প্রয়োজনীয় উপকরণ: অ্যালুমিনিয়াম বা যেকোনো ধাতব দণ্ড অথবা পাতলা ধাতব তার, দিয়াশলাই এবং মোমবাতি।

কাজ: প্রথমে মোমবাতিটি জ্বালাও। এবার সাবধানে ধাতব দণ্ড বা তারটির এক প্রান্তে হাত দিয়ে ধরে অপর প্রান্ত মোমবাতির আগুনে ধরো। এভাবে, যতক্ষণ না হাতে গরম অনুভব করো, তারটি ধরে থাকো।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন তুমি তোমার হাতে ধরা প্রান্তে গরম অনুভব করেছ? ধাতব দণ্ড বা তার তাপ সুপরিবাহী বলে মোমবাতি-শিখার প্রান্তে শোষণ করা তাপ তোমার ধরে রাখা প্রান্তে পরিবাহিত হয়েছে। আসলে সব ধাতুই তাপ সঞ্চালন করে।

তাপ পরিবাহী হিসেবে ধাতুর ব্যবহার

ক), রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, সোলার প্যানেল এগুলোতে তাপের পরিবহণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই ধরনের যন্ত্রে নানা ধরনের তাপ সুপরিবাহী ধাতু ব্যবহার করা হয়।
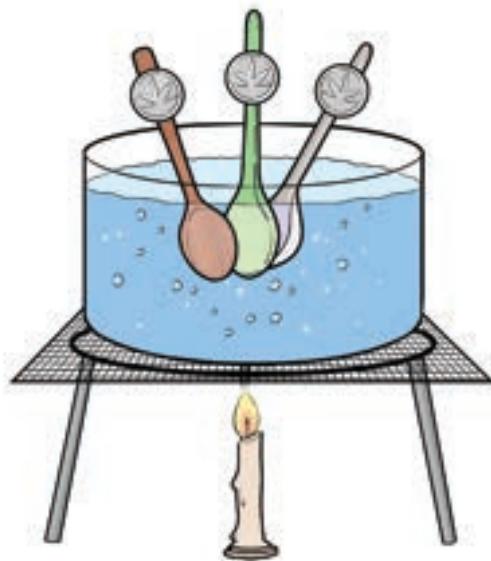
খ) ইলেকট্রনিকস, প্রকৌশলে, ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা যন্ত্র, গৃহস্থালির যন্ত্রপাতি এ ধরনের শিল্প এবং বিশেষ করে নির্মাণশিল্পে ধাতু ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

কাজ: ভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিতা যে ভিন্ন নিচের পরীক্ষাটি দিয়ে তুমি সেটি পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি: মোটামুটি একই আকারেরে একটি কাঠের চামচ, একটি প্লাস্টিকের চামচ, একটি ধাতব চামচ, ৩টি এক টাকার কয়েন, পানি গরম করার জন্য একটি পাত্র, এক গ্লাস পানি, তাপ দেওয়ার জন্য মোমবাতি বা অন্যকিছু, মোম, দিয়াশলাই এবং সময় মাপার জন্য যে কোনো একটি ঘড়ি।

কার্যপদ্ধতি: সামান্য তাপ দিয়ে মোম নরম করো। সবগুলা চামচের হাতলে সামান্য পরিমাণে নরম মোম লাগাও। এখন কয়েনগুলো চামচের ওপর মোমের গায়ে এমনভাবে চাপ দিয়ে বসাও যাতে কয়েনগুলো মোমের গায়ে লেগে থাকে। এবার চামচগুলো এমনভাবে পাত্রে ডুবাও যেন কয়েনগুলো পাত্রের উপরের অংশের বাইরে থাকে। তারপর মোমবাতি বা অন্য কিছু দিয়ে পাত্রটিতে তাপ দিতে থাকো।

চামচের সঙ্গে আটকে থাকা কয়েনগুলোর অবস্থা এবার পর্যবেক্ষণ করো। কয়েনগুলো কি আলাদা হয়ে গেছে? যদি তাই হয় তবে কোনটি প্রথমে আলাদা হয়েছে? আলাদা হতে কত সময় নিয়েছে? অন্যগুলো আলাদা হতে কত বেশি সময় নিয়েছে? নিঃসন্দেহে দেখবে ধাতব চামচ থেকে প্রথমে কয়েনটি আলাদা হয়েছে। যেহেতু ধাতব চামচ থেকে প্রথমে আলাদা হয়ে গেছে, তার অর্থ ধাতব চামচটি বাকি দুটি (কাঠ এবং প্লাস্টিক) থেকে বেশি তাপ পরিবাহী।
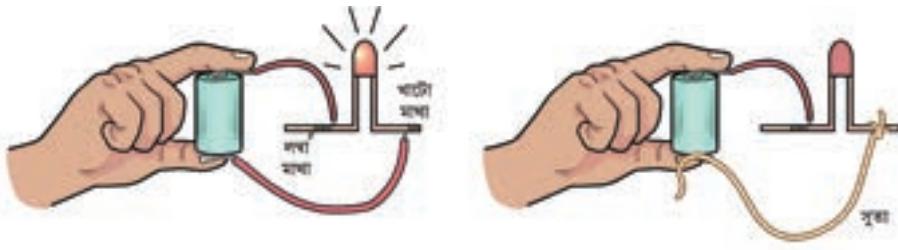
গরম পানি থেকে তাপ পরিবাহিত হয়ে ধাতব চামচের মোমে কাঠ বা প্লাস্টিকের চামচের চেয়ে দ্রুত পৌছেছে। সে কারণে ধাতব চামচের মোম দ্রুত গলে গিয়েছে এবং কয়েনটি আলাদা হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, প্লাস্টিকের পরিবাহিতা অন্যগুলোর চেয়ে কম হওয়ায়, তাপ খুব ধীরে ধীরে উষ্ণ প্রান্ত থেকে শীতল প্রান্তে পৌঁছেছে। যার ফলে দেখবে প্লাস্টিকের চামচের মোম গলতে সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছে এবং সবার শেষে এ চামচের কয়েনটি আলাদা হয়েছে।

ধাতু ও অধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

প্রায় সব ধাতুই বিদ্যুৎ পরিবাহী হলেও সেগুলোর পরিবহণ ক্ষমতা আলাদা। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, রূপা সবচেয়ে ভালো বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ এবং তামা ও অ্যালুমিনিয়ামও যথেষ্ট ভালো মানের পরিবাহী। তবে রূপার মূল্য খুব বেশি হওয়ায় বৈদ্যুতিক তার হিসেবে সেটি ব্যবহৃত হয় না, তার পরিবর্তে তামা ও অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়।

কাজ: আমরা খুব সহজেই বিভিন্ন পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পরীক্ষা করতে পারি। সেটি করার জন্য তোমার দরকার হবে একটি ব্যাটারি, কিছু তামার তার এবং একটি ডায়োড। (তুমি ইচ্ছা করলে ডায়োডের বদলে একটি টর্চ লাইটের বাল্বও ব্যবহার করতে পারো, কিন্তু আজকাল নানা রংয়ের ডায়োড খুবই সহজে অল্পমূল্যে পাওয়া যায়।) এবারে ছবিতে দেখানো উপায়ে তুমি সার্কিট তৈরি করে ডায়োডটি ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত করে সেটি জ্বালাও। তুমি দেখবে ডায়োডের ভেতর দিয়ে শুধু একদিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় বলে ব্যাটারির এক দিকে সংযুক্ত করলে ডায়োডটি জ্বলবে, অন্যদিকে সংযুক্ত করলে জ্বলবে না।

যেহেতু তামা বৈদ্যুতিক পরিবাহী, তাই এটি ব্যাটারির বিদ্যুৎকে ডায়োডের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করতে পারে এবং এই কারণে ডায়োড জ্বলে উঠে। যদি তামার তারটি বৈদ্যুতিক পরিবাহী না হতো তাহলে এটি বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে পারত না এবং ডায়োড জ্বলে উঠত না।

এবারে তুমি ছবিতে দেখানো উপায়ে তামার তারের অংশটুকুতে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, সুতা, কাগজ, রবার, প্লাস্টিক, কাঠ এমন কী পানি দিয়েও পরীক্ষা করে দেখতে পারো কী হয়! দেখবে কোথাও কোথাও ডায়োড জ্বলছে কোথাও কোথাও জ্বলছে না। যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তু দিয়ে সার্কিট সম্পূর্ণ করার পরেও ডায়োড না জ্বলে, তাহলে বুঝতে হবে সেই বস্তুটি বিদ্যুৎ পরিবাহী না।

বলপ্রয়োগে ধাতুর পরিবর্তন

তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের স্কুলের ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ শুনেছ। স্কুলের ধাতব ঘণ্টার জায়গায় যদি একটা প্লাস্টিক কিংবা কাঠের ঘণ্টা ঝোলানো হতো তাহলে নিশ্চয়ই তুমি চমৎকার ঢং ঢং ঘণ্টা শুনতে পেতে না!

আঘাত করা হলে এই বিশেষ ঢং ঢং বা ঝন ঝন শব্দ তৈরি করা ধাতুর একটি ধর্ম। ধাতুকে আঘাত করে পাত তৈরি করা যায়। তুমি শুনে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে যে এক সেন্টিমিটার ঘন কিউবের এক টুকরা সোনাকে একটা ফুটবল মাঠের সমান অতি সূক্ষ্ম পাতে বিস্তৃত করা যায়! তোমাদের রান্নাঘরে গিয়ে পুরনো অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি কিংবা কেতলি পরীক্ষা করে দেখলে দেখবে এটি নানা জায়গায় তোবড়ানো এবং এবড়ো থেবড়ো। তার কারণ ব্যবহারের সময় আঘাত পেয়ে এর আকারের পরিবর্তন হয়েছে। ধাতুর জন্য এটি খুবই সাধারণ একটি প্রক্রিয়া। ধাতু না হয়ে যদি ডেকচি কিংবা কেতলি কাচ অথবা চিনামাটির তৈরি হতো তাহলে এটি ঘটত না। তোমরা কি তোমাদের চারপাশে যা দেখো তার ভেতর থেকে আঘাত পেয়ে অথবা বল প্রয়োগ করে ধাতুর আকার পরিবর্তনের আরও কিছু উদাহরণ বের করতে পারবে?

গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক

গলনাঙ্ক এবং হিমাঙ্ক

যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থ তার অবস্থা পরিবর্তন করে তরল পদার্থে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে ওই কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক বলে। আবার যে তাপমাত্রায় একটি তরল পদার্থ তার অবস্থা পরিবর্তন করে কঠিন পদার্থে পরিণত হয় তাকে হিমাঙ্ক বলে। প্রকৃতপক্ষে গলনাঙ্ক এবং হিমাঙ্ক আসলে একই তাপমাত্রা। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় পানির তাপমাত্রা কমাতে কমাতে যখন ০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়, তখন সেটি জমে বরফ হতে শুরু করে। আবার জমাট বাধা বরফের তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে যখন সেটি যখন ০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায়, তখন সেটি গলে পানি হতে শুরু করে।
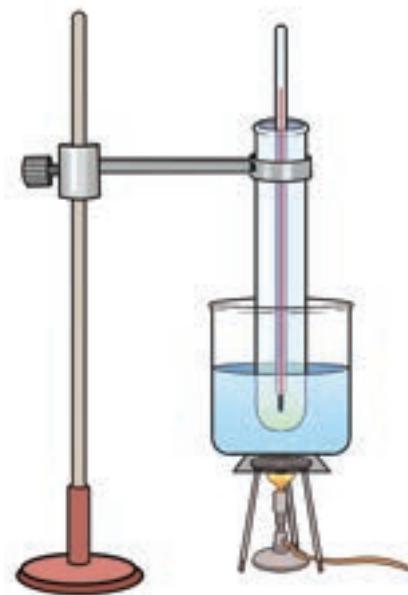
মোমের গলনাঙ্ক ৫৭°C। তুমি কিভাবে সেটি বের করবে? অথবা এটা দিয়ে কী বোঝায়? এটি বের করতে হলে তাপমাত্রা মাপার জন্য একটি থার্মোমিটার প্রয়োজন। যেহেতু জ্বর মাপার থার্মোমিটার শুধু তোমার শরীরের তাপমাত্রার কাছাকাছি তাপমাত্রা মাপতে পারে, কাজেই তোমাকে ০ ডিগ্রি থেকে ১০০ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপতে পারে সেরকম একটি থার্মোমিটার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে তোমার শিক্ষক তোমাকে সাহায্য করতে পারেন এবং স্কুলের ল্যাবরেটরিতে তোমাদের পরীক্ষাটি করে দেখাতে পারেন। যেহেতু গলনাঙ্ক এবং হিমাঙ্ক একই তাপমাত্রা কাজেই এই পরীক্ষায় একই সঙ্গে গলনাঙ্ক এবং হিমাঙ্ক বের করা হবে। যদি দুটির মধ্যে একটু খানি পার্থক্য পাওয়া যায় তাহলে সেগুলোর গড় নিলে প্রকৃত তাপমাত্রার কাছাকাছি ফলাফল পাওয়া যাবে।

কাজ:

১। একটি টেস্টটিউবে কিছু মোমের ছোট টুকরো নাও।

২। একটি বিকারে বা অন্য কোনো পাত্রে খানিকটা পানি নাও এবং তারজালি ব্যবহার করে একে ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে স্পিরিট ল্যাম্পের বা তাপ দেওয়ার উপযোগী অন্য কিছুর ওপরে বসাও।

৩। একটি দণ্ডের সাহায্যে মোমসহ টেস্টটিউবটি পানিতে নিমজ্জিত করো এবং একটি থার্মোমিটার টেস্ট টিউবে প্রবেশ করাও।

৪। স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে বিকারের তলদেশে তাপ প্রদান করো।

৫। থার্মোমিটারের পাঠ পর্যবেক্ষণ করো এবং টেস্টটিউবে থাকা মোমের অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করো।

তুমি দেখবে যে থার্মোমিটারের তাপমাত্রার পাঠ বৃদ্ধি পাচ্ছে। থার্মোমিটারের পাঠ ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছালে মোমের অবস্থা সাবধানতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করো।

৬. মোম যখন গলতে শুরু করবে, থার্মোমিটারের পাঠ লক্ষ করো। এটি মোমের গলনাঙ্ক এবং এর মান ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি হওয়র কথা। তবে মনে রেখো, গলনাঙ্কের মান বস্তুর মধ্যে যে অপদ্রব্য থাকে তার উপর নির্ভর করে একটু বেশি কিংবা কম হতে পারে।

৭. পুরো মোমটি গলে যাওয়ার পর গলিত মোমের তাপমাত্রা আবার বাড়তে শুরু করবে।

৮. থার্মোমিটারসহ টেস্টটিউবটির নিচ থেকে বিকার, তারজালি এবং ল্যাম্প সরিয়ে নাও।

৯. এবারে গলিত মোমের তাপমাত্রা কমতে থাকবে। থার্মোমিটারের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করো, লক্ষ্য করো কোন তাপমাত্রায় মোম জমাট বাঁধতে শুরু করেছে।

১০. যে তাপমাত্রায় মোম জমতে শুরু করবে, সেটি হচ্ছে মোমের হিমাঙ্ক।

আলাদা আলাদাভাবে বের করা গলনাঙ্ক এবং হিমাঙ্কের গড় নিয়ে তোমার ফলাফলটি নির্ধারণ করো।

স্ফুটনাঙ্ক
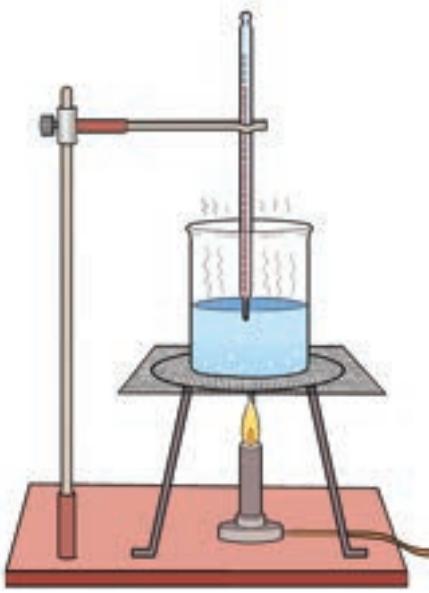
যে তাপমাত্রায় একটি তরল তার অবস্থার পরিবর্তন করে গ্যাসে পরিণত হয় তাকে স্ফুটনাঙ্ক বলে। তোমরা নিশ্চয়ই রান্নাঘরে কেতলিতে বা অন্য কোনো পাত্রে পানি ফুটাতে দেখেছ, তখন পানি বাষ্পে পরিণত হতে থাকে। যে তাপমাত্রায় পানি বাষ্পে পরিণত হতে শুরু করে বা ফুটতে শুরু করে সেই তাপমাত্রাকে পানির বাষ্পীকরণ বিন্দু বা স্ফুটনাঙ্ক বলে। পানির স্ফুটনাঙ্ক হলো ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পানির মতোই প্রতিটি তরল পদার্থেরই একটি নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক রয়েছে।

তোমাদের শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে গলনাঙ্ক বের করার মতো তোমরা পানির স্ফুটনাঙ্কও বের করতে পারবে।

কাজ:

১। ছবিতে যেরকম দেখানো হয়েছে সেভাবে একটি বিকার বা পাত্রের অর্ধেকের মতো পানি নাও।

২। বিকার বা পাত্রটিকে স্পিরিট ল্যাম্পের বা তাপ দেওয়া যায় এমন কিছুর ওপর বসাও। থার্মোমিটার একটা দণ্ডের সাহায্যে বিকারের পানিতে নিমজ্জিত করো।

৩। এখন তাপ প্রদান করো এবং থার্মোমিটারের তাপমাত্রা লক্ষ করতে থাকো।

৪। থার্মোমিটারের তাপমাত্রা যখন ৯৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উঠবে তখন বিকার বা পাত্রের পানির অবস্থা সাবধানতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে থাকো।

প্রথমে পানিতে দ্রবীভূত বাতাস বুদবুদ আকারে বের হয়ে আসবে, সেগুলো বাষ্প নয়।

৫। পানি যখন ফুটতে শুরু করবে, তখন থার্মোমিটারের তাপমাত্রা লক্ষ করো। এটিই হচ্ছে পানির স্ফুটনাঙ্ক। তুমি যদি বিশুদ্ধ পানি নিয়ে থাকো, তাহলে স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছকছি হবে।

৬। পানিতে অন্য কিছু দ্রবীভূত থাকলে তার স্ফুটনাঙ্ক ভিন্ন হতে পারে, সেটি পরীক্ষা করার জন্য পানিতে এক চামচ লবণ গুলে পানির স্ফুটনাঙ্ক বের করে দেখো সেটি কত হয়।
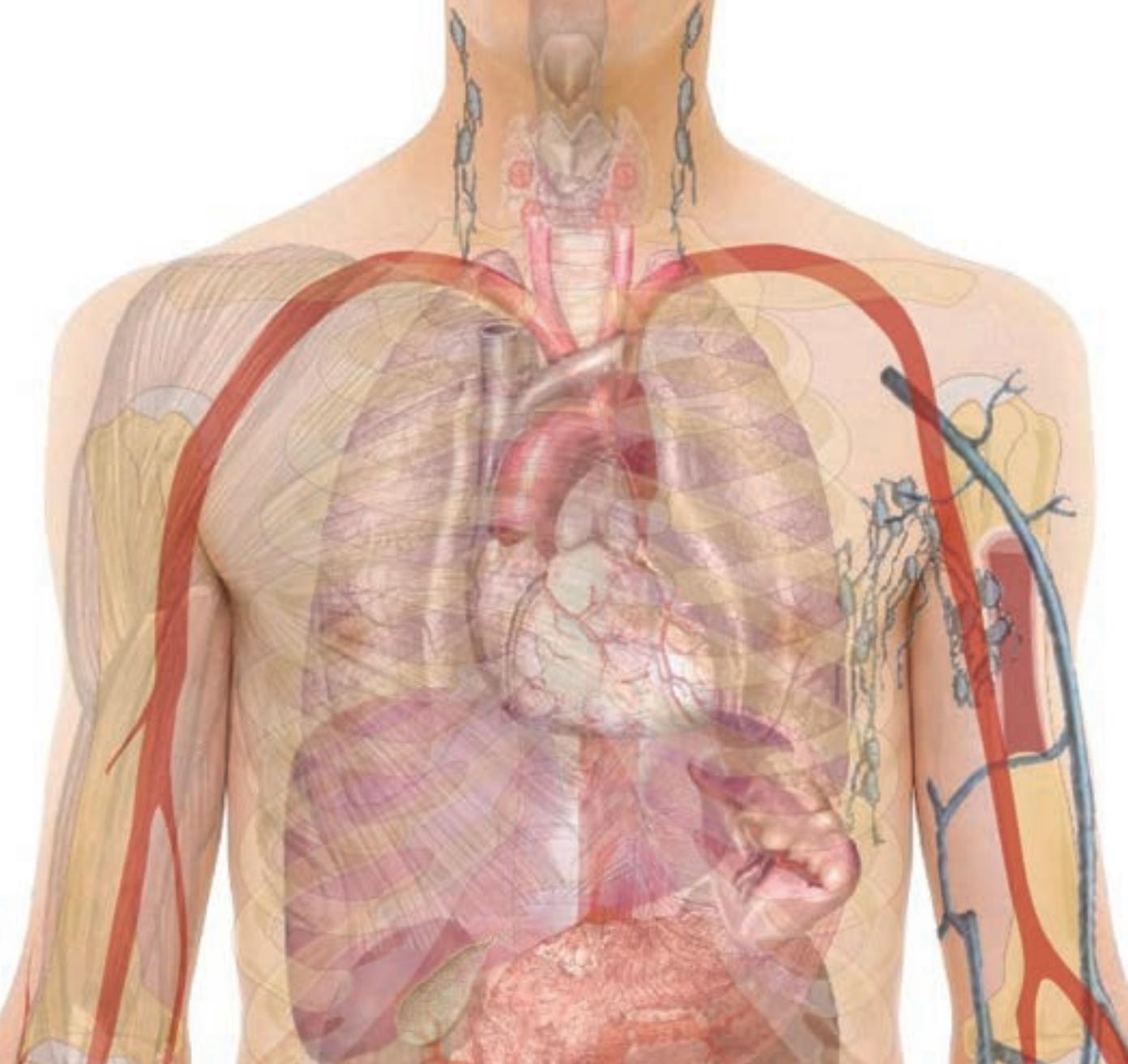
তরলের স্ফুটনাঙ্ক আসলে বাতাসের চাপের ওপর নির্ভর করে। উচু স্থানে বাতাসের চাপ কম বলে সেখানে পানি কম তাপমাত্রায় ফুটতে থাকে তাই রান্না করতে বেশি সময় নেয়। আবার প্রেশার কুকারে কৃত্রিমভাবে বাতাসের চাপ বাড়িয়ে পানির স্ফুটনাঙ্ক বাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে দ্রুত রান্না করা সম্ভব হয়।

অনুশীলনী

১। রান্নাঘরের বিভিন্ন আকৃতির পাত্র কোনটা কোন রান্নায় কাজে লাগে লক্ষ করে দেখো তো! এদের আকৃতি ভিন্ন হবার কারণ কী বলতে পারো?

২। শীতকালে নারিকেল তেল জমে শক্ত হয়ে যায় কেন বলো তো?

অধ্যায় ১১

মানব শরীর

অধ্যায় ১১ মানব শরীর

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ প্রাণীজগতে মানুষের শারীরবৃত্তীয় অবস্থান
- ☑ মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ
- ☑ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহের গঠন ও কাজ
- ☑ শরীরের যত্ন ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস

জীবাশ্ম বা ফসিল বলতে কী বোঝায়?

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো জীবের শরীরের অংশ যখন মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়ে, বা অন্য কোনো উপায়ে বহু বছর ধরে সংরক্ষিত হয় তাকে বলে জীবাশ্ম বা ফসিল। প্রাচীন পৃথিবীর উদ্ভিদ বা প্রাণীদের সম্পর্কে জানার সবচেয়ে বড় উৎসই হলো সেই সময়ের প্রাপ্ত জীবাশ্মের নমুনা। যেমন— আমরা তো সবাই ডাইনোসরের কথা জানি। এই বিশাল বিশাল প্রাণীরা একসময় পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াত। ডাইনোসরদের কালে তো আর মানুষ ছিল না, তাদের কেউ দেখেওনি! কিন্তু এই প্রাণীদের সম্পর্কে এখন এই যে এত কিছু জানা যায়, তার প্রধান উৎস কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে পাওয়া ডাইনোসরের ফসিল বা জীবাশ্ম!

আমরা যদি আমাদের চারপাশে তাকাই তবে নানান রকম জীব দেখতে পাবো। যেমন গাছ, শালিক, কবুতর, মুরগী, হাঁস, মাছ, বিড়াল, কুকুর, ছাগল, গরু ইত্যাদি। এগুলোর পাশাপাশি আরও যে জীবটি আমরা অনেক অনেক দেখতে পাবো, তা হচ্ছে মানুষ। মানুষও অন্য সকল জীবের মতোই জীবন ধারণ করে। সে চলাচল করতে পারে। তাই সে হচ্ছে প্রাণী।

ছোটবেলা থেকেই আমরা অবাক হয়ে ভাবি ‘কোথা থেকে এসেছি আমরা', ভাবি 'অন্য প্রাণীদের চেয়ে আমরা কীভাবে আলাদা'। অন্য সব জীবের যেমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আমাদেরও তেমন রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। আমরা দেখতে অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে ভিন্নতর, আমাদের হাঁটার ধরন, খাদ্যভ্যাস, চিন্তার ক্ষমতা সবকিছুতেই রয়েছে অন্য প্রাণীদের তুলনায় আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য। 'আধুনিক' মানুষই (বৈজ্ঞানিক নাম Homo sapiens) একমাত্র প্রাণী যারা সোজা হয়ে দুই পায়ে চলাচল করতে পারে। তবে এই আধুনিক মানুষের আগেও মানুষের কিছু আদি প্রজাতি ছিল যারা কিন্তু এভাবে সোজা হয়ে দুই পায়ে হাঁটতে পারত। বিবর্তন (Evolution) বিষয়ে গবেষণা আমাদের সেটা বুঝতে সাহায্য করে।

আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপে পাওয়া ফসিল (Fossil) বা জীবাশ্মগুলোর বিস্ময়কর উপস্থিতি এবং ক্রম-বিস্তৃতি থেকে আমরা আমাদের বিবর্তনকে বুঝতে

পারি। জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে আমরা বুঝতে পারি কখন আমরা সোজা হয়ে হাঁটতে শুরু করেছি। আকারগত পরিবর্তনগুলো যেমন আমাদের শরীরের চওড়া নিতম্ব (পশ্চাৎভাগ), পায়ের বাকি অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পায়ের বড় আঙ্গুল এবং ছোট বাহু কখন পেয়েছি। বিবর্তনের ধারায় আমাদের মস্তিষ্কের আকার ও বেড়েছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত গবেষণাতথ্য বলছে, প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশে মানুষের অস্তিত্ব ছিলো। আমাদের চেনাজানা প্রাণীদের ভেতর বানর, ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জি এরা মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে কাছাকাছি। মানুষসহ এসব প্রাণীদের বলা হয় প্রাইমেট (Primate)।
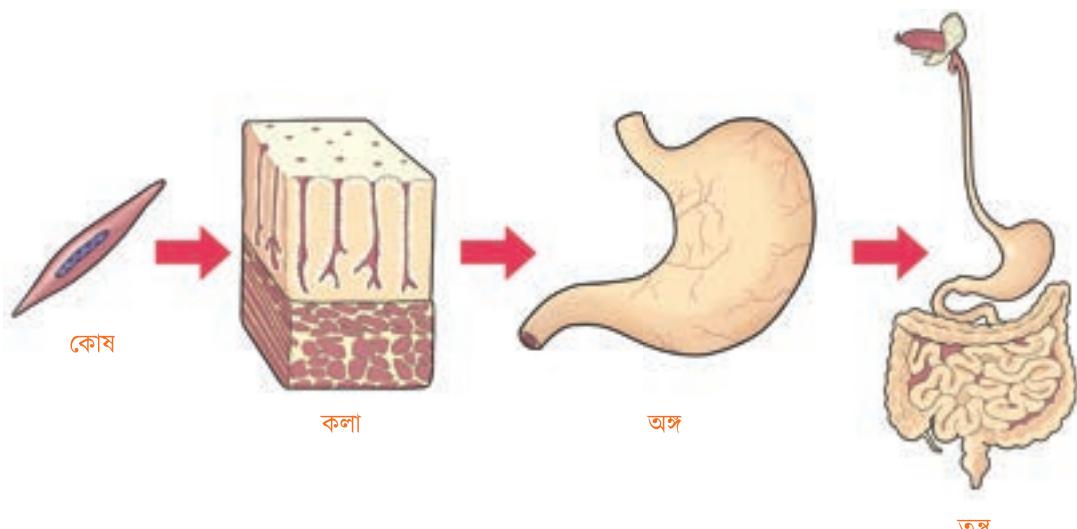
সকল প্রাইমেট জাতীয় প্রাণীদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। আর তা হচ্ছে এদের শরীরের মেরুদণ্ডের উপস্থিতি। আমাদের পিঠের মাঝ বরাবর যে খণ্ড খণ্ড হাড়ের উপস্থিতি আমরা হাত দিলেই অনুভব করতে পারি এটিই আমাদের মেরুদণ্ড, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় spine ।

আমাদের শরীরের দিকে তাকালে আমরা চোখ, কান, নাক, মাথা, শরীরের ত্বক বা চামড়া, নখ ইত্যাদি দেখতে পাই। এছাড়া আমাদের শরীরের ভেতরে রয়েছে আমাদের হৃৎপিন্ড (heart), যকৃত (liver), ফুসফুস (lungs), বৃক্ক (kidney), অগ্নাশয় (pancreas) ইত্যাদি। এগুলো আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ। আমাদের পরিচিত অন্যান্য প্রাণী, যেমন—হাঁস, মুরগী, গরু এদেরও কিন্তু এসব অঙ্গ রয়েছে।

আমাদের নখ আমরা খালি চোখেই দেখতে পাই। হাত-পায়ের নখ বড় হলে আমরা কেটে ফেলি। এই নখকে যদি আমরা ক্রমাগত ছোট ছোট টুকরো করে কাটতে থাকি, তবে একপর্যায়ে এসব টুকরোকে আর খালি চোখে দেখা যাবে না। তখন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এগুলো দেখতে হবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা শেষ পর্যন্ত নখের কোষ দেখতে পাব। আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি কোষ হচ্ছে আমাদের গঠন ও কাজের একক। মানুষের মতো জটিল গঠনের জীবের জন্য কোটি কোটি কোষ দরকার। এসব কোষ একে অপরের সঙ্গে মিলে শেষ পর্যন্ত আমাদের মতো মানুষের গঠন তৈরি করে।

আণুবীক্ষণিক কোষ থেকে শুরু করে খালি চোখে দেখতে পাওয়া মানব শরীরের এই গঠনের বিষয়গুলো বিজ্ঞানীরা নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে আলোচনা করেন।

কোষ (cell) > টিস্যু বা কলা (tissue) > অঙ্গ (organ) > তন্ত্র (system)
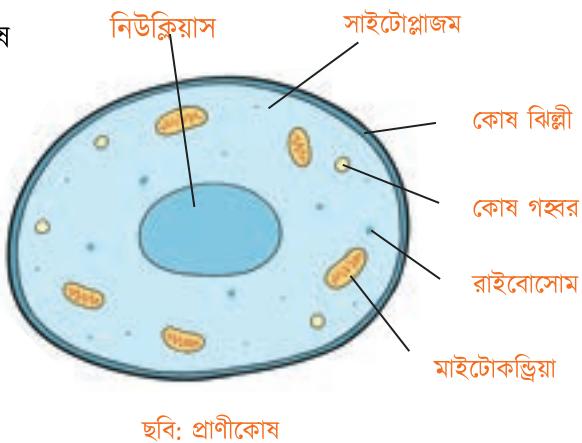
কোষ হচ্ছে গঠনের এই ধাপের সবচেয়ে নিচের কিংবা বলা যেতে পারে সবচেয়ে সরল একক। আর তন্ত্র বা সিস্টেম হচ্ছে এই গঠনের সবচেয়ে ওপরের ধাপ।

আমরা নিচে এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব।

কোষ (Cell)
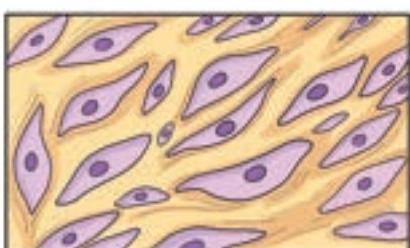
একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে মোট কত কোষ থাকে? এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের ভেতর অনেক দিনের প্রশ্ন ছিল। সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে এই সংখ্যা প্রায় ৩০-৪০ ট্রিলিয়ন (৩০০০০০০-৪০০০০০০ কোটি)। এই কোটি কোটি কোষ মানব শরীরের বৃদ্ধি, বিপাক, উদ্দীপনা এবং প্রজননে ভূমিকা রাখে।

ছবি: প্রাণীকোষ

প্রাণীকোষের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা সবই মানুষের কোষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কলা বা টিস্যু (Tissue)
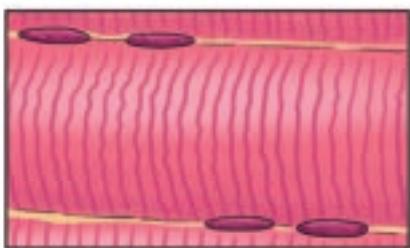
মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের কোষ রয়েছে। এদেরকে চারটি মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই চার ধরনের কোষ, তাদের চারপাশের উপাদানের সঙ্গে মিলে যে বিশেষ গাঠনিক একক তৈরি করে এদেরকে বলা হয় টিস্যু বা কলা। চার শ্রেণির কোষের ওপর ভিত্তি করে মানব শরীরের টিস্যুগুলোকে চারটি ধরনে ভাগ করা যায়।
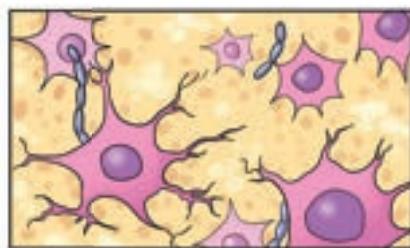
ধরন-১: এই ধরনের কলা বা টিস্যু আমাদের শরীরের বাইরের আবরণ এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ও শরীরের গহ্বরগুলোর বাইরের স্তরটিকে ঢেকে রাখে। এদেরকে বলা হয় বহিরাবরণীয় কলা বা এপিথেলিয়াল টিস্যু (epithelial tissue)।
ধরন-২: এ ধরনের টিস্যু সংকোচন ও প্রসারন করতে সক্ষম এবং শরীরের পেশি গঠন করে। এদেরকে বলা হয় পেশি কলা বা মাসল টিস্যু (muscle tissue)।
ধরন-৩: এ ধরনের টিস্যু আমাদের শরীরের সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং স্নায়ুতন্ত্র তৈরি করে। এদেরকে বলা হয় স্নায়ুকলা বা নার্ভ টিস্যু (nerve tissue)।
ধরন-৪: এই টিস্যুগুলো দূরবর্তী কোষগুলোকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত করে, এবং শরীরের কাঠামোকে একত্রিত করে। এদেরকে বলা হয় সংযোজক কলা বা কানেক্টিভ টিস্যু (connective tissue)।

অঙ্গ (Organ)

উপরে উল্লিখিত চার ধরনের টিস্যু বা কলা মিলে মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি করে। এক একটি অঙ্গ হচ্ছে একাধিক টিস্যুর সমন্বয়ে তৈরি, যা একটি স্বতন্ত্র গাঠনিক এবং কার্যকরী একক তৈরি করে। মানব শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ আছে। এসব অঙ্গ আমাদের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, ফুসফুস, বৃক্ক ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের শরীরের এক একটি অঙ্গ।

মানব শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গ হলো আমাদের ত্বক (skin)।
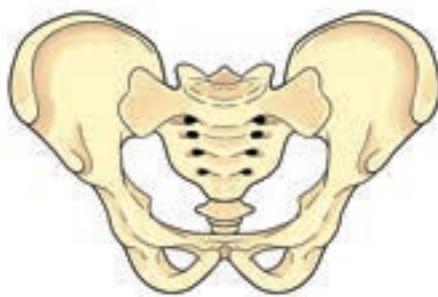
তন্ত্র (System)

আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কিন্তু আলাদা আলাদা বা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। বরং এদের কোনো কোনোটি একসঙ্গে মিলে আমাদের শরীরে একই ধরনের কাজ করে। কাজের ভিত্তিতে এই অঙ্গগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রতিটি ভাগকে বলা হয় একটি সিস্টেম বা তন্ত্র। যেমন—আমাদের হৃৎপিণ্ড হচ্ছে এমন একটি অঙ্গ যার গঠনে উপরে উল্লিখিত চার ধরনের টিস্যুই অংশগ্রহণ করে। এই অঙ্গটির কাজ হচ্ছে, আমাদের সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালনে ভূমিকা রাখা। তবে রক্ত সঞ্চালনের এই কাজটি হৃৎপিণ্ড একা করতে পারে না। এই কাজের জন্য এটিকে রক্তনালিগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি সমন্বিত ব্যবস্থা বা সিস্টেমের মাধ্যমে কাজ করতে হয়। এই পুরো সিস্টেমকে বলা হয় রক্ত সংবহনতন্ত্র। এভাবে আমাদের শরীরের নানা অঙ্গ যেগুলোর নাম আমরা জানি, যেমন কিডনি, লিভার, ফুসফুস, চোখ, নাক এবং অন্যান্য অঙ্গসমূহ—সেগুলোও কাজের জন্য অন্য অঙ্গ এবং টিস্যুর ওপর নির্ভর করে।
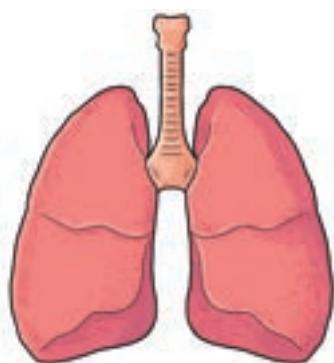
নিচে আমরা মানব শরীরের প্রধান তন্ত্রগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানবো।

১. ত্বকতন্ত্র (Integumentary system): অনেক সময় খেলতে গিয়ে বা ছোটখাটো দুর্ঘটনায় হাত-পায়ের চামড়া কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়। আমাদের পুরো শরীরের ওপরে এই যে চামড়া বা ত্বকের আবরণ, তা বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের শরীরের একটা আবরণ বা প্রতিরক্ষা দেওয়াল তৈরি করে এবং আামাদের শরীরকে সুরক্ষিত রাখে। আমাদের শরীরের এই ত্বক দ্বারা গঠিত তন্ত্র হচ্ছে ত্বকতন্ত্র। ক্ষতিকর অণুজীব (Microorganisms) এবং রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করে ত্বকতন্ত্র।

২. পেশি ও কঙ্কালতন্ত্র (Muscular and skeletal systems): আমরা যখন হাঁটি, কিংবা একটি গ্লাসে করে পানি পান করি, তখন আমাদের শরীরের হাড় (Bones) এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশি (Muscle) এই কাজগুলোর ভার সহ্য করে এবং প্রয়োজনীয় সঞ্চালন শক্তি দেয়। আমাদের শরীরের হাড় বা কঙ্কাল (Skeleton) এবং তার সাথের মাংসপেশি মিলে যে তন্ত্র তৈরি করে তাকে পেশি-কঙ্কালতন্ত্র বলে। একে অনেক সময় আলাদা করে পেশি এবং কঙ্কালতন্ত্র হিসেবে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়। মানুষের শরীরের কঙ্কালতন্ত্র প্রায় ২০৬টি হাড় নিয়ে গঠিত। পেশিতন্ত্র কঙ্কালতন্ত্রের সঙ্গে মিলে শরীরকে চলাচলে সাহায্য করে এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকে রক্ষা করে।
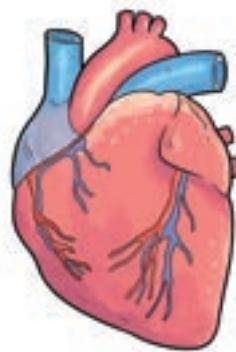
ছবি: হাড়
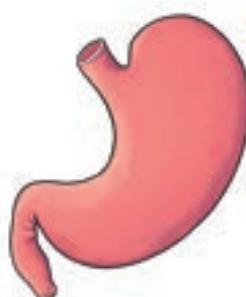
ছবি: ফুসফুস

৩. শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system): আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া বাঁচতে পারি না। আমাদের এই শ্বাস-প্রশ্বাসকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের ফুসফুস এবং তার সঙ্গে আরও কিছু অঙ্গ কাজ করছে। আমাদের শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ, ফুসফুস (Lungs) এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের পেশিগুলির সমন্বয়ে গঠিত হয় শ্বসন তন্ত্র। শ্বসনতন্ত্র বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে, আর কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বাতাসে ফিরিয়ে দেয়।
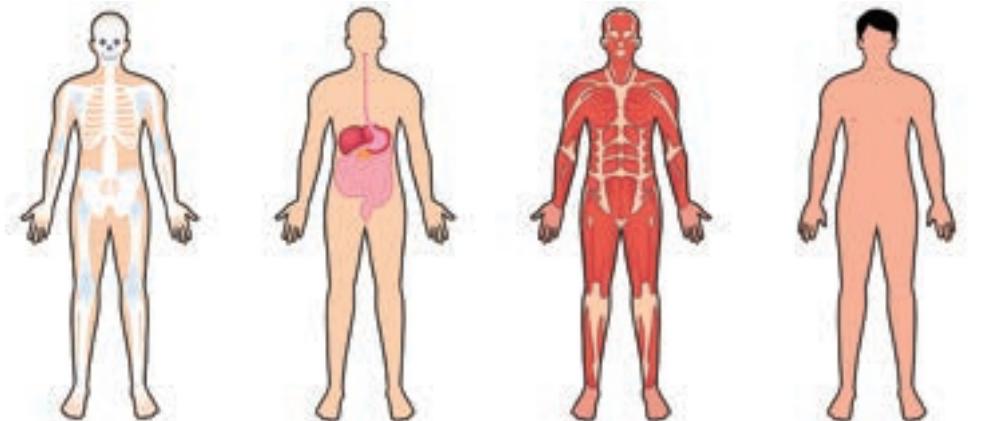
৪. সংবহনতন্ত্র / হৃদ-সংবহন তন্ত্র (Vascular system): আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের ভেতর যোগাযোগের জন্য রক্তের মাধ্যমে তৈরি হওয়া একটি কার্যকর পরিবহণব্যবস্থা আছে। হৃৎপিণ্ড শরীরের রক্ত সঞ্চালন করে, রক্তনালির মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও কোষে অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহ করে এবং সেসব জায়গায় সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ পরিবহণ করে। এই হৃৎপিণ্ড (Heart), রক্ত (Blood) এবং রক্তনালি (blood vessels and capillaries) গুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় সংবহনতন্ত্র। শরীরের বিভিন্ন অংশে পুষ্টি উপাদান পৌছে দেওয়া, বর্জ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি আমাদের শরীরের তাপমাত্রা সব সময় যে একই থাকে (জ্বর ছাড়া) তা নিয়ন্ত্রণ করে এই সংবহন তন্ত্র ।

ছবি: হৃৎপিণ্ড

ছবি: পাকস্থলি

৫. পরিপাক/পাচনতন্ত্র (Digestive system): আমরা সবাই ক্ষুধা পেলে খাবার খাই। এই খাবার কিন্তু সরাসরি আমাদের শরীরে কাজে লাগে না। খাবার থেকে শক্তি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে শরীরের কাজের জন্য উপযোগী করে আমাদের পরিপাকতন্ত্র। মুখ, খাদ্যনালি (Esophagus), পাকস্থলি (Stomach),ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine) ও বৃহদন্ত্র (Large intestine)-এর সমন্বয়ে গঠিত হয় পরিপাক/পাচনতন্ত্র। এই তন্ত্র আমাদের গ্রহণ করা খাদ্যকে ব্যবহারযোগ্য পুষ্টি উপাদানে ভেঙে দেয়, যা পরে আমাদের শরীরে শোষিত হয়। এই তন্ত্রের শেষ অংশ হচ্ছে পায়ু বা মলদ্বার (Anus),
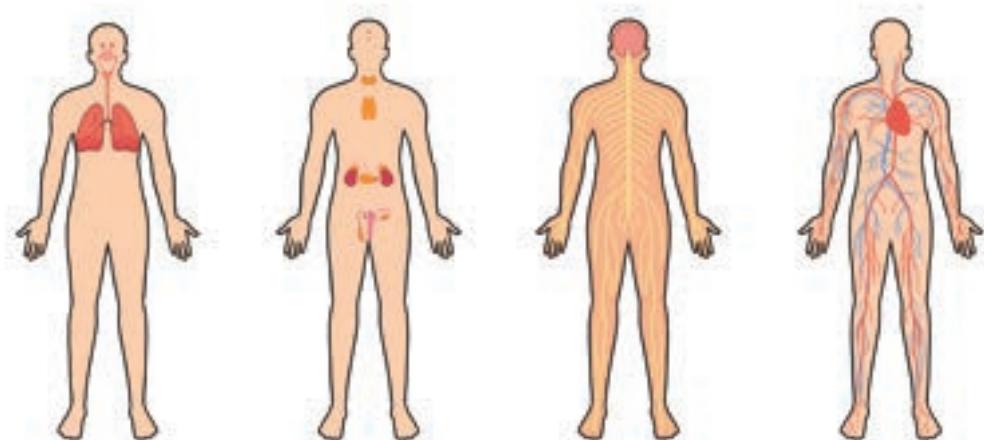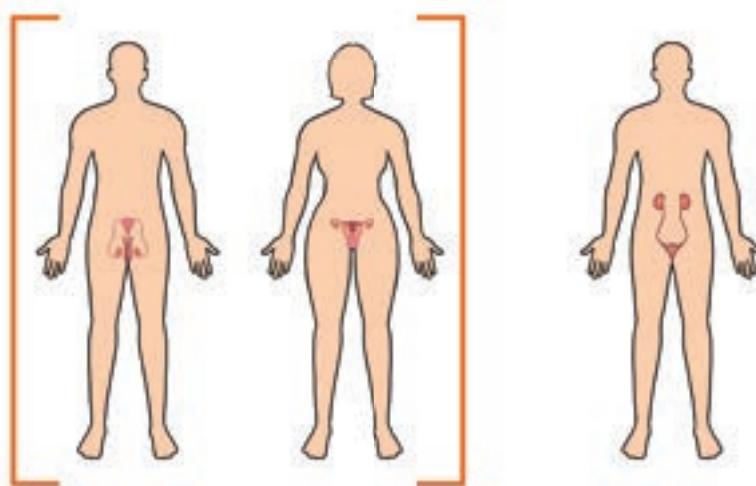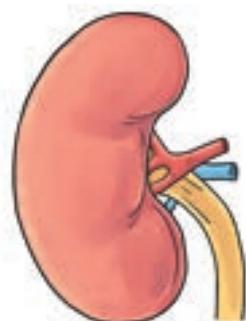
ছবি: মানব শরীরের প্রধান তন্ত্রসমূহ

যা আমাদের খাবারের অব্যবহারযোগ্য বা বর্জ্য অংশকে শরীর থেকে বের করে দেওয়ার পথ হিসেবে কাজ করে।

ছবি: বৃক্ক বা কিডনি

৬. রেচনতন্ত্র (Renal system): আমাদের শরীর থেকে তরল বর্জ্য বা মূত্র যাতে শরীরের বাইরে বের হয়ে আসতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের রেচনতন্ত্র কাজ করে, যা মূলত আমাদের বৃক্ক (Kidney), মূত্রনালি (Ureter) এবং মূত্রথলি (Bladder) ইত্যাদি অঙ্গ মিলে তৈরি হয়। মূত্র উৎপাদন এবং এর মাধ্যমে রক্ত থেকে ক্ষতিকর নাইট্রোজেন যৌগ এবং অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ করে এই তন্ত্র।

ছবি: মস্তিষ্ক

৭. স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system): আমরা যে চিন্তা করতে পারি, সিদ্ধান্ত নিতে পারি, কারও ডাকে সারা দিতে পারি, শীত-গরম উপলব্ধি করতে পারি তা সম্ভব হয় আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কারণে। আমাদের মস্তিষ্ক (Brain), মেরুদণ্ডের ভিতরে অবস্থানরত মেরুরজ্জু (spinal cord) এবং আমাদের শরীরের নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকা স্নায়ু-সংযোগ মিলে তৈরি হয় আমাদের স্নায়ুতন্ত্র। গরম কোনো জিনিসে হাত লেগে গেলে আমরা যখন ঝট করে হাতটা সরিয়ে নিই, তখন আসলে কী ঘটে? জিনিসটা যে গরম সেই তথ্য হাতের ত্বকে থাকা স্নায়ুতন্তু মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকা মেরুরজ্জুর মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। মস্তিষ্কের কাজ হলো এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে আমাদের অনুভূতি আর সাড়া দেওয়ার তাড়না সৃষ্টি করা। তার মানে এই ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক আমাদের হাতের ত্বকে যে শুধু গরম লাগার যে অনুভূতি তৈরি করে তাই নয়, বরং হাতটা ঝট করে সরিয়ে ফেলতেও নির্দেশ দেয়।

৮. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র (Endocrine system): আমাদের শরীরের বিভিন্ন কাজের জন্য শরীরের ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে কিছু জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ হয়। এদের কোনোটি শরীরের একটি অংশে তৈরি হয়, কিন্তু তারপর শরীরের বিভিন্ন অংশে গিয়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করে। এ ধরনের পদার্থকে বলা হয় হরমোন। এই হরমোনগুলো শরীরের বিভিন্ন অংশে থাকা গ্রন্থিতে তৈরি হয়, আর এই গ্রন্থিগুলো মিলে তৈরি হয় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র। শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সমন্বয়ের জন্য এই তন্ত্র রাসায়নিক যোগাযোগের নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে।

৯. প্রজননতন্ত্র (Reproductive system): অন্য সকল জীবের মতো মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে মানব প্রজাতির ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করার জন্য আমাদের শরীরে রয়েছে প্রজননতন্ত্র। এই তন্ত্রের কিছু অংশ বাহ্যিক অঙ্গ হিসেবে দেখা যায় যা নারী-পুরুষের শরীরে আলাদা। যেমন- ছেলেদের পুংজননেন্দ্রীয় বা শিশ্ন (penis), অণ্ডকোষ (scrotum), আর মেয়েদের যোনিপথ (vagina)। তবে প্রজননতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ আসলে আমাদের দৃষ্টির বাইরে, শরীরের ভেতরে অবস্থান করে। যেমন- ছেলেদের ক্ষেত্রে শুক্রাশয়, প্রোস্টেট, শুক্রনালি ইত্যাদি; আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়, জরায়ু ইত্যাদি। প্রজননতন্ত্রের এসব অভ্যন্তরীণ অঙ্গ আমাদের প্রজননকোষ, যেমন- শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু তৈরি করে।

বয়ঃসন্ধি

সকল জীবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার শারীরিক বৃদ্ধি এবং পরবর্তী বংশধর তৈরির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা।

আমরা যখন মাঠে কোনো ফসলের বীজ বপন করি, তখন বীজগুলো থেকে অঙ্কুর গজায়, তারপর তারা ধীরে ধীরে বড় হয়। এক পর্যায়ে সেই গাছে আবার ফুল আসে, তাতে আবার নতুন বীজ তৈরি হয়। এভাবেই প্রকৃতিতে জীবসমূহ তাদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্ম তৈরির জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে।

মানব প্রজাতির ক্ষেত্রেও কথাটি সত্যি। আমরা চারপাশে তাকালে ছোট ছোট শিশু দেখতে পাই, তারপর তাদের তুলনায় বড় কিশোর বয়সীদের দেখি। আমাদের বাবা-মায়েরা পূর্ণ বয়স্ক মানুষ আবার আমাদের দাদা-দাদি কিংবা নানা-নানিরা হয়তো আরেকটু বেশি বয়স্ক। এই যে নানান বয়সের মানুষ, তাদের শরীরের বৃদ্ধি কিন্তু ধাপে ধাপে হয়। আমাদের পরিবারে বা আত্মীয়স্বজনদের নতুন শিশু জন্ম নেওয়ার পরপরই কেবল আমরা তাদেরকে চোখের সামনে বড় হতে দেখি। কিন্তু মানব শিশু জন্মের এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু শুরু হয় আরও অনেক আগে থেকে মায়ের গর্ভে। সেই বিষয়ে আমরা উপরের শ্রেণিতে আরও বিস্তারিত জানবো।

জন্ম নেওয়ার পর শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি হতে হতে একপর্যায়ে তারা কৈশোরে উত্তীর্ণ হয়। এই যে তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছ, তোমরা কিন্তু এখন কৈশোরে আছ। একসময় তোমরাই শিশু ছিলে। তোমাদের শরীর ক্রমাগত বড় হচ্ছে। শরীরের এই বড় হওয়া কিন্ত কেবল আমাদের উচ্চতায় বড় হওয়া নয়, আমাদের শরীরের যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে তারা সবাই কিন্ত বড় হচ্ছে। আমাদের বুকের ভেতরের হৃৎপিণ্ড (রক্ত সংবহনতন্ত্রের অঙ্গ), মাথার ভেতরের মস্তিষ্ক (স্নায়ুতন্ত্রের অঙ্গ) কিংবা পেটের ভেতরের বৃক্ক বা কিডনি (রেচনতন্ত্রের অঙ্গ)—এরা সবাই কিন্তু তোমাদের বেড়ে ওঠা শরীরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বড় হচ্ছে।

বয়সের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছালে আমাদের শরীরের প্রজননতন্ত্রের দৃশ্যমান অঙ্গগুলোও কিন্ত বড় হতে থাকে। ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে এই অঙ্গগুলো তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। একটু পরেই আমরা সেই পরিবর্তনগুলো সম্বন্ধে জানবো, কিন্ত তার আগে বলা দরকার, এই প্রজনন অঙ্গগুলো সম্বন্ধে আমাদের নতুন অনুভূতি তৈরি হয় কিন্ত আমাদের শরীরের ভেতরের বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে। একটু আগে তন্ত্রসমূহের আলোচনায় আমরা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এসব গ্রন্থি থেকে এক ধরনের বিশেষ রাসায়নিক সংকেতবাহী পদার্থ নিঃসরণ হয় যাদেরকে আমরা সাধারণ নামে 'হরমোন' হিসেবে জানি।

কৈশোরের একপর্যায়ে নারী এবং পুরুষের শরীরে কিছু বিশেষ হরমোন তৈরি হওয়া শুরু হয়। নারী-পুরুষের শরীরভেদে আলাদা হয় বলে এসব হরমোনকে সেক্স হরমোন বা লিঙ্গ-ভিত্তিক হরমোন বলা হয়। মূলত আমাদের মস্তিষ্কের সঙ্গে এসব সেক্স হরমোনের যে নতুন যোগাযোগ হয় তার কারণেই আমরা আমাদের বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গগুলোর ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠি।

সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে তোমাদের শরীরের যে পরিবর্তন তার সঙ্গে তোমাদের মন তথা মস্তিষ্কেরও কিন্ত একটি পরিবর্তন হচ্ছে, যা তোমাদেরকে প্রজনন বা জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিপক্বতার

দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রজনন বা জৈবিক পরিপক্কতা মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত অর্জিত হয় ১৬-১৮ বছরের পর থেকে। কিন্তু সেই পরিপক্কতার পথে যাত্রা শুরু হয় আরও আগে। ছেলেদের ক্ষেত্রে ১১-১৩ বছরের মধ্যে। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ৯-১১ বছরের মধ্যে। এই যে বয়স, যখন মানুষ হিসেবে আমরা প্রজনন বিষয়ে পরিপক্কতার দিকে যাত্রা শুরু করি, এই বয়সটাই হচ্ছে আমাদের বয়ঃসন্ধি। আমাদের শিশুকাল (জন্ম থেকে ৮-৯ বছর) পেরিয়ে যৌবনের (১৮ বছরের পরবর্তী) পর্যায়ে যাত্রার শুরুটা এই ৯-১৩ বছরের মধ্যে হয় বলেই এই সময়টাকে বয়ঃসন্ধি বলা হয়। বয়ঃসন্ধির সময়টায় শরীর ও মনের পরিবর্তনগুলো জীব হিসেবে মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এটাও মনে রাখার বিষয় যে, বয়ঃসন্ধিতে শুরু হওয়া মানুষের শরীরের প্রজনন অঙ্গগুলোর দৃশ্যমান পরিবর্তন কিন্তু আরও কয়েক বছর ধরে চলতেই থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিরও পরিবর্তন হয়। আর এসব কিছুরই পেছনে কাজ করে শরীরে তৈরি হওয়া সেক্স হরমোন।

বয়ঃসন্ধিতে ছেলেদের শারীরিক পরিবর্তন

ছেলেদের শরীরের বিকাশ ও দেহ গড়নের পরিবর্তন একটি দীর্ঘ সময় ধরে চলে। এই পরিবর্তন বয়ঃসন্ধি সময় থেকে শুরু করে ৩০ বছরের অধিক সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। অনেক পরিবর্তন আছে যা বয়ঃসন্ধি শেষ হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। নিচে বয়ঃসন্ধিকালীন কিছু পরিবর্তন তুলে ধরা হলো, যা তোমরা নিজেদের শরীরেই লক্ষ করতে পারো।

গলার স্বরে পরিবর্তন: শুনতে অবাক লাগলেও এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে, ছেলেদের বয়ঃসন্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য আসলে আমরা শুনতে পাই। আর তা হচ্ছে তাদের গলার স্বরে পরিবর্তন। বয়ঃসন্ধিতে ছেলেদের গলার স্বর শিশু অবস্থার তুলনায় মোটা হয় যা তাদের শরীরের অন্যান্য পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত বহন করে।

দেহকাঠামো সুগঠিত হওয়া: ছেলেদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধির একটা বিশেষ লক্ষণ হলো শরীরের বিভিন্ন অংশ সুঠাম ও সুগঠিত হতে থাকা। এই অংশগুলো হলো বুক, পিঠ, কোমর, নিতম্ব, উরু এবং পা। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু করে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত এই শারীরিক বিকাশ ঘটতে থাকে। মূলত এসময় ছেলেদের শরীরের বিভিন্ন অংশের পেশি সুগঠিত হয়।

হাড়ের গঠন পরিবর্তন ও বৃদ্ধি: বয়ঃসন্ধি সময় থেকে ছেলেদের দেহের হাড়ের গঠন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একই সঙ্গে মজবুত কাঠামো লাভ করতে থাকে। শরীরের অনেক জায়গার হাড় চওড়া

হতে থাকে। এই পরিবর্তনও বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু করে ৩০ বছরের অধিক বয়স পর্যন্ত ঘটতে পারে।

শিশ্ন (penis) ও অণ্ডকোষের (testis) পরিবর্তন: বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয় তাদের শিশ্ন ও অণ্ডকোষের আকারে। শিশ্নের একটি সাধারণ কাজ হচ্ছে শরীরের ভেতর থেকে প্রবাহিত মূত্রনালির মাধ্যমে শরীরের বাইরে মূত্র নিঃসরণের পথ তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু প্রজননে ভূমিকা রাখাও এর আরেকটি কাজ। প্রজনন সংক্রান্ত কাজের জন্য শিশ্ন প্রস্তুত হয় বয়ঃসন্ধিকালে। তখন এর আকার বৃদ্ধি পায়। সেক্স হরমোনের প্রভাবে শিশ্নে রক্ত ও অক্সিজেন প্রবাহ বাড়ে ফলে এটি কখনো কখনো দৃঢ়তা অর্জন করে। শিশ্নের এই বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ১৮ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। শিশ্নের সাথে সাথে অণ্ডকোষেরও পরিবর্তন হয়। অণ্ডকোষে প্রজননের জন্য অপরিহার্য শুক্রাণু তৈরি হয় এবং জমা থাকে।

ছেলেদের মধ্যে ১৩ বছর বয়সেই আংশিকভাবে সক্রিয় শুক্রাণু দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ১৪-১৬ বছরের আগে পুরোপুরি সক্রিয়তা আসে না। যদিও, কারও কারো ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়।

শরীরের বিভিন্ন অংশে লোম: ছেলেদের বয়ঃসন্ধির অত্যন্ত সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে লোম গজানো এবং তা ক্রমাগত ঘন হওয়া। এমন একটি গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন আসে ছেলেদের শিশ্নের মূলে লোমের উপস্থিতির মাধ্যমে। ইংরেজিতে একে বলা হয় পিউবিক হেয়ার (pubic hair) আর বাংলায় বলা হয় শ্রোণীদেশীয় লোম। আমাদের শরীরের উরুর গোড়া থেকে উপরের দিকে তলপেটের একটি অংশ বরাবর নিতম্বের অংশ নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে শ্রোণীদেশ (pelvis)বলা হয়। সাধারণত পুরুষের যৌনাঙ্গ বৃদ্ধি শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই এই পিউবিক হেয়ার বা শ্রোণীদেশীয় লোম দেখা যায়। বয়ঃসন্ধির পরবর্তীতে আরও উপরের অংশে এই লোম ছড়িয়ে পড়ে।

পুরুষ-নির্দিষ্ট অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের প্রভাবে মূলত শরীরে এই লোমের বিস্তার বাড়তে থাকে। যেমন—উপরের ঠোঁটের ওপরে ও নাকের নীচে গোঁফের রেশ তৈরি হয় এসময়। এছাড়া ধীরে ধীরে বগলের চুল, মুখে দাড়ির পাশাপাশি বুকসহ বিভিন্ন অঞ্চলেও লোমের উপস্থিতি দেখা যায়।

মেয়েদের ক্ষেত্রে শারীরিক পরিবর্তন

দেহের আকার, মেদ বৃদ্ধি: বয়ঃসন্ধিকালে মেদ কলার বৃদ্ধি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের শরীরের বেশি অংশ জুড়ে ঘটে। মেয়েদের শরীরের যেসকল স্থানে সাধারণত মেদ কলার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তার মধ্যে আছে—স্তনগ্রন্থি, অর্ধনিম্নাংশ, উরু, উপরের বাহু, এবং নিতম্ব অঞ্চল।এদের মধ্যে স্তনগ্রন্থিতেই সাধারণত সবচেয়ে বেশি মেদ জমা হয় । দশ বছর বয়সের একটি মেয়ের শরীরে একই বয়সের একটি ছেলের তুলনায় গড় চর্বির পরিমাণ থাকে মাত্র ৫% বেশি, কিন্তু বয়ঃসন্ধির শেষে এসে এই পার্থক্য হয় ৫০%-এর কাছাকাছি।

শরীরের বিভিন্ন অংশে লোমের উপস্থিতি: ছেলেদের মতো মেয়েদেরও বয়ঃসন্ধিকালে শরীরের কিছু কিছু অংশে লোমের উপস্থিতি দেখা যায়। এর মধ্যে শ্রোণীদেশীয় লোম (Pubic hair) বয়ঃসন্ধিতে

পৌঁছানোর সুস্পষ্ট লক্ষণ। প্রথমদিকে কেবল যোনিপথের চারপাশে ও উপরে হালকা ও ছোট লোমের অস্তিত্ব এলেও ধীরে ধীরে এই লোমের ঘনত্ব ও বিস্তার বাড়তে থাকে। বয়ঃসন্ধির পরেও এই বৃদ্ধি অব্যহত থাকে।

বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে হাতে, পায়ে, বগলে ও উরুতে চুলের অস্তিত্ব দেখা যায়। এটা সাধারণত ১৪-১৬ বছরের মধ্যে হয়। অনেক মেয়েদের মুখেও হালকা চুল গজাতে দেখা যায়।

স্তনবৃদ্ধি: মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধির প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে এক বা উভয় স্তনের বৃন্তের নিচে সাধারণত একটা শক্ত ও কোমল পিণ্ড দেখা যায়। এ ব্যাপারটা গড়ে সাড়ে ১০ বছর বয়সে ঘটে। পরবর্তী ৬-১২ মাসের মধ্যে স্তন উভয় পাশেই ফুলে নরম হয়ে ওঠে। এটি ঘটে মূলত স্তনের অঞ্চলে মেদ সঞ্চয়ের কারণে। এই বৃদ্ধি বয়ঃসন্ধির পরেও চলতে থাকে।

যোনিপথ, জরায়ু, এবং ডিম্বাশয়ের পরিবর্তন: মেয়েদের হরমোন ইস্ট্রোজেন ক্ষরণ বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে তাদের যোনিপথ, জরায়ু এবং ডিম্বাশয়ের গঠন ও কাজে পরিবর্তন আসে। শরীরের ভেতরে এই অঙ্গগুলো থাকে বলে এদের এই পরিবর্তন হয়তো খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্ত ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে প্রথমদিকে যোনিপথ দিয়ে সাদা রংয়ের তরল পদার্থ ক্ষরিত হয়, যা সাদা স্রাব হিসেবে পরিচিত)।

রজঃচক্র: সাধারণত সাদা স্রাব শুরু হওয়ার দুই বছর পরে যোনিপথ দিয়ে মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে রক্তস্রাব শুরু হয়। একে মাসিক বা পিরিয়ড বলা হয়। বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যে মাসিক হওয়ার গড় বয়স ৯-১৩ বছর বলে ধরা হয়। নিয়মিত বিরতিতে মাসের নির্দিষ্ট সময়ে এই রক্তস্রাব হয় বলে এই ঘটনাটিকে রজঃচক্র বলা হয় (রজঃ শব্দটির অর্থই হচ্ছে রক্তস্রাব)। রজঃচক্র শুরু হওয়া মেয়েদের বয়ঃসন্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এটি প্রজননের জন্য তাদের প্রস্তুতির পথে একটি সুনির্দষ্ট সংকেত।

শরীরের যত্ন

আমাদের শরীর সুস্থ রাখার জন্য নিয়মিত এর যত্নের প্রয়োজন। কোভিড অতিমারির সময়ে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, শরীরের পরিচ্ছন্নতা এবং কিছু সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি আমাদের রোগ ব্যাধির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেমন দরকার, তেমনি নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ নিশ্চিত করাও জরুরি। আমাদের কিছু সাধারণ অভ্যাস আমাদের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহযোগিতা করে। যেমন—

- ☑ নিয়মিত গোসল করা;
- ☑ হাত ও পায়ের নখ এবং চুল ছোট রাখা;
- ☑ খাওয়ার আগে ও পরে এবং টয়লেট ব্যবহারের পরে সাবান নিয়ে হাত ধোয়া;
- ☑ যেখানে সেখানে থুথু বা কফ না ফেলা;
- ☑ হাঁচি ও কাশির সময়ে নাক ও মুখ রুমাল বা টিস্যু বা হাতের কনুই দিয়ে ঢেকে রাখা।

এসব আচরণ ও অভ্যাস আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য যেমন ভালো রাখে, তেমনি আমাদের চারপাশের

মানুষকেও সুস্থ থাকতে সহযোগিতা করে।

আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আলাদা আলাদা যত্ন রয়েছে। আমাদের শরীরের যে অংশটুকু খোলা থাকে, তার যেমন যত্ন দরকার, তেমনি যে অংশটুকু পোশাকে ঢাকা থাকে তারও যত্ন দরকার। আমাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার রাখতে হবে। আমাদের শরীরের ব্যক্তিগত কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঘাম ও ময়লা জমে জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে। গোসলের সময় সাবান দিয়ে এসব অংশ পরিষ্কার করতে হবে।

খাবার নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমারা যেন সচেতনভাবে সুষম খাবার নির্বাচন করি তা খেয়াল রাখতে হবে। কেবল মুখে ভালো লাগলেই সে খাবার আমাদের শরীরের জন্য ভালো নাও হতে পারে। আমাদের সুস্থ শরীরের জন্য পুষ্টিকর খাবারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এছাড়া নিয়মিত ও সময়মতো ঘুমানোর অভ্যাস করতে হবে। সুস্থ শরীরের জন্য এক দিনের মধ্যে আমাদের প্রায় আট ঘণ্টা ঘুম দরকার। রাত ৯-১০টার মধ্যে ঘুমানোর চেষ্টা করতে হবে। আর খুব সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে আমাদের নিত্য দিনের কাজে নিযুক্ত হতে হবে।

আমাদের স্বাস্থ্যবিধির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নিয়মিত শরীরচর্চা। সময় করে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে শরীরচর্চা করতে হবে। এসব অভ্যাস ও জীবনাচরণ আমাদের শরীর ও মন সুস্থ রাখতে সহযেগিতা করবে।

মানব শরীর অনেকগুলো জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। এগুলোর সবকিছু আমরা সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করি না। আমাদের অজ্ঞাতেও শরীর তার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালিয়ে যায়, যা আমাদের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক। তবে সচেতনভাবে আমরা যদি সঠিক যত্ন নিই, সঠিক খাবার খাই, নিয়মিত শরীর চর্চা করি, তবেই আমাদের শরীর থাকবে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম। তাই এসব বিষয়ে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

অনুশীলনী ?

১। বয়ঃসন্ধিকালে তোমার মধ্যে যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো ঘটেছে বা ঘটছে তার সাথে কি বইয়ের তথ্যগুলোর কোন মিল দেখতে পাও?
২। নিজের শারীরিক ও মানসিক যত্নে তোমার কোন অভ্যেসটি তুমি পরিবর্তন করতে চাও?

অধ্যায় ১২

মিশ্রণ ও মিশ্রণের উপাদান পৃথকীকরণ

অধ্যায় ১২ মিশ্রণ ও মিশ্রণের উপাদান পৃথকীকরণ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ দ্রবণ, দ্রাবক এবং দ্রব
- ☑ পানি ও পানি চক্র
- ☑ জলীয় দ্রবণ
- ☑ পানি বিহীন দ্রবণ
- ☑ তরল ও গ্যাসের দ্রবণ
- ☑ কঠিন ও কঠিন পদার্থের দ্রবণ
- ☑ কলয়েড ও সাসপেনশন
- ☑ মিশ্রণের উপাদান পৃথকীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি

তোমরা সবাই মিশ্রণ শব্দটার সঙ্গে পরিচিত, দুই বা ততধিক পদার্থ একটি অপরটির সঙ্গে মিশে থাকাকে মিশ্রণ বলে। যেমন: চিনির শরবত হচ্ছে চিনি এবং পানির মিশ্রণ, পাঁচ ফোড়ন হচ্ছে পাঁচ রকম মশলার মিশ্রণ, বাতাস হচ্ছে মূলত অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের মিশ্রণ কিংবা পিতল হচ্ছে তামা এবং দস্তার মিশ্রণ। দেখতেই পাচ্ছ কঠিন, তরল কিংবা গ্যাস সব কিছুরই মিশ্রণ হওয়া সম্ভব।

মিশ্রণ সাধারণত দুই প্রকার: সমসত্ব ও অসমসত্ব।

১. সমসত্ব মিশ্রণে কণাগুলো পরস্পরের সঙ্গে সুষমভাবে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ কোথাও বেশি বা কোথাও কম সংখ্যক কণা থাকে না। বাতাস একটি সমসত্ব মিশ্রণের উদাহরণ ।
২. অসমসত্ব মিশ্রণে কণাগুলো সুষমভাবে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে না। কোথাও বেশি বা কোথাও কমসংখ্যক কণা থাকে এবং একে অপরের থেকে আলাদা থাকে, তাই মিশ্রণের কণাগুলোকে স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়। যেমন, পাঁচফোড়ন।
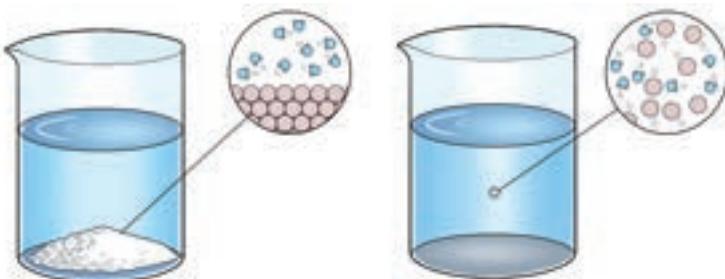
এই অধ্যায়ে আমরা দ্রবণ, সাসপেনশন এবং কলয়েড নামের তিনটি বিশেষ ধরনের মিশ্রণের কথা জানব।

দ্রবণ, দ্রাবক এবং দ্রব

যখন তুমি পানিতে চিনির একটি দানা ছেড়ে দাও, সেটা সেখানে মিশে যায়। দানাটিতে থাকা চিনির ক্ষুদ্র কণাগুলোকে পানি আলাদা করে ফেলে, তারপর চিনির কণাগুলো পুরো পানিতে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা বলে থাকি চিনি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেছে এবং পানি ও চিনি মিলে একটা দ্রবণ তৈরি করেছে।

যখন দুটি বস্তু পরস্পরের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে সমসত্ব মিশ্রণ তৈরি করে তখন একটি দ্রবণ তৈরি হয়। যে বস্তু অন্যবস্তুকে দ্রবীভূত করে, অর্থাৎ যেটি পরিমাণে বেশি, তাকে দ্রাবক বলে এবং যে বস্তু অন্যবস্তুর মধ্যে দ্রবীভূত হয়, অর্থাৎ যেটি পরিমাণে কম, তাকে দ্রব বলে। (এখানে, পানি হলো দ্রাবক এবং চিনি

হলো দ্রব)। কঠিন, তরল এবং গ্যাস এই তিনটি অবস্থার সবগুলোই পরস্পরের সঙ্গে মিশে দ্রবণ তৈরি করতে পারে। দ্রবণের গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হলো, এর উপাদানগুলো নিজেদের মধ্যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না, কাজেই ভৌত পদ্ধতিতেই সেগুলোকে আলাদা করা সম্ভব।

ছবি: চিনি এবং পানির দ্রবণ। চিনি এবং পানি কিভাবে দ্রবণে অবস্থান করে তা দেখানো হয়েছে

তোমরা কি জানো সাগর হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল দ্রবণ? সাগর পৃথিবীপৃষ্ঠের ৭০% জায়গা দখল করে আছে। সাগরে পানি হলো দ্রাবক, কিন্তু তুমি সাগরেরে পানি পান করতে পারবে না। এর কারণ হলো, সাগরের পানিতে অনেক প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ দ্রব হিসেবে দ্রবীভূত রয়েছে।
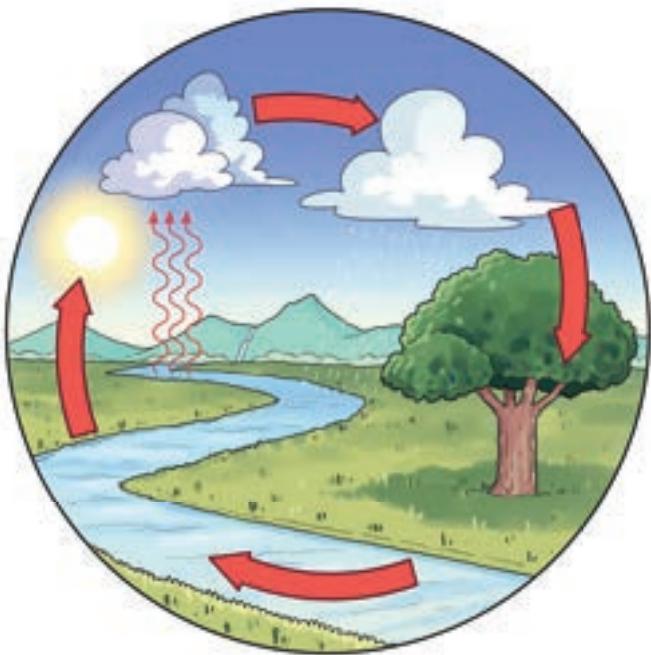
পানি ও পানি চক্র

পানি সাধারণত তরল অবস্থায় থাকে, কিন্তু এটিকে কঠিন এবং গ্যাসীয় অবস্থায় ও পাওয়া যায়। তোমরা জানো, পানির কঠিন রূপকে বরফ বলে আর বাষ্প হলো পানির গ্যাসীয় অবস্থা।

ছবি: পানির বিভিন্ন অবস্থা

০°C হলো বরফের গলনাঙ্ক, একইসঙ্গে এটি পানির হিমাঙ্ক অর্থাৎ এই তাপমাত্রায় পানি বরফে পরিণত হয়! পানির স্ফুটনাঙ্ক হলো ১০০°C অর্থাৎ পানিকে ১০০°C তাপমাত্রায় ফুটালে এটি সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত হয়ে যায়।

গলন, স্ফুটন, বাষ্পীভবন এবং ঘনীভবন পানিচক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ এই চক্রটি বার বার ঘটতে থাকে। সাধারণ তাপমাত্রাতেই প্রতিদিন সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বাষ্পীভূত হয় । তা সত্ত্বেও সাগরের পানির উচ্চতা কিন্তু কমে যায় না। তার কারণ হলো, বাষ্পীভূত পানি ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিতে পরিণত হয়, সেই বৃষ্টির পানি নদীতে প্রবাহিত হয়ে আবার সাগরে এসে পড়ে। এভাবেই ক্রমাগত পানিচক্রটি চলতে থাকে।

ছবি: পানি চক্র

জলীয় দ্রবণ

চিনি ও পানির দ্রবণের মতো যেখানে পানিকে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে জলীয় দ্রবণ বলে। কিন্তু সব দ্রবণেই পানিকে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। পানি ছাড়াও অ্যাসিটোন, অ্যালকোহল, ইথার এরকম বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থকেও দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দ্রবণের ঘনমাত্রা: লঘু ও গাঢ় দ্রবণ

দ্রবণের ভেতর কতটুকু দ্রব দ্রবীভূত আছে সেটি দিয়ে দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ধারিত হয়। বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা বিভিন্ন ঘনমাত্রার লঘু ও গাঢ় দ্রবণ তৈরি করে দেখতে পারি।

বিভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ

তুমি দুইটি পরিষ্কার গ্লাসে এক কাপ করে খাওয়ার পানি নাও। এবারে প্রথম গ্লাসে এক চামচ, দ্বিতীয় গ্লাসে তিন চামচ চিনি দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে নাও যেন চিনিটুকু পুরোপুরি দ্রবীভূত হয়ে যায়। এখন দুটো গ্লাস থেকেই এক চামচ চিনির দ্রবণ নিয়ে তার মিষ্টতার পরিমাপ করো।

(সাবধানতা: এক্ষেত্রে চিনির দ্রবণ আমাদের শরীরের জন্য নিরাপদ। কিন্তু অধিকাংশ রাসায়নিক পদার্থই আমাদের শরীরের জন্যে ক্ষতিকর। সুতরাং, ভালোভাবে না জেনে কোনো প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ও দ্রবণ খাওয়া কিংবা পান করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ।)

তুমি দেখবে যে গ্লাসে ৩ চামচ চিনি মেশানো হয়েছিল সেটি খেতে বেশি মিষ্টি হবে। দুটি দ্রবণের আয়তন এক হলেও, ১ চামচ দ্রব (চিনি) যোগ করা দ্রবণটি হলো লঘু এবং তিন চামচ চিনি যোগ করা দ্রবণটি হলো তুলনামূলক গাঢ় দ্রবণ।

আমরা এবারে ভিন্ন একটা পরীক্ষা করতে পারি। ধরা যাক দুটি গ্লাসেই এক কাপ করে পানির মধ্যে ১ চামচ করে চিনি আছে, তাহলে দুটো দ্রবণের ঘনত্বই সমান। এবার যদি একটি গ্লাসে আরও এক কাপ পানি ঢেলে ভালো করে নেড়ে দিই তাহলে দেখবে যেটিতে তুলনামূলক কম পানি থাকবে সেটি তুলনামূলকভাবে বেশি মিষ্টি হবে। এই ক্ষেত্রেও গাঢ় এবং লঘু দ্রবণ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, এবার দ্রবের পরিমাণ সমান রেখে দ্রাবকের পরিমাণ বাড়ানো এবং কমানো হয়েছে।

তাহলে তোমরা দেখেছ যে, যেরকম দ্রবণে দ্রবের পরিমাণ কম ও বেশি করে বিভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করা যায়, ঠিক সেরকম দ্রবের পরিমাণ ঠিক রেখে দ্রাবকের পরিমাণ বেশি ও কম করেও যথাক্রমে লঘু ও গাঢ় দ্রবণ প্রস্তুত করা যায়।

এখানে আমরা মিষ্টত্ব পরিমাপ করে দ্রবণের লঘুত্ব এবং ঘনত্ব অনুমান করেছি। আমরা যদি চিনির পরিবর্তে গাঢ় নীল রংয়ের তুঁতে কিংবা কপার সালফেট ব্যবহার করে একই ভাবে ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ তৈরি করতাম, তাহলে দেখতাম লঘু দ্রবণের রংটি হালকা এবং গাঢ় দ্রবণের রংটিও গাঢ়।

সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ

সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ বিষয় দুটি বোঝার জন্য তুমি নিচের পরীক্ষাটি করে দেখতে পারো। এ পরীক্ষাটি করার জন্য তুমি আগের মতো একটি গ্লাসে এক কাপ পানি নাও। এখন গ্লাসের পানিতে অল্প অল্প করে লবণ যোগ করে ঠিকমততো নাড়তে থাকো। প্রথমদিকে লবণ সম্পূর্ণরূপে মিশে যেতে থাকলেও একসময় দেখবে খুব ভালোভাবে নেড়ে দিলেও সেটি আর মিশছে না বা দ্রবীভূত হচ্ছে না।

লবণ দ্রবীভূত হতে হতে একসময় কেন আর সেটি দ্রবীভূত হচ্ছেনা? তার কারণ হলো, লবণ দ্রবীভূত হতে হতে একসময় দ্রাবকের ধারণ ক্ষমতার পুরোটিই দ্রব দিয়ে পূর্ণ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় দ্রাবক (পানি) আর কোনো দ্রব (লবণ) দ্রবীভূত করতে পারছে না। সুতরাং, একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকের মধ্যে যদি দ্রাবকের ধারণ ক্ষমতার পুরোটাই দ্রব দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে ঐ দ্রবণকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে। অন্যদিকে, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দ্রবীভূত দ্রবের পরিমাণ যদি দ্রাবকের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতার চেয়ে কম হয় তাহলে তাকে অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলে।

উপরের পরীক্ষায়, লবণের তলানি পড়ার আগ পর্যন্ত দ্রবণটি ছিল অসম্পৃক্ত। যখন দ্রবণটি সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তখন সেটি দ্রবকে আর দ্রবীভূত করতে পারে না বলে সেগুলো তলানি হিসেবে জমা হয়। যতই নাড়াচাড়া করো সেটি আর কোনো দ্রবকে দ্রবীভূত করতে পারে না।

এখানে উল্লেখ্য যে একটি সম্পৃক্ত দ্রবণের তাপমাত্রা বাড়ালে সেটি কিন্তু আবার বাড়তি দ্রবকে দ্রবীভূত করতে পারে, ইচ্ছে করলেই তোমরা এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে পারো। তোমরা কি এর কারণ অনুমান করতে পারবে?
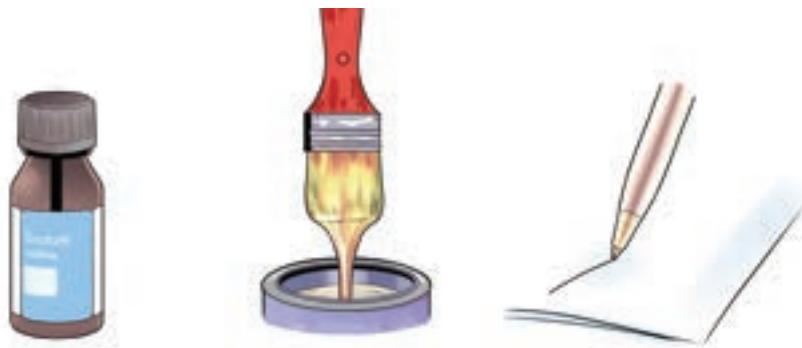
সার্বজনীন দ্রাবক

ইতোমধ্যে তোমরা দ্রাবক সম্পর্কে জেনেছ। সার্বজনীন দ্রাবক বলতে এমন একটি দ্রাবককে বোঝায় যেটি সকল প্রকার পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারে। আদৌ কি এমন দ্রাবক পাওয়া সম্ভব? নিঃসন্দেহে না। আমাদের পরিচিত দ্রাবকগুলোর মধ্যে পানিরই অন্যসব দ্রাবকের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশিসংখ্যক পদার্থ দ্রবীভূত করার ক্ষমতা রয়েছে। তাই পানিই এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত একমাত্র সার্বজনীন দ্রাবক। পানি অনেক ধরনের জৈব উপাদান (যেমন স্পিরিট, অ্যাসিটিক অ্যাসিড) এবং ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সিলিকা এরকম কিছু ব্যতীত অনেক অজৈব উপাদানকে দ্রবীভূত করতে পারে। এমনকি এটি অনেক গ্যাসকেও দ্রবীভূত করতে পারে।

পানিবিহীন দ্রবণ

একটু আগেই তোমরা জেনেছ যে পানি ছাড়া অন্য কিছু দিয়েও দ্রবণ হতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, গৃহস্থালির অনেক কিছুই এরকম দ্রবণ। এখানে কিছু দ্রবণের কথা বলা হলো, যেখানে দ্রাবক হিসেবে পানি ব্যবহার করা হয়নি।

টিংচার আয়োডিন একটি জীবাণুনাশক, কাটা বা ক্ষতস্থানের ওপরে প্রলেপ আকারে দেওয়ার জন্য এটি প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে থাকে। আয়োডিন জীবাণুনাশক হলেও এটি সরাসরি ব্যবহার করা যায়না। আয়োডিন কঠিন পদার্থ হওয়ায় এটিকে ঠিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে জন্য আয়োডিনকে অ্যালকোহলের মধ্যে দ্রবীভূত করে ব্যবহার করা হয়। অ্যালকোহল পানির তুলনায় আয়োডিনকে অনেক ভালোভাবে দ্রবীভূত করতে পারে বলে এখানে দ্রাবক হিসেবে অ্যালকোহলকে ব্যবহার করা হয়। দ্রবণটি যখন কাটা স্থানে লাগানো হয়, তখন এটি সমস্ত জায়গায় সুষমভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অ্যালকোহল

(ক) টিংচার আয়োডিন দ্রবণ (খ) বার্নিশ (গ) কলমের কালি

ছবি: পানিবিহীন দ্রবণ

বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং আয়োডিন থেকে যায়, যা জীবাণুনাশকের কাজ করে। দ্রাবককে এভাবে প্রায়ই দ্রবকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বার্নিশকে দ্রবণ হিসেবে কাঠের উপরে রং করা হয়। দ্রাবক স্পিরিট বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে গেলে কাঠের উপরে দ্রবের একধরনের কঠিন আবরণ থেকে যায়।

কলমের কালি হলো বিভিন্ন দ্রাবকের খুব উৎকৃষ্ট একটি মিশ্রণ। এসব দ্রাবক একই সঙ্গে কালিকে চলাচলে সক্ষম রাখে এবং সহজে শুকিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও প্রদান করে।

তরল ও গ্যাসের দ্রবণ

এখন কিছু দ্রবণ লক্ষ করা যাক, যেখানে দ্রাবক হলো তরল এবং দ্রব হলো গ্যাসীয় পদার্থ। কোমল পানীয় আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। কোমল পানিয়ের বোতল খোলার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসীয় পদার্থটি বুদবুদ আকারে শব্দ করতে করতে বের হয়ে যায়। এই গ্যাসটি হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড যেটিকে তরল অবস্থায় কোমল পানীয়তে দ্রবীভূত করা থাকে। সুতরাং, আমরা বলতে পারি, কোমল পানীয় হলো তরল-গ্যাস দ্রবণের একটি উদাহরণ।

কঠিন ও কঠিন পদার্থের দ্রবণ

কঠিন পদার্থ এবং তরল পদার্থ দিয়ে যেরকম দ্রবণ তৈরি করা সম্ভব সেরকম কঠিন পদার্থের সঙ্গে কঠিন পদার্থের দ্রবণও হওয়া সম্ভব। তোমরা ইতোমধ্যে জেনে গেছ পিতল হচ্ছে তামা এবং দস্তার দ্রবণ, ঠিক সেরকম ব্রোঞ্জ হচ্ছে তামা এবং টিনের দ্রবণ। রকেট কিংবা প্লেন তৈরি করার জন্য অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল কিংবা টাইটেনিয়ামের দ্রবণ দিয়ে নানা ধরনের সংকর (alloy) ধাতু ব্যবহার করা হয়।

দ্রবণ থেকে কেলাস প্রস্তুত

তোমরা কি স্ফটিক বা কেলাসের নাম শুনেছ? কেলাস হলো কোনো একটি কঠিন পদার্থ যেখানে এর অণুগুলো সুনির্দিষ্ট ভাবে সাজানো থাকে। কেলাসের উদাহরণ হচ্ছে টেবিল লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড), তুঁতে বা কপার সালফেট। তোমরা জানো তুঁতে বা কপার সালফেট হচ্ছে নীল বর্ণের। এই নীল বর্ণের

ছবি: দ্রবণ থেকে কেলাস পৃথকীকরণ

কপার সালফেট পানিতে খুবই দ্রবণীয়। কপার সালফেটের খুব চমৎকার নীল রংয়ের কেলাস তৈরি করা যায়। তার জন্য তোমাকে প্রথমে বাজার থেকে একটুখানি তুঁতে সংগ্রহ করতে হবে। মনে রেখো তুঁতে কিন্তু গাছপালা কিংবা প্রাণীর জন্য বিষাক্ত, কাজেই সেটি কিংবা তার দ্রবণ যেন কারও মুখে চলে না যায়।

কেলাস তৈরি করার জন্য তোমাকে তোমার কোনো শিক্ষক বা অভিভাবকের সাহায্য নিয়ে কোনো পাত্রে উচ্চ তাপমাত্রার পানিতে কপার সালফেটের একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে হবে। এরপর এই সম্পৃক্ত দ্রবণটি নিরিবিলি কোথাও রেখে দিতে হবে। কয়েক দিন যদি দ্রবণটিকে কোনো রকম নাড়াচাড়া না করে রেখে দিতে পারো, তখন দেখবে সেখানে কপার সালফেটের কেলাস তৈরি হয়েছে।
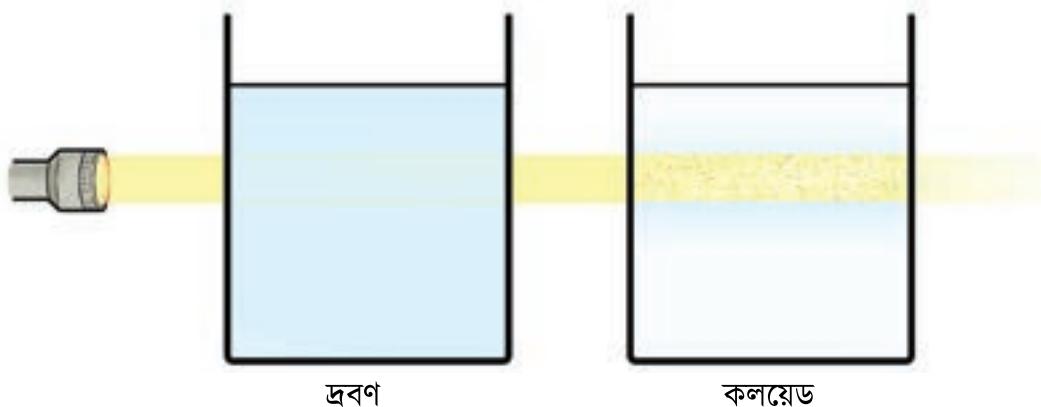
সাসপেনশন

যেসব মিশ্রণ কিছুসময় রেখে দিলে তার উপাদানগুলো পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে পড়ে সেসব মিশ্রণকে সাসপেনশন বলে। চক পাউডার ও পানির মিশ্রণ সাসপেনশনের একটি উদাহরণ। এটি দেখতে দুধের মতো। দ্রবণের মতো সাসপেনশনে উপাদানগুলো নিজ থেকে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় না। যেমন, চক পাউডার মিশ্রিত পানি যদি নাড়ানো বা ঝাঁকানো যায়, তাহলেই এটা পুরো পানিতে মিশ্রিত হয়। আবার ঝাঁকানো বা নাড়ানো বন্ধ করলে ধীরে ধীরে তা আবার নিচে থিতিয়ে পড়ে পানি থেকে আলাদা হয়ে যায়। তোমরা নিশ্চয়ই ডোবা বা নদীর ঘোলা পানির বেলায় একই ব্যাপার ঘটতে দেখেছ। একটি বোতলে ঘোলা পানি না নাড়িয়ে রেখে দিলে তলায় কাদা মাটির কণা থিতিয়ে পড়ে। তোমরা ইচ্ছা করলে এক বোতল পানিতে বালি যোগ করেও সাসপেনশন তৈরি করতে পারবে। এটিকে ঝাঁকিয়ে কণাগুলোর নড়াচড়া লক্ষ করো। তারপর এরপর এটিকে স্থির অবস্থায় রেখে দিলে অল্পকিছুক্ষণের মধ্যেই বালির কণাগুলো বোতলের তলায় গিয়ে জমা হবে। কিছু কিছু সূক্ষ্মকণা অনেক দীর্ঘসময় ধরেও সাসপেনশন আকারে থাকে। সাসপেনশনের বৈশিষ্ট্য হলো, ছাঁকন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাসপেনশন থেকে কণাগুলোকে সহজেই আলাদা করা যায়।

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ কিছু সসের বা ওষুধের বোতলের গায়ে লিখা থাকে 'ব্যবহারের পূর্বে ঝাকিয়ে নিন'। তার কারণ সেগুলো আসলে সাসপেনশন জাতীয় মিশ্রণ!

কলয়েড

আমরা সাসপেনশনের বেলায় দেখেছি যে ভাসমান দ্রবের কণাগুলো কিছুক্ষণ স্থির রাখা হলে সেগুলো পাত্রের তলায় জমা হয়। তোমরা হয়তো এটাও লক্ষ করেছ যে কণাগুলো যদি খুব সূক্ষ্ম হয় তাহলে সেগুলো নিচে থিতিয়ে পড়তে সময় বেশি নেয়। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কণাগুলো কি এমন সূক্ষ্ম হতে পারে যে স্থির অবস্থায় রেখে দিলেও তা কখনো তলানি হিসেবে জমা হবে না? আসলেই সেরকম হতে পারে এবং এধরনের মিশ্রণকে কলয়েড বলা হয়। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি কলয়েড হলো এমন প্রকৃতির মিশ্রণ যেখানে, ক্রমাগত না নাড়িয়ে বা ঝাঁকিয়েই মিশ্রিত পদার্থের কণাগুলোকে সবসময় ভাসমান বা মিশ্রিত অবস্থায় রাখা যাবে। দীর্ঘসময় স্থির রাখলেও সেগুলো আলাদা হয়ে নিচে থিতিয়ে পড়বে না।

ছবি: আলোর রশ্মির সাহায্যে দ্রবণ এবং কলয়েডের পার্থক্যকরণ

কলয়েডের উপাদানগুলো একটি অপরটির মধ্যে দ্রবীভূত না হলেও সেগুলো পরস্পর পরিপূর্ণভাবে মিশে থাকে। আমাদের পরিচিত দুধ হচ্ছে কলয়েডের একটি উদাহরণ যেটা পানি ও চর্বির সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তৈরি।

এবারে আমরা কলয়েড এবং একটি সত্যিকারের দ্রবণের মধ্যে পার্থক্য করার একটি পরীক্ষার কথা বলতে পারি। যখন আলো একটি সত্যিকারের দ্রবণের মধ্য দিয়ে যায়, তখন আলোটি দৃশ্যমান হবে না, কিন্তু যখন কলয়েডের মধ্য দিয়ে যাবে, তখন আলোর রশ্মি কলয়েডের সূক্ষ্ম কণাগুলো থেকে বিচ্ছুরিত হবে বলে মিশ্রণের ভিতর সেটা দেখা যাবে।

কুয়াশা হলো দুধের মতো কলয়েডের আরও একটি উদাহরণ, যেখানে পানির ছোট ছোট কণা বাতাসের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকে। আবার, তরল কীটনাশক 'অ্যারোসল' হলো এক প্রকারের কলয়েড, যেখানে পোকামাকড় প্রতিরোধী তরল পদার্থ বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

কলয়েডের কণাগুলোর আকার ১ মাইক্রোমিটার (১ মিলিমিটারের হাজার ভাগের ১ ভাগ) থেকে ছোট হতে হয়, তার থেকে বেশি হলে সেটি সাসপেনশনে পরিণত হয়।

মিশ্রণের পৃথকীকরণ

মিশ্রণের উপাদান পৃথকীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি

একটি মিশ্রণে কোনো একটি বিশুদ্ধ পদার্থের পাশাপাশি কোনো ধরনের অপদ্রব্য বা দূষক মিশে থাকতে পারে এবং মাঝে মাঝেই আমাদের সেই বিশুদ্ধ বস্তুটি দূষক থেকে আলাদা করতে হয়। আবার কখনো কখনো মিশ্রণের একটি নির্দিষ্ট উপাদান আলাদা করতে হয়। এই পৃথকীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, যেমন, বাষ্পীকরণ, কেলাসন, পাতন ইত্যাদি। এসব পদ্ধতিকে কীভাবে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায়, এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

ছাঁকন

দ্রবণের ভেতর থেকে অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থের কণাগুলোকে আলাদা করার জন্য ছাঁকন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আমরা সবাই ছাঁকন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত, চা থেকে চা পাতা আলাদা করার জন্য আমরা ছাঁকনি ব্যব্বহার করে থাকি। যদি আরও সূক্ষ্ম কিছু আলাদা করতে হয়, তাহলে আমরা ফিল্টার কাগজ ব্যবহার করে থাকি। এ পদ্ধতিতে একটি ফানেলে ছাঁকন কাগজ (filter paper) বসিয়ে দ্রবণটি ঢেলে পানি বা তরল দ্রাবককে কাগজের মধ্য দিয়ে চলে যেতে দেওয়া হয় (নিচের চিত্রটি দেখো)।

বিভিন্ন আকারের কঠিন দূষক (impurity) দ্রবণ থেকে আলাদা করার জন্যে বিভিন্ন রকমের ছাঁকন কাগজ ব্যবহার করা হয়। দূষকের আকারের উপর নির্ভর করে ছাঁকন কাগজের ছিদ্রের আকার ছোট অথবা বড় হয়। এমনকি আমাদের বাসাবাড়িতেও বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন আকারের ছিদ্রের ছাঁকন পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করে থাকি।

ছবি: ছাঁকন পদ্ধতি
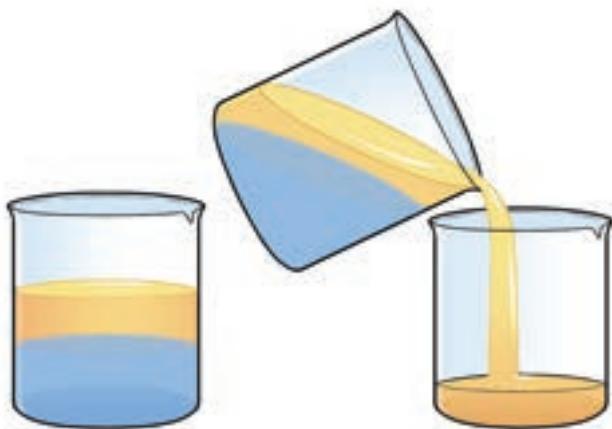
বাষ্পীভবন

দ্রবণ থেকে একটি দ্রবকে আলাদা করার একটি প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে বাষ্পীভবন। বিশুদ্ধ পানি ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বাষ্পীভূত হয়, তবে সেখানে অন্য কিছু দ্রবীভুত থাকলে বাষ্পীভবনের তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। যদি এই দ্রবণে কোনো অপদ্রব্য থাকে তাহলে প্রথমে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে সেগুলো আলাদা করে নেয়া হয়, তারপর তাপ দিয়ে পানিকে বাষ্পীভূত করে বিশুদ্ধ দ্রবকে আলাদা করা হয়। তবে তাপ প্রয়োগ না করলেও স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই পানি বাষ্পীভূত হয়। একটি খোলা পাত্রে পানি রাখা হলে সেটি একসময় শুকিয়ে যায়। পানির তলটি যত বিস্তৃত হবে, কিংবা পানির ওপর বাতাসের প্রবাহ যত বেশি হবে, তত দ্রুত পানি বাষ্পীভূত হয়।

তোমরা সমসত্ব মিশ্রণের কথা পড়েছ। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে তোমরা প্রমাণ করতে পারবে যে দ্রবণ একটি সমসত্ব মিশ্রণ। খানিকটা পানিতে একটু লবণ মিশিয়ে লবণের দ্রবণ তৈরি করে নাও। তারপর দ্রবণটি দুটি কিংবা তিনটি বাটিতে সমানভাগে ভাগ করে নাও। এবারে বাটির দ্রবণে তাপ দিয়ে পানিকে বাষ্পীভূত করে নিলে তুমি প্রত্যেকটা বাটিতেই সমান পরিমাণ লবণ দেখতে পাবে। তুমি ইচ্ছে করলে খালি বাটি এবং লবণসহ বাটি ওজন করে তাদের পার্থক্য থেকে লবণের নিখুঁত পরিমাণ বের করে বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারো।

ডিক্যান্টেশন (Decantation) পৃথকীকরণ পদ্ধতি
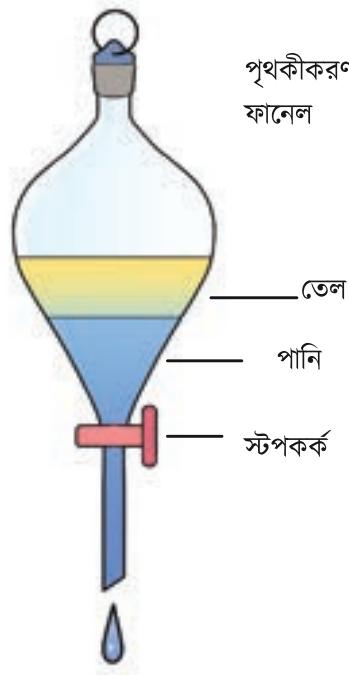
ডিক্যান্টেশন পদ্ধতিতে পরস্পর অমিশ্রণীয় তরল অথবা সাসপেনশনের মতো তরল-কঠিন মিশ্রণ আলাদা করা যায়। পানি থেকে তেল আলাদা করার পদ্ধতি ডিক্যান্টেশনের একটি উদাহরণ। আরেকটি উদাহরণ হলো বালি এবং জলের মিশ্রণের পৃথকীকরণ। নিচের উদাহরণ দুটি থেকে তোমরা পদ্ধতিটি সহজে বুঝতে পারবে।

১. পানি ও তেলের মতো যেসব তরল পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়না সেগুলোর মিশ্রণ রেখে দিলে সেগুলো দুই স্তরে আলাদা হয়ে পড়ে। তেল পানির চেয়ে হালকা বলে সেখানে পানি নিচে এবং তেল ওপরে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

ছবি: পৃথকীকরণ পদ্ধতিতে তেল ও পানি আলাদাকরণ (১)

ল্যাবরেটরিতে পৃথকীকরণ ফানেলের সাহায্যে নিচ থেকে পানির স্তরটি অন্য পাত্রে সরিয়ে ফেলা যায়, তখন সেখানে শুধু তেলের স্তরটি থেকে যাবে এবং পরবর্তীতে তেলকে ভিন্ন আরেকটি পাত্রে সংগ্রহ করা যাবে। তোমরা পানি থেকে তেল আলাদা করতে চাইলে খুব সাবধানে উপর থেকে তেলটুকু কোনো পাত্রে ঢেলে নিতে পারো।

ছবি: পৃথকীকরণ পদ্ধতিতে তেল ও পানি আলাদাকরণ (২)
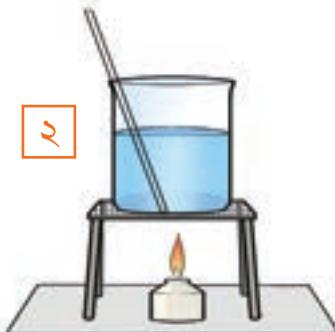
ছবি: পৃথকীকরণ পদ্ধতিতে বালি ও পানি পৃথকীকরণ
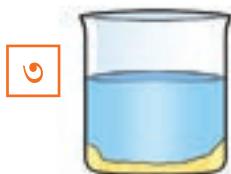
২. যদি তুমি পানি ও বালির মিশ্রণ ডিক্যান্টেশন পদ্ধতিতে আলাদা করতে চাও, তাহলে প্রথমে বালিকে নিচে থিতিয়ে পড়তে দাও। তারপর উপরের পরিষ্কার পানি খুব সাবধানে অন্য একটি পাত্রে কাচ বা অন্য কোনো একটি দণ্ডের গা বেয়ে ঢেলে নাও যেন তলায় জমে থাকা বালির অংশ বা তলানি নড়ে ওলটপালট না হয়ে যায়। যখন উপরের সমস্ত পানি পড়ে যাবে, তখন পাত্রের তলায় শুধু বালি থেকে যাবে।

ছবি: কেলাসন পদ্ধতি

কেলাসন

তোমরা কেলাস তৈরি করার বিষয়টি এর মধ্যে জেনে গেছ। যেহেতু একটি দ্রবণের শুধু বিশুদ্ধ দ্রবটিই কেলাসে পরিণত হয়, তাই কঠিন পদার্থের বিশুদ্ধকরণের একটি পদ্ধতি হলো কেলাসন।

এই পদ্ধতিতে প্রথমে অদ্রবীভুত পদার্থকে ছাঁকন পদ্ধতিতে আলাদা করা হয়। একটি খোলা পাত্রে দ্রবণকে ফুটানো হয়, তখন দ্রাবক বাষ্পে পরিণত হতে শুরু করে এবং দ্রবগুলো আলাদা হওয়া শুরু করে। যখন দ্রবণকে ঠান্ডা করা হয়, তখন পাত্রের গায়ে দ্রব কণাগুলো ধীরে ধীরে কেলাস হিসেবে জমাট বাঁধতে শুরু করে। উৎপন্ন দ্রবের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তারপর তাদেরকে সংগ্রহ করে শুকানো হয়। কত তাড়াতাড়ি দ্রবণের তাপমাত্রা কমানো হচ্ছে তার উপর কেলাসের আকার নির্ভর করে। দ্রুত তাপমাত্রা কমালে কেলাসের আকার অনেক ছোট হয়, বড় কেলাস ধীরে ধীরে শীতল করার মাধ্যমে পাওয়া যায়।

পাতন (Distillation)

ভালোভাবে পরিশোধিত ট্যাপের বা নলকূপের পানি পরিষ্কার অবস্থায় পাওয়া যায় যেখানে ভাসমান বা অদ্রবীভুত কোনো কণা থাকেনা। কিন্তু এটি শতভাগ বিশুদ্ধ নয়। নলকূপ বা ট্যাপের পানিকে যখন ফুটিয়ে শুকিয়ে ফেলা হয় তখন প্রায় সময়েই পাত্রের তলায় সামান্য কিছু কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ট্যাপ বা নলকূপের পানিতে কিছু রাসায়নিক পদার্থ দ্রবীভূত থাকে যেগুলোকে দ্রবীভূত লবণ বলে।

পাতন পদ্ধতি ব্যবহার করে নিচে দেখানো চিত্র অনুযায়ী শতভাগ বিশুদ্ধ পানি পাওয়া সম্ভব। পাতন পদ্ধতিতে তরলকে প্রথমে তাপ প্রয়োগ করে বাষ্পীভূত করা হয়, উৎপন্ন বাষ্পকে নিম্ন তাপমাত্রায় রাখা কোনো কাচনল বা পাইপের মধ্য দিয়ে চালনা করে শীতল করা হয়। শীতলীকৃত বাষ্প তখন ঘনীভূত হয়ে তরল পানিতে পরিণত হয়। উৎপন্ন তরল পানিকে পাতিত পানি বলে।

সমুদ্রের লোনা পানি থেকেও এই পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এতে অনেক শক্তির অপচয় হয় বলে এই পদ্ধতিতে সমুদ্রের পানি থেকে খাবার পানি প্রস্তুত করা হয় না।

ছবি: পাতন পদ্ধতি

বাসায় ব্যবহৃত কিছু মিশ্রণ পৃথকীকরণের পদ্ধতি

আমাদের বাসায়, বিশেষ করে রান্নাঘরে অনেক ভাবে আমরা নানা ধরনের মিশ্রণ আলাদা করি। সব রান্নাঘরেই নানা ধরনের ছাঁকনি থাকে। চালুনি দিয়ে খাবারের সূক্ষ্ম এবং বড় দানা আলাদা করা একটি প্রচলিত পদ্ধতি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পানি হতে সিদ্ধ ভাত আলাদা করা কিংবা চা থেকে ছাকনির সাহায্যে চা পাতা আলাদা করা নিয়মিত ব্যাপার। পানি ছাঁকার জন্য আমরা অনেক সময় পাতলা কাপড় ফিল্টার হিসেবে ব্যবহার করি। গ্রামবাংলার রান্নায় লবণ বেশি হয়ে গেলে কাঠকয়লা দিয়ে সেটি শোষণ করে নেওয়ার পদ্ধতিটি যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক। লোহার স্ক্রু আলাদা করার জন্য অনেক স্ক্রু ড্রাইভারের মাথাতে খানিকটা চৌম্বকত্ব থাকে।

ছবি: ছাঁকনির সাহায্যে চা পাতা পৃথকীকরণ

তোমরা তোমাদের বাসার নানা ধরনের কাজকর্ম মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে মিশ্রণের উপাদান আলাদা করার অন্য কোনো পদ্ধতির কথা বলতে পারবে কী?

অনুশীলনী ?

১। চা কোন ধরনের মিশ্রণ? চা বানানোর পরে এর উপাদানসমূহ কী আলাদা করা সম্ভব? সম্ভব হলে কীভাবে?

২। পানিতে আটা বা ময়দা গুলিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে দেখো, এটাকে কী বলা যায়? দ্রবণ, কলয়েড, নাকি সাসপেনশন? নাকি কোনোটাই না?

অধ্যায় ১৩

জীবের পুষ্টি ও বিপাক

অধ্যায় ১৩

জীবের পুষ্টি ও বিপাক

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া।
- ☑ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও টিকে থাকা।
- ☑ উদ্ভিদের পানি ও খনিজ উপাদান পরিবহণ ব্যবস্থা।
- ☑ প্রাণীর পুষ্টি পরিশোষণ ও ব্যবহার।

তুমি নিশ্চয়ই ক্ষুধা পেলে খাবার খাও। অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকলে দুর্বল বোধ করো। চারপাশে তাকালে দেখবে অন্য সব প্রাণীই খাবার খাচ্ছে। কখনো কি ভেবেছ উদ্ভিদের কথা? উদ্ভিদেরও কি খাবার দরকার হয়? তারা কীভাবে খাবার জোগাড় করে?

কেবল উদ্ভিদ বা প্রাণীই নয় প্রকৃতির সকল জীবের জীবন ধারণ এবং টিকে থাকার জন্য খাবার প্রয়োজন হয়। জীব এসব খাবার ভেঙে পুষ্টি উপাদান তার কোষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলে।

যেকোনো জীবের বেঁচে থাকা এবং বৃদ্ধির জন্য পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন। সরল জীব, যেমন—এককোষী ব্যাকটেরিয়া, ঈস্ট, কিংবা ছত্রাক পরিবেশ থেকে প্রায় সরাসরি পুষ্টির উপাদান গ্রহণ করে। অপর দিকে জটিল জীব, যেমন—বড় উদ্ভিদ কিংবা মানুষ বিশদ পদ্ধতিতে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ ও ব্যবহার করে।

তবে সবার ক্ষেত্রেই একটি কথা প্রযোজ্য—সকল জীবই তার পুষ্টির প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। এই বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে জীবকে মূলত দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—স্বভোজী (অটোট্রফিক, Autotrophic) এবং পরভোজী (হেটারোট্রফিক, Heterotrophic) জীব।

যেসব জীব পরিবেশ থেকে কার্বন, পানি ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাদের খাবার তৈরি করে নিতে পারে তাদেরকে বলা হয় স্বভোজী জীব। যেমন—বিভিন্ন অণুজীব, সবুজ শৈবাল, উদ্ভিদ ইত্যাদি।

অপরদিকে যেসব জীব পরিবেশের অন্যান্য জীব থেকে খাবার (অর্থাৎ বিভিন্ন জৈব উপাদান, যেমন—আমিষ বা প্রোটিন, লিপিড বা স্নেহ, কার্বহাইড্রেট বা শর্করা) সংগ্রহ করে তাদেরকে পরভোজী জীব বলা হয়। যেমন বিভিন্ন প্রাণী—মানুষ, বাঘ, মুরগি ইত্যাদি।

এ তো গেল কীভাবে কার্বনসমৃদ্ধ জৈব উপাদান তৈরি করছে সেই বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে জীবের শ্রেণিবিভাগ। কিন্তু আবার যদি আমরা দেখি, জীব কিভাবে পরিবেশ থেকে শক্তি (Energy) সংগ্রহ করে তবে সেই বিবেচনায়ও জীবকে মূলত দুই ভাগে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। এবার আমরা সেই সম্বন্ধে জানব।

পৃথিবীর সকল শক্তির উৎস হচ্ছে সূর্য যা আমাদের আলোকশক্তি প্রদান করে। এই আলোকশক্তিই আবার নানান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে সঞ্চিত হয়।

শক্তির প্রাথমিক উৎস হিসেবে কিছু জীব সূর্যের আলোকে সরাসরি ব্যবহার করে এবং জটিল জৈব অণু (শর্করা) তৈরি করে। এদেরকে বলা হয় ফটোট্রপিক বা স্বালোকপোষিত জীব। যেমন- সবুজ উদ্ভিদ ও সবুজ শৈবাল, সায়ানোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। এরা সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরি করে।

অপরদিকে কিছু জীব রাসায়নিক পদার্থকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। এদেরকে বলা হয় কেমোট্রপিক বা রাসায়নিকপোষিত জীব। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এই ধরনের জীবনের অন্তর্ভুক্ত। আমরা মানুষও কিন্তু কেমোট্রপিক জীব। কারণ, আমরাও সূর্যের আলো কাজে লাগিয়ে সরাসরি খাবার উৎপাদন করতে পারি না। আমরা উদ্ভিদ কিংবা অন্য জীব থেকে পাওয়া উপাদান খেয়ে আমাদের শক্তির চাহিদা মেটাই।

এতক্ষণ পর্যন্ত মূলত আমরা কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত পুষ্টি উপাদান নিয়েই কথা বলেছি। তবে এগুলোর বাইরে আরও কিছু রাসায়নিক উপকরণ জীবের বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন হয়। যেমন—নাইট্রোজেন, ফসফরাস, খনিজ লবণ (পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, কপার, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি)।

অণুজীবে পুষ্টি উপাদান পরিশোষণ

এককোষী অণুজীবগুলো কর্তৃক তাদের পুষ্টি উপাদান পরিশোষণ সরল প্রকৃতির হয়। তাদের কোষটি সরাসরি পুষ্টি উপাদানের সান্নিধ্যে থাকে, যা তাদের পুষ্টিপ্রাপ্তিকে তুলনামূলকভাবে সহজ করে তোলে।

অনেক সময় পুষ্টি উপাদান পরিবেশ থেকে সরাসরি কোষঝিল্লি ভেদ করে অণুজীবের কোষের ভেতরে প্রবেশ করে। আবার কখনো কখনো পুষ্টি উপাদানকে পরিবেশ থেকে কোষের ভেতরে নেওয়ার জন্য কোষঝিল্লির কিছু বাহক সহযোগিতা করে।

এককোষী অণুজীবের উপরোক্ত পুষ্টি গ্রহণ প্রক্রিয়াগুলোই মূলনীতি হিসেবে বহুকোষী বড় উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে কাজ করে।

উদ্ভিদের পুষ্টি ও পরিশোষণ

আমরা সাধারণত উদ্ভিদ বলতেই স্বভোজী জীব বলে মনে করি। অর্থাৎ তারা নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরি করে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা পুরো সত্যি নয়। অনেক উদ্ভিদ আছে যারা তাদের পুষ্টি সংগ্রহের জন্য অপর উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে। যেমন—স্বর্ণলতা, এর কোনো ক্লোরোফিল নেই। ক্লোরোফিল হলো একধরনের সবুজ কণা যার মাধ্যমে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করতে পারে। স্বর্ণলতায় ক্লোরোফিল না থাকার ফলে তারা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজেরা কোনো খাবার তৈরি করতে পারে না। তাদের

পুষ্টি উপাদানের জন্য তারা অপর উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে। আবার কোনো উদ্ভিদ আছে যারা কীট-পতঙ্গ থেকেও পুষ্টি সংগ্রহ করে—এদেরকে পতঙ্গভূক উদ্ভিদ বলে। তবে তারা নিজেরাও নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে।

উৎস স্থান থেকে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পুষ্টির উপাদানাগুলো পরিবহণ করার জন্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোষ এবং টিস্যু থাকে যারা পুষ্টি পরিবহণের এই কাজগুলোতে নিযুক্ত থাকে। এদেরকে বলা হয় জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যু। আমরা আগেও এগুলোর কথা জেনেছি । এই টিস্যুগুলোকে উদ্ভিদের দেহের ভেতরে থাকা কিছু সুনির্দিষ্ট পথের সঙ্গে তুলনা করা যায় যাদের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট উপাদানগুলো চলাচল করে। মাটি থেকে মূলের মাধ্যমে পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত খনিজ উপাদান শোষণ করে তা পরিবহণ করার কাজটি করে জাইলেম টিস্যু। অপরদিকে উদ্ভিদের সবুজ পাতায় তৈরি হওয়া পুষ্টি উপাদান (যেমন—শর্করা) উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে পৌছে দেওয়ার পথটি হচ্ছে ফ্লোয়েম টিস্যু দিয়ে তৈরি।

উদ্ভিদের পরিবহণে সহযোগিতার পাশাপাশি জাইলেম ও ফ্লোয়েম উদ্ভিদকে দৃঢ়তাও প্রদান করে। আণুবীক্ষণিকভাবে জাইলেম টিস্যুকে ঘিরে ফ্লোয়েম টিস্যুর অবস্থান দেখা যায়।

প্রাণীর পুষ্টি ও পরিশোষণ

উদ্ভিদ ও প্রাণীর অন্যতম বড় পার্থক্য হচ্ছে তাদের খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনায়। কোনো প্রাণীই নিজের কোষের ভেতর খাদ্য তৈরি করতে পারে না। ফলে খাদ্যের জন্য প্রাণীকে উদ্ভিদ বা অন্য কোনো জীব বা অণুজীবের ওপর নির্ভর করতে হয়। আমরা যখন শাকসবজি, ভাত, মাংস, মাছ ইত্যাদি খাই, তখন আমরা আসলে পুষ্টি উপাদান যেমন—শর্করা, আমিষ, স্নেহ ইত্যাদি গ্রহণ করি। এর বাইরে আমাদের খনিজ উপাদান যেমন—ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, ভিটামিন ইত্যাদিও প্রয়োজন হয়।

এসব উপাদানও আমরা আমাদের গ্রহণ করা বিভিন্ন খাবার থেকে পাই।
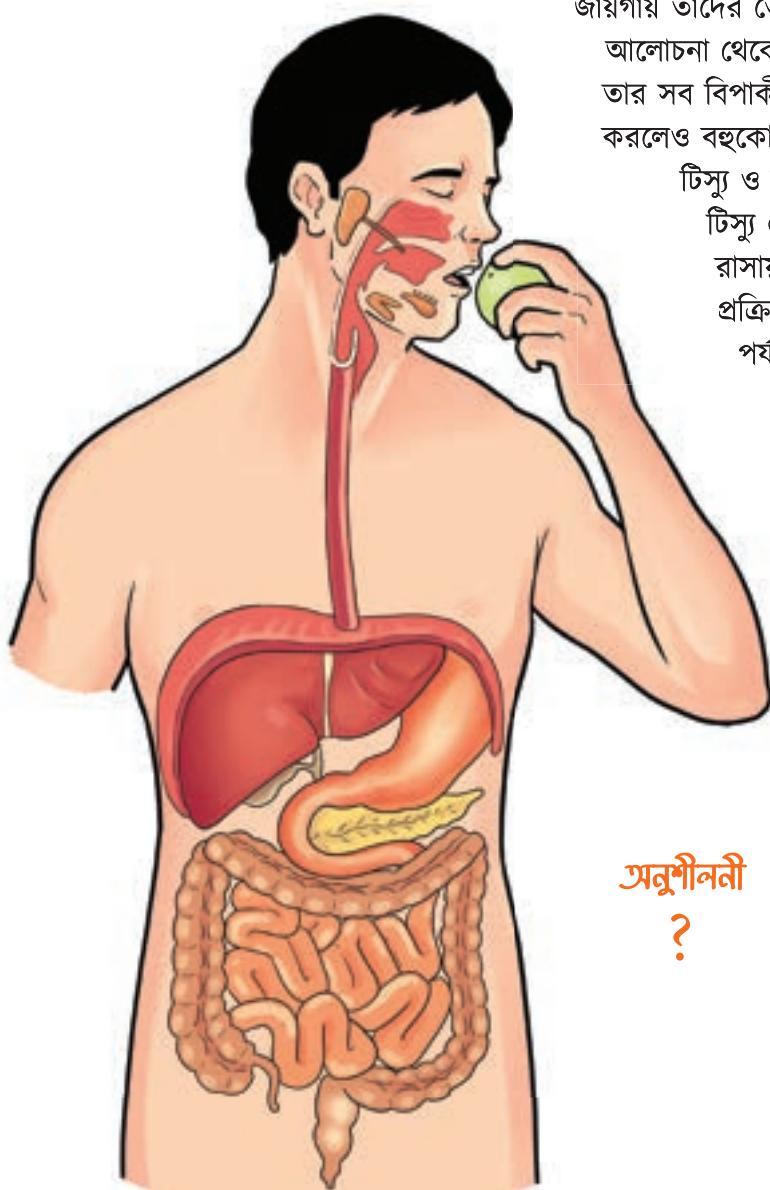
এর আগে আমরা দেখেছি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তার পুষ্টি উপাদান পরিশোষণ ও পরিবহণের জন্য বিশেষ টিস্যু রয়েছে। প্রাণীর ক্ষেত্রেও তার পুষ্টি গ্রহণ ও পরিশোষণের বিষয়টি নির্দিষ্ট কোষ, টিস্যু এবং অঙ্গের

মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেমন—মানুষের ক্ষেত্রে পরিপাকতন্ত্র রয়েছে। এই পরিপাকতন্ত্র জটিল খাদ্য ভেঙে কোষের ব্যবহার উপযোগী পুষ্টি উপাদানে পরিণত করে যা রক্তে শোষিত হয়ে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

খাদ্য পরিপাকের বিষয়টি শুরু হয় আমাদের মুখ থেকে। আমরা যখন ভাত, রুটি বা মাছ খাই, তখন আমাদের দাঁতের মাধ্যমে সেগুলোকে ছোট ছোট টুকরা করি, আমাদের জিহ্বার নিচে অবস্থিত লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা আমাদের খাবার পরিপাকে সহযোগিতা করে। এরপর খাবার আমাদের পাকস্থলিতে যায়। সেখানকার বিশেষ পরিবেশে খাদ্যাকে আরও ভালোভাবে পরিপাক করে। এসব ধাপ শেষে আমাদের গ্রহণ করা খাবার ভেঙে ছোট ছোট জৈব অণুতে পরিণত হয়। এই পাকস্থলি এবং তার পরের ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদন্ত্রে বিশেষ পরিশোষক কোষ আছে যেগুলো পরিপাক করা খাবার থেকে ওই সব ছোট ছোট পুষ্টি উপাদান শোষণ করে রক্তের মাধ্যমে পুরো শরীরে বয়ে নিয়ে যায়।

অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৌলিক পার্থক্য থাকলেও মৌলিক জায়গায় তাদের ভেতর বেশ কিছু সাদৃশ্য আমরা উপরের আলোচনা থেকে দেখতে পাই। এককোষী ব্যাকটেরিয়া তার সব বিপাকীয় কাজ একটি কোষের ভেতর সম্পন্ন করলেও বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীতে কাজগুলো বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবে এসব টিস্যু এবং অঙ্গের এক একটি কোষের জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে এককোষী জীবের প্রক্রিয়াগুলোর মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে বলা যায় যে, সকল জীব কিছু মৌলিক নিয়মকে ভিত্তি করে এই পৃথিবীতে বিকশিত হয়েছে।

অনুশীলনী ?

১। পৃথিবীতে কোনো অণুজীব যদি না থাকত, মানুষের পুষ্টি গ্রহণ বা বিপাক ক্রিয়ায় কোনো সমস্যা হতো কি?

অধ্যায় ১৪

আলো

অধ্যায় ১৪ আলো

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ আলোর রং
- ☑ প্রতিফলন প্রতিসরণ ও শোষণ
- ☑ কীভাবে দেখি এবং রং এর ধরন

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, আমরা চোখে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে আলো। তবে সেটা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক একটা কথা হলো না কারণ চোখে আমরা মানুষ, গাছপালা, আকাশ, মেঘ অনেক কিছু দেখি— সেগুলো কি আলো? না, সেগুলো আলো না কিন্তু সেগুলোতে আলো পড়ে বলে সেখান থেকে আলো যখন আমাদের চোখে এসে পড়ে তখন আমরা সেগুলোকে দেখি। যদি অন্ধকার হয়ে যায় কিংবা যখন আমরা চোখ বন্ধ করে কোনো আলোকে চোখে আসতে না দিই, তাহলে আমরা কিছুই দেখিনা।

তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ একটা জবা ফুলকে কেন আমরা লাল দেখি আর জবা ফুলের পাতাকে কেন সবুজ দেখি? সেটি যদি বুঝতে চাও তাহলে আলো সম্পর্কে আমাদের আরও একটু জানতে হবে।
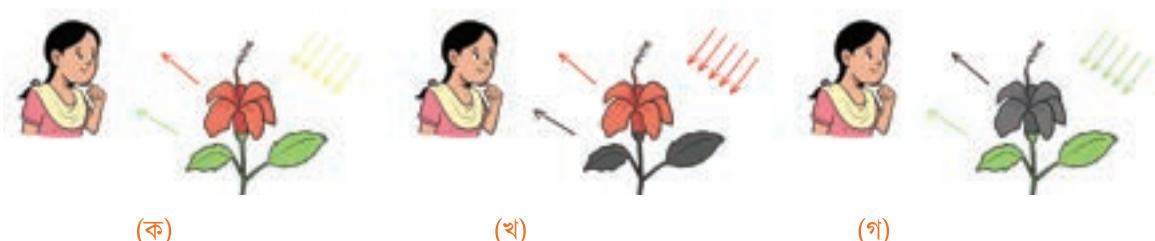
আলোর রং

তোমরা এর মধ্যে জেনে গেছ যে বিজ্ঞানী নিউটন পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে, সূর্যের আলো—যেটা বর্ণহীন কিংবা সাদা আলো সেটা আসলে বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল রং দিয়ে তৈরি। সবগুলো একসঙ্গে মিশে থাকলে আমাদের চোখে সেটাকে বর্ণহীন বা সাদা রং হিসেবে দেখা যায়। সূর্যের আলোতে যে এই সাতটি রং আছে সেটা আমরা নিজেরাও রংধনুতে দেখেছি, সেখানে সূর্যের আলো সাত রঙে ভাগ হয়ে যায়। গানের বা কম্পিউটারের যে সিডি পাওয়া যায়, সেখানে আলো প্রতিফলিত করলেও সেখানে সাতটি রংকে ভাগ হয়ে যেতে দেখা যায়।

কাজেই আমরা যখন একটা জবা ফুলকে লাল দেখি তার অর্থ সবগুলো রংয়ের সংমিশ্রণে তৈরি সাদা রং এই ফুলে পড়ার পর লাল ছাড়া অন্য সব রং শোষিত হয়ে গেছে—তাই সেখান থেকেই শুধু লাল রংটা বের হয়ে আমাদের চোখে পর্যন্ত আসতে পারছে। সে কারণে আমরা ফুলটা দেখছি লাল। ঠিক সেরকম আমরা গাছের পাতাকে সবুজ দেখি কারণ, সেখানে সব রংয়ের মিশ্রণ তৈরি সাদা আলো পড়ার পর সবুজ ছাড়া অন্য সব রং শোষিত হয়ে গেছে—তাই সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসা সবুজ রংটা যখন আমাদের চোখে এসে পড়ে তখন আমরা সেটাকে সবুজ রংয়ের দেখি।
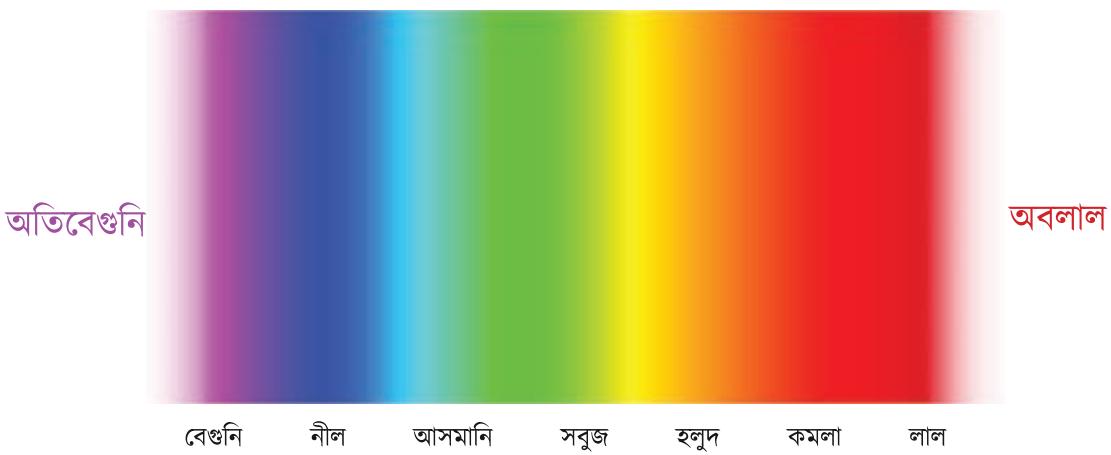
বিষয়টা যে সত্যি, তোমরা ইচ্ছা করলেই সেটা নিজেরাও পরীক্ষা করে দেখতে পারো। লাল ফুলকে তুমি যদি সবুজ আলোতে দেখার চেষ্টা করো তাহলে ফুলটাকে দেখবে কুচকুচে কালো! কারণ সবুজ রংটা জবা ফুলে শোষিত হয়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে কোনো রংয়ের আলোই বের হবে না, তাই সেটা দেখাবে কালো। ঠিক একই কারণে লাল আলোতে সবুজ পাতাটাকে দেখাবে কুচকুচে কালো।

(ক) (খ) (গ)

(ক) সাদা আলোতে রঙিন জিনিস সঠিক রংয়ে দেখা যায় (খ) লাল আলোতে সবুজ রংয়ের জিনিস দেখা সম্ভব নয় (গ) (খ) সবুজ আলোতে লাল রংয়ের জিনিস দেখা সম্ভব নয়

কাজেই তোমরা বুঝতে পারছ কোনো কিছুর রং কালো হওয়ার অর্থ সেখানে সব রং শোষিত হয়ে যায়। ঠিক সেরকম কোনো কিছুর রং সাদা হওয়ার অর্থ, সেখানে কোনো রং শোষিত হয় না! একটা কালো কাপড় আরেকটা সাদা কাপড় রোদে শুকাতে দিলে তুমি দেখবে কালো কাপড়টা অনেক তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় কারণ কালো রং হওয়ার কারণে সেটি আলোর সব রং শোষণ করে রাখে বলে সেটা বেশি গরম হয়ে বেশি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে পারে।

একটু আগে তোমাদের বলা হয়েছে সাদা আলোর রংগুলো যদি ভাগ করা হয় তাহলে সেখান থেকে রংগুলো যথাক্রমে বেগুনি নীল আসমানি সবুজ হলুদ কমলা লাল এই ভাবে ভাগ হয়:

ছবি: দৃশ্যমান আলোর বাইরেও রয়েছে অতিবেগুনি ও অবলাল আলো

এবারে একটা বিচিত্র প্রশ্ন করা যাক, বেগুনির আগে কি কোনো রং আছে? আবার লালের পর কি কোনো রং আছে? সত্যি কথা বলতে কি বেগুনির আগের রংটির নাম অতিবেগুনি এবং লালের পরের রংটি হচ্ছে অবলাল! তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমরা সেই রংগুলো দেখতে পাই না! পোকামাকড় অতিবেগুনি রং খানিকটা দেখতে পায়, তাই দেখা যায়, পোকামাকড় ধরার জন্য অনেক সময় অতিবেগুনি ধরনের আলো ব্যবহার করা হয়। অবলাল রংটি টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোলেও ব্যবহৃত হয়। তোমার চোখে সেই রং দেখতে না পেলেও স্মার্টফোনের ক্যামেরা সেই রং দেখতে পারে, তাই তোমরা ইচ্ছা করলে একটা স্মার্টফোনের ক্যামেরার সামনে রিমোট কন্ট্রোল চেপে ধরে সেই আলোকে দেখতে পারো।

আলো কিন্তু একদিকে অতিবেগুনি রশ্মি অন্যদিকে অবলাল হয়েও শেষ হয়ে যায় না সেটি আরও বহুদূর বিস্তৃত হয়; তোমরা উপরের ক্লাসে সেগুলো জানতে পারবে।
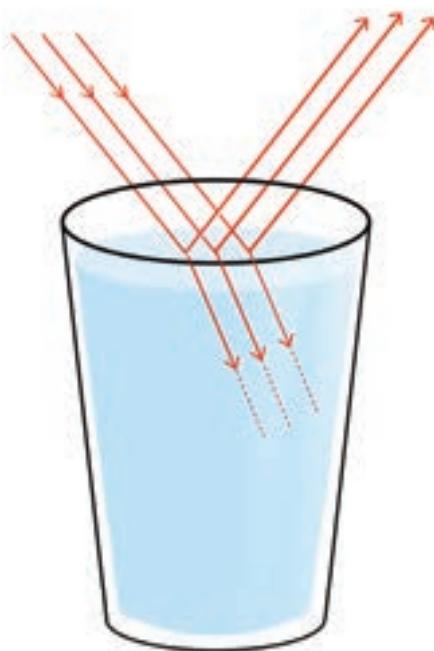
প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও শোষণ

তুমি যদি জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর আসা সূর্যের আলোতে একটা গ্লাসে পানি কানায় কানায় ভর্তি করে রেখে দাও, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে পানির পৃষ্ঠদেশ থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে ঘরের ছাদে এসে পড়েছে। ভালো করে লক্ষ করলে দেখবে সূর্যের আলো প্রতিসরিত হয়ে পানির ভেতর দিয়ে
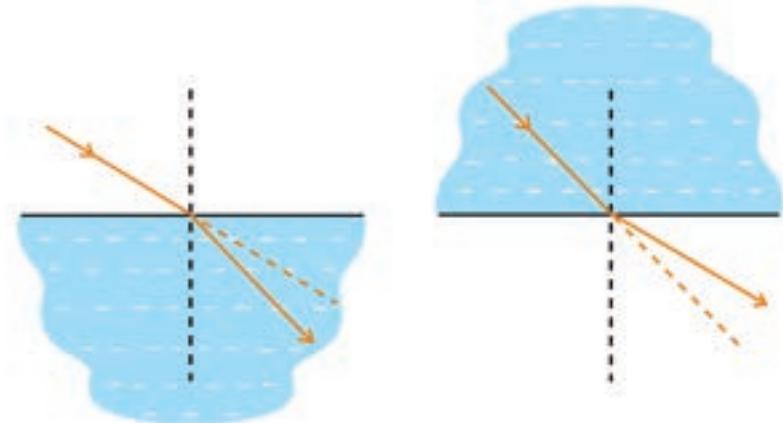
গ্লাসের ভেতরে ঢুকে গেছে। শুধু তাই না তুমি যদি গ্লাসের পানিটা দীর্ঘ সময় রোদে রেখে দাও, তাহলে দেখবে পানিটা একটুখানি গরম হয়েছে, যার অর্থ সূর্যের আলো খানিকটা শোষিত হয়েছে।

এখানে বাতাসে ছিল একটা মাধ্যম, সূর্যের আলো সেই মাধ্যম থেকে অন্য আরেকটি মাধ্যমে পানিতে এসে পড়েছে। আলো যখনই একটা মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে এসে পড়ে তখনই প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং শোষণ এই তিনটি প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। কতটুকু আলো প্রতিফলিত হয়ে বাইরে বের হয়ে যাবে, কতটুকু প্রতিসরিত হয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে এবং কতটুকু শোষিত হবে সেটি নির্ভর করে মাধ্যম দুটোর প্রকৃতির উপর, কত কোণে আলোটি এসে পড়েছে ইত্যাদি বিষয়ের উপর।

একটু আগেই তোমরা জানতে পেরেছ একটা জিনিসের রং কী তার ওপর নির্ভর করে কোন রং কতটুকু শোষিত হবে। খালি চোখে যেটাকে স্বচ্ছ বা রংহীন মনে হয় সেটাতেও কিন্তু কমবেশি রং শোষিত হয়।
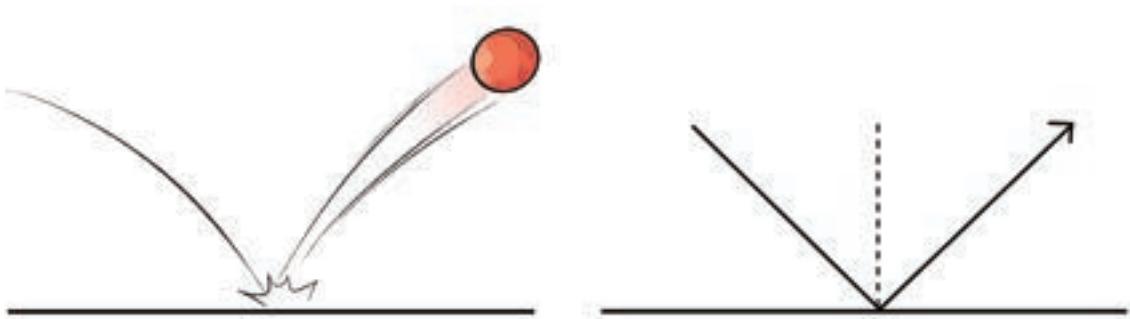
ছবি: আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং শোষণ

ছবি: বাতাস থেকে পানিতে এবং পানি থেকে বাতাসে আলোর প্রতিসরণ

আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ কিছু নিয়ম মেনে চলে। একটা সমতল মেঝেতে একটা বল ছুড়ে মারলে সেটা যেভাবে ঠিক বিপরীত দিকে একই কোণে ছুটে যায়, আলোর প্রতিফলনের বেলায় ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় আলো ঠিক একইভাবে বিপরীত দিকে প্রতিসরিত হয়।

ছবি: আলোর প্রতিফলন মেঝে থেকে বল ধাক্কা খেয়ে উপরে ওঠার মতো।
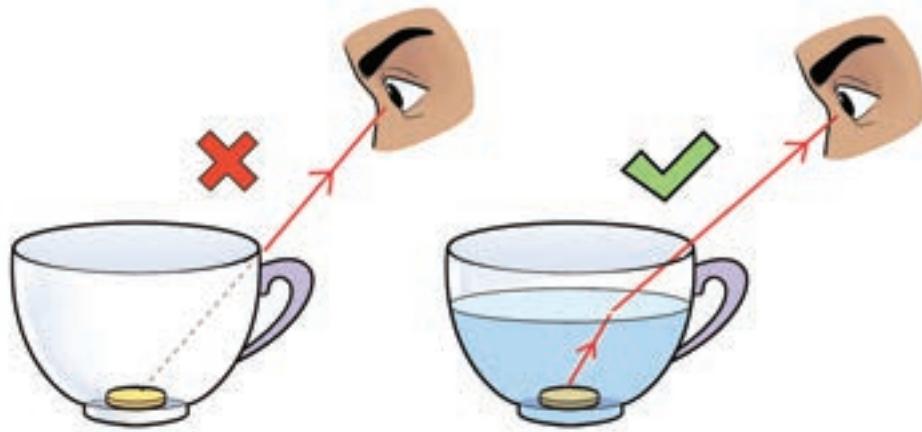
আলোর প্রতিফলন আমাদের খুবই পরিচিত একটা ব্যাপার। আমরা প্রতিদিন আয়নায় আমাদের মুখ দেখি! আয়নায় নিজের চেহারা দেখার সময় আমরা সব সময় একটা বিষয় লক্ষ করেছি, প্রতিফলিত চেহারায় ডান এবং বাম সব সময় অদল বদল হয়ে যায়। তোমরা কি কখনো এটি কেন হয় চিন্তা করে দেখেছ? তোমরা কি এমন একটি আয়না তৈরি করতে পারবে যেখানে আমরা আমাদের চেহারা দেখলে দেখব আমাদের ডান এবং বাম অদল বদল হয়নি?

কাজটি কঠিন নয়। ছবিতে দেখানো উপায়ে দুইটি আয়না ৯০ ডিগ্রি কোণে রাখো, দেখবে সেখানে তোমার চেহারা অদল বদল হয়নি। ডান হাত উপরে তুললে প্রতিফলিত চেহারাও ডান হাত উপরে তুলবে? কেন এটা হয় বলতে পারবে?

ছবি: সমকোণে রাখা দুটি আয়নায় প্রতিফলনে ডান-বাম উল্টে যায় না।

আলোর প্রতিসরণের আরও চমকপ্রদ একটি ব্যাপার ঘটে। আমরা সব সময়ই দেখে অভ্যস্ত যে আলো সরল রেখায় যায়। কিন্তু আলো যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে ঢোকার চেষ্টা করে, তখন কিন্তু সেটা সরলরেখায় যায় না—আলোটা বাঁকা হয়ে ঢোকে। যদি হালকা মাধ্যম (বাতাস) থেকে ঘন (পানি) মাধ্যমে যায়, তাহলে আলোর রেখাটি ভেতরের দিকে বেঁকে যাবে। যদি আলোটা ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যায়, তাহলে বাইরের দিকে বেঁকে যায়। বিষয়টা যে সত্যি তুমি সেটা খুব সহজে পরীক্ষা করে দেখতে পারো। একটা খালি কাপে একটা মুদ্রা রাখো যেন মুদ্রাটা তুমি দেখতে পারো। আলো যেহেতু সরলরেখার যায়, তাই বলা যায় এখন

ছবি: পানি থেকে বাতাসে যাওয়ার সময় আলোক রশ্মি বাঁকা হয়ে যাচ্ছে।
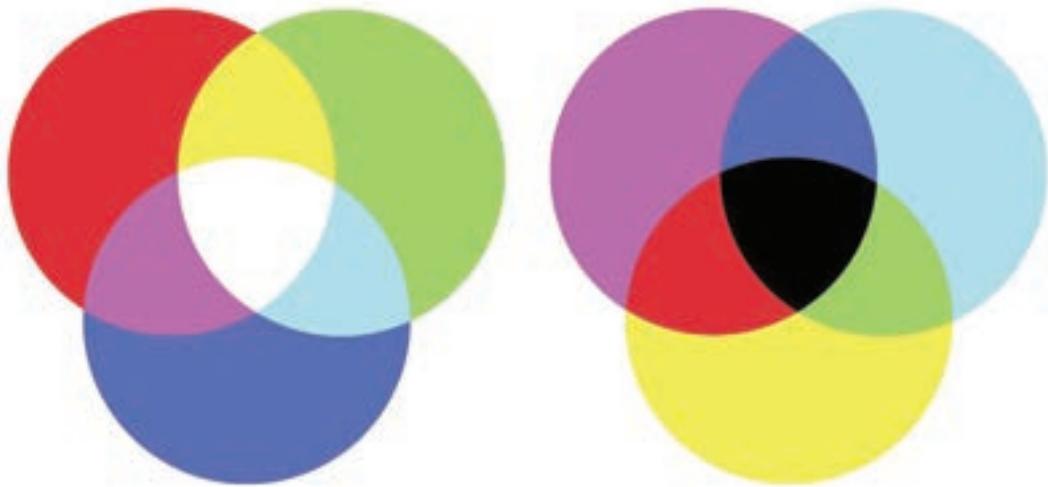
মুদ্রাটা এবং তোমার চোখে এক সরলরেখায় আছে। এবারে তুমি তোমার মাথাটা ধীরে ধীরে পিছিয়ে নিতে থাক যেন মুদ্রাটা আর দেখা না যায়। এবারে কাপটাতে পানি ঢালতে থাকো, দেখবে মনে হবে মুদ্রাটা উপরে উঠে এসেছে এবং তুমি আবার সেটাকে দেখতে পাচ্ছ। আসলে মুদ্রাটা মুদ্রার জায়গাতেই আছে, আলোটাই বাঁকা হয়ে চোখে আসছে বলে আমরা সেটাকে দেখতে পাচ্ছি।

প্রতিসরণ ব্যবহার করেও আমরা অনেক কাজ করে থাকি। বাতাস থেকে কাচের ভেতর যাওয়ার সময় আলোর বেঁকে যাওয়ার ধর্ম ব্যবহার করে লেন্স তৈরি করা হয়। সেই লেন্স দিয়ে চোখের চশমা থেকে শুরু করে ক্যামেরা, দুরবিন, অণুবীক্ষণ যন্ত্র এরকম নানা ধরনের ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়।

কীভাবে দেখি এবং রংয়ের ধরন

তোমরা তোমাদের বই থেকে শুরু করে টেলিভিশন, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ এরকম অনেক জায়গায় নানা ধরনের রং দেখে অভ্যস্ত। তোমাদের মনে হতে পারে এই রংগুলো তৈরি করার জন্য বুঝি সবগুলো রং ব্যবহার করতে হয়। আসলে সেটা সত্যি নয়, আমাদের চোখ মাত্র তিনটি রং দিয়ে সব রং দেখতে পারে। বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য একটা স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনে খুব সাবধানে ভিজে আঙুল ঝাঁকুনি দিয়ে খুবই সূক্ষ্ম একটা পানির বিন্দু রাখো তখন সেই পানির ফোঁটাটি কনভেক্স লেন্স হিসেবে কাজ করবে। তুমি দেখবে লাল, সবুজ এবং নীল, মাত্র এই তিনটি রং দিয়ে স্মার্টফোনের স্ক্রিনে সব রং তৈরি করা হয়।

রঙিন আলো যখন চোখে এসে পড়ে তখন আমাদের চোখের রেটিনাতে এই লাল, নীল এবং সবুজ রংয়ের সংবেদী কোষগুলো নির্দিষ্ট রংয়ের অনুভূতি তৈরি করে এবং ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের সংমিশ্রণে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রংগুলো দেখতে পাই। কোন কোন রংয়ের সংমিশ্রণে কোন কোন রং তৈরি হয়, সেটা বাম দিকের ছবিতে দেখানো হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ সমান পরিমাণ লাল, নীল এবং সবুজ রং দিয়ে সাদা রং তৈরি হয়।

ছবি: বাম দিকের ছবিতে তিন রংয়ের আলোর মিশ্রণে তৈরি করা রং, কম্পিউটারের, টেলিভিশনের কিংবা স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনে যেভাবে রং তৈরি করা হয়। ডান দিকের ছবিতে কাগজে রংতুলি দিয়ে মিশিয়ে তৈরি করা রং।

এখানে তোমাদের অন্য একটা বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া যায়, তুমি যদি একটা কাগজে রংতুলি দিয়ে লাল নীল সবুজ রং মিশাও তুমি কিন্তু বাম দিকের ছবিতে দেখানো রংগুলো পাবে না, ভিন্ন কিছু রং পাবে, সেই রংগুলোও ডান দিকের ছবিতে দেখানো হয়েছে। তোমরা যারা ছবি আঁকো তারা নিজেরাই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ হলুদ লাল এবং নীল রং দিয়ে অন্য সব রং তৈরি করে ফেলা যায়।

স্মার্ট ফোন, টেলিভিশন কিংবা কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে আমাদের চোখের মধ্যে একই সঙ্গে লাল, নীল এবং সবুজ আলোর সংমিশ্রণ এসে পড়ে এবং চোখ তার জন্য নির্দিষ্ট রংয়ের অনুভূতি তৈরি করে। কাগজে রং মেশানোর সময় একটি রংয়ের কণার ওপর অন্য একটি রংয়ের কণা চলে আসার কারণে উপরের কণাটি নিচের কণার রং শোষণ করে, এবং যে রংটি শোষিত হয় না, শুধু সেটি বের হয়ে আসে। তখন তোমার চোখে লাল, নীল আর সবুজ রংয়ের মিশ্রণ এসে পড়ে না, শোষিত না হওয়া প্রকৃত রংটিই এসে পড়ে এবং তুমি সেই রংটিই দেখো।

১। রংধনু কেন বৃত্তাকার হয়?
২। ভর দুপুরে কেন কখনো রংধনু দেখা যায় না?

বিজ্ঞান কমিক্স
রংধনু
লেখা : মুহম্মদ জাফর ইকবাল
আঁকা : নাসরীন সুলতানা মিতু
ইস, কেমন ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে! এত বৃষ্টি হলে আমরা কেমন করে বাইরে গিয়ে খেলব?
বাচ্চাগুলো বাইরে না গেলে তো পড়ায় মন দিতে পারছি না!
একটু পরে
বৃষ্টি থেমে গেছে!
কী মজা! কী মজা! বৃষ্টি থেমে গেছে!
শুধু বৃষ্টি থেমে যায় নাই, রোদও উঠে গেছে!
বাচ্চারা! তোমরা যদি এখনই বাইরে যাও তাহলে হয়ত একটা রংধনুও দেখতে পারবে!
সত্যিই তো! দেখো, আকাশে কী সুন্দর রংধনু!
শাহানাপু কেমন করে বলতে পারল যে এখন আকাশে রংধনু থাকবে?
রংধনু যেখানে নামে সেখানে নাকি গুপ্তধন পাওয়া যায়?
সত্যি?
ওই তাল গাছের নিচে রংধনুটা নেমেছে! চল যাই গুপ্তধন বের করি!
চল যাই গুপ্তধন খুঁজি!
চল যাই! চল যাই!

একটু পর

না। রংধনুর সাথে গুপ্তধনের কোন সম্পর্ক নাই। বৃষ্টি হওয়ার পর বাতাসে পানির কণা থাকে। সেই পানির কণায় যদি সূর্যের আলো পড়ে সেটা প্রতিফলিত হয়।

পানির কণার ভেতর দিয়ে যখন সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয় তখন সেটা তার সাত রংয়ে ভাগ হয়ে যায়। রোদে পানির কণা যখন শুকিয়ে যায় তখন রংধনু মিলিয়ে যায়।

তোমরা রোদে পানি ছিটিয়ে নিজেরাও রংধনু তৈরি করতে পারবে। সূর্যের বিপরীতে হবে রংধনু।

আরেকটু পর

তোমরা পানি দিয়ে ভিজে কী দুষ্টুমি করছ? দুষ্টু ছেলে মেয়ে!

অধ্যায় ১৫

পরিবেশ ও ভূমিরূপ

অধ্যায় ১৫

পরিবেশ ও ভূমিরূপ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ পরিবেশ
- ☑ পরিবেশের উপাদান
- ☑ ভূমিরূপ
- ☑ মাটি, পানি, বায়ু, জীবজগৎ ও ভূমিরূপ এর আন্তঃসম্পর্ক
- ☑ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক বৈচিত্র

পরিবেশ

পরিবেশ শব্দটি আমাদের কাছে খুব পরিচিত। কোনো স্থানের অবস্থা বোঝানোর জন্য আমরা সে স্থানের পরিবেশ কেমন তা বর্ণনা করি। সেখানে মনুষ্যসৃষ্ট কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশ দুটিই থাকতে পারে। সাধারণভাবে পরিবেশ বলতে আমাদের চারপাশে যেসব জৈব ও অজৈব উপাদান রয়েছে তার সবগুলোকে একত্রে বোঝানো হয়। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানুষ ও অন্যান্য জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। আমরা যদি কোথাও থেকে বা কাজ করে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি, তখন আমরা বলি যে সেই জায়গার পরিবেশটা ভালো। কাজেই কোনো স্থানের পরিবেশ ভালো রাখতে হলে আমাদের সবার আগে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানতে হবে।

পরিবেশের উপাদান

পরিবেশের প্রধান উপাদান হচ্ছে মাটি, পানি, বায়ু এবং জীবজগৎ। এর ভেতর প্রথম তিনটি উপাদান প্রাণহীন। এ জন্য মাটি, পানি এবং বায়ুকে পরিবেশের অজৈব (Abiotic) উপাদান বলা হয়। আর জীবিত সকল উদ্ভিদ, প্রাণী তথা সমগ্র জীবজগৎকে জৈব (Biotic) উপাদান বলে।

মাটি

পৃথিবীর উপরের স্তরে (ভূত্বকে) যে নরম অংশ রয়েছে সেটিকে আমরা মাটি বলি। এই মাটি উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে মাটি যত উর্বর, সেই মাটিতে তত ভালো ফসল জন্মে। তবে মাটি তৈরি প্রক্রিয়া কিন্তু সহজ নয়। পাথর গুঁড়ো হয়ে সৃষ্ট খনিজ পদার্থ এবং জৈব পদার্থ মিশ্রিত হয়ে মাটি গঠিত হয়। মাটির খনিজ পদার্থগুলোকে সেগুলোর আকার অনুসারে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলো বালি, পলি এবং কাদা। বালির কণাগুলো সবচেয়ে বড় বলে সেটা পানি ধরে রাখতে পারে না। আবার কাদামাটিতে কণাগুলো বেশি ছোট বলে এগুলোর

ফাঁকের ভেতর আটকে থাকা পানি উদ্ভিদ সহজে গ্রহণ করতে পারে না। এই বালি, পলি এবং কাদার বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন ধরনের মাটি দেখা যায়। যদি কোনো মাটিতে বালি, পলি এবং কাদার কোনোটিরই প্রাধান্য দেখা না যায়, তবে সেটিকে দোআঁশ মাটি বলে।

মাটিদূষণ

মানুষের তৈরি বিভিন্ন ধরনের দূষণকারী পদার্থ মাটিদূষণের প্রধান কারণ। এসব দূষণকারী রাসায়নিক পদার্থ জৈব ও অজৈব উভয় ধরনের হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা সঠিকভাবে না ফেলে যেখানে-সেখানে ফেললে, কলকারখানা থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন আবর্জনা এবং কৃষি জমিতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহৃত সার এবং কীটনাশক মাটিদূষণ করে থাকে। মাটি দূষিত হলে তা বিভিন্ন জীব এবং মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হতে পারে। মাটিদূষণ রোধ করতে হলে যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে, এছাড়া কৃষিজমিতে সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক নিয়মে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

পানি

পানির অপর নাম হচ্ছে জীবন। সমস্ত ধরনের প্রাণের বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য। পৃথিবীর মোট পানির খুব সামান্য অংশই মিঠা বা স্বাদু পানি। এই পানি পান করা এবং অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। মিঠা পানির অধিকাংশই রয়েছে বরফ আকারে আর খুব সামান্য অংশ রয়েছে নদ-নদী ও বায়ুমণ্ডলে। বায়ুতে অবস্থিত এই পানির পরিমাণকে আর্দ্রতা বলা হয়। তবে পরিমাণে সামান্য হলেও আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করা পানি বা জলীয় বাষ্প অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আবার নদ-নদী, খাল-বিল, হ্রদ ইত্যাদিতে যে পানি থাকে, তা ভূমিরূপের পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তোমরা লক্ষ করলে দেখবে বর্ষকালে বন্যার সময় মাটিতে পলির স্তর পড়ে। এই মাটি ফসল উৎপাদনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আবার অনেক এলাকায় বন্যার সময় নদীর পাড় ভেঙে অনেক ঘরবাড়ি, জমি পানিতে তলিয়ে যায়। ভূগর্ভস্থ পানি আমরা পাম্প বা টিউবয়েলের মাধ্যমে তুলে ব্যবহার করি। মাটির ফাঁকা স্থানের (Pore space) মধ্যে যে পানি থাকে, তা উদ্ভিদ গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। পরিবেশের উপাদান হিসেবে পানির গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না।

পানিদূষণ এবং তার প্রতিকার

পানি যখন বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে জীবজগতের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায়, তখন তাকে আমরা দূষিত পানি বলতে পারি। মানুষের নানান কর্মকাণ্ডের ফলে পানি দূষিত হতে পারে। যেখানে সেখানে মলমুত্র ত্যাগ করলে, জলাশয়ে বা তার কাছাকাছি আবর্জনা ফেললে, জমিতে দেওয়া সার ও কীটনাশক পানিতে ধুয়ে জলাশয়ে পড়লে, বিভিন্ন কলকারখানার আবর্জনা ও দূষিত পানি নদীতে ফেললে পানি দূষিত হয়। এমনকি এর ফলে ভূগর্ভস্থ পানিও দূষিত হতে পারে।

দূষিত পানি দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করলে অথবা পান করলে নানা ধরনের

রোগব্যাধির আক্রমণে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। এ জন্য পানিদূষণ রোধ করার জন্য যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না। বৃষ্টির আশংকা থাকলে জমিতে সার, কীটনাশক এসব দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
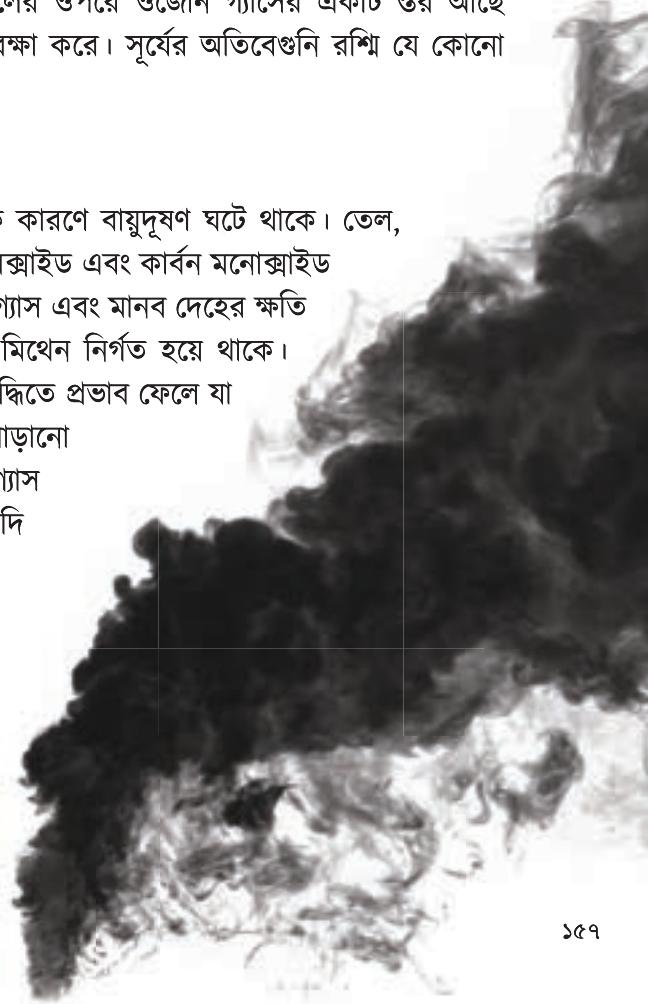
যেহেতু পৃথিবীর মোট পানির খুব সামান্য পরিমাণ হচ্ছে স্বাদু পানি, তাই পানি অপচয় করলে ভবিষ্যতে কঠিন সংকটের মুখে মানুষকে পড়তে হবে। বাগানে গাছের জন্য যতটুকু পানি দিতে হয় তার চেয়ে বেশি পানি দিলেই তা অপচয় হবে। আমরা অনেক সময় গোসল করার সময় পানির কল চালু রাখি; যার ফলে পানির প্রচুর অপচয় হয়। এসব আচরণে পরিবর্তন আনলেই পানির অপচয় রোধ করা সম্ভব।

বায়ু

পরিবেশের একটি অন্যতম উপাদান হচ্ছে বায়ু। বায়ু বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণের ফলে গঠিত হলেও শুকনো বায়ু প্রধানত নাইট্রোজেন (৭৮%) এবং অক্সিজেন (২১%) নিয়ে গঠিত। তবে আর্দ্রতার ভিন্নতার কারণে বায়ুতে ০ থেকে ৪ শতাংশ পর্যন্ত জলীয়বাষ্প থাকতে পারে। এ ছাড়াও বায়ুতে খুব কম পরিমাণে থাকে আর্গন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ওজোন, হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য গ্যাস। বায়ুতে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণ স্থান এবং সময় ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। জীবের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আমরা বায়ু থেকে পাই। আবার আমাদের নিঃশ্বাসের সময় নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে কাজে লাগে। এ ছাড়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরে ওজোন গ্যাসের একটি স্তর আছে যা পৃথিবীকে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি যে কোনো জীবের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বায়ুদূষণ

মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বায়ুদূষণ ঘটে থাকে। তেল, গ্যাস, কাঠ প্রভৃতি পোড়ানোর ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কার্বন মনোক্সাইড নির্গত হয়। কার্বন মনোক্সাইড একটি মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস এবং মানব দেহের ক্ষতি করে থাকে। বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ পচনের ফলে বায়ুতে মিথেন নির্গত হয়ে থাকে। মিথেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে যা 'গ্রীন হাউস ইফেক্ট' নামে পরিচিত। জ্বালানি ঠিকমতো পোড়ানো না হলে তা থেকে কার্বন-মনোক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়। এ ছাড়া অ্যারোসল স্প্রে, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি থেকে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি) গ্যাস নির্গত হয় যা ওজোন গ্যাসের স্তর ক্ষয় করে ফেলে। ফলে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করে। এ ছাড়াও বায়ুদূষণের প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে রয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত এবং বনের দাবানল। এই দুটি ঘটনার ফলে বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে দূষিত গ্যাস, ছাইয়ের কণা ইত্যাদি নির্গত হয়।

বায়ুদূষণ রোধ করতে হলে প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে সঠিকভাবে জ্বালানির ব্যবহার। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রচুর পরিমাণে গ্যাস, তেল, কয়লা ইত্যাদি পোড়ানো হয়। ফলে বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে দূষিত গ্যাস নির্গত হয়। বিদ্যুতের অপচয় না করে সঠিকভাবে ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমে আসবে যা বায়ুদূষণ রোধে সহায়ক হবে। সিএফসি নির্গত হয় এমন দ্রব্য তৈরি এবং ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। ময়লা-আবর্জনা খোলা স্থানে পুড়িয়ে ফেলা বন্ধ করতে হবে। এ ছাড়া মাটিতে ঘাস ও গাছের আবরণ থাকলে বায়ুতে ধুলাবালির পরিমাণ কমে আসবে।

জীবজগৎ

পৃথিবীর পরিবেশ প্রাণ ধারণের জন্য উপযুক্ত হওয়ায় এখানে নানা ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিকাশ ঘটেছে। প্রায় সাড়ে ৩০০ কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। সমুদ্রের গভীরতম এলাকা থেকে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম স্থান, গভীর বন থেকে সুউচ্চ পর্বতের চূড়া পর্যন্ত জীবজগৎ বিস্তৃত। আকারের দিক থেকে দেখলে এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বিশাল আকারের নীল তিমি পর্যন্ত জীবজগতের অন্তর্গত। বায়ুতে নানান আণুবীক্ষণিক জীব রয়েছে। মাটিতে রয়েছে উদ্ভিদ, নানান পোকামাকড়, কেঁচো এবং আরও অনেক প্রাণী। পানিতে রয়েছে নানান জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের বড় উৎস হলো সমুদ্রের খুদে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও শৈবাল। পৃথিবীর বিভিন্ন জীব বেঁচে থাকার জন্য পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণীর নানান কর্মকাণ্ডের ফলে ভূমিরূপের পরিবর্তন হতে থাকে। উদ্ভিদ কোনো স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ু কে প্রভাবিত করতে পারে। যে সব স্থানে গাছপালা বেশি, সেখানে আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা এবং বৃষ্টিপাত বেশি হয়ে থাকে।

ভূমিরূপ

ভূমিরূপ বলতে কোনো স্থানের গঠনগত আকৃতি বোঝানো হয়। অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী অবস্থিত বিভিন্ন ভূমির উচ্চতা, আকৃতি, ঢাল, বন্ধুরতা, অবয়ব ইত্যাদিকে ভূমিরূপ বলা হয়। ভূমিরূপ গঠনে নানান প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হলো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, সূর্যরশ্মির প্রভাব, নদনদী, সমুদ্রস্রোত, বায়ুপ্রবাহ, হিমবাহ ইত্যাদি। ভূমি রূপকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি।

যে সকল অঞ্চলে তীব্র ঠান্ডা অর্থাৎ সারা বছরই প্রায় বরফ পড়ে যেসব অঞ্চলে বরফের প্রবাহের মাধ্যমে ভূমিরূপ সৃষ্টি ও পরিবর্তিত হয়। একে হিমবাহ বলে। একে নদীর পানি প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবে নদীর পানির চেয়ে অনেক আস্তে হিমবাহের বরফ প্রবাহিত হয়।

উষ্ণ ও শুষ্ক অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহের ফলে ভূমিরূপ পরিবর্তন হয়। যেমন মরুভূমিতে বায়ুপ্রবাহের ফলে নানান আকার ও আকৃতির বালিয়াড়ি দেখা যায়। বায়ুপ্রবাহের ফলে কোনো স্থান থেকে ধুলা ও বালি অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হলে আগের স্থান নিচু হয়ে যেতে পারে। আবার যেখানে সেই বায়ুপ্রবাহের ফলে

স্থানান্তরিত বালু জমা হয় সেখানে বালিয়াড়ির মতো ভূমিরূপ দেখা যায়।

তবে বাংলাদেশের মতো নদীপ্রধান দেশে প্রধানত নদীর পানির প্রবাহের ফলে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায়। এসব দেশে বন্যার সময় নদীর পানির সঙ্গে বয়ে আসা পলিমাটি জমা হয়ে উর্বর সমতল ভূমি তৈরি হয়ে থাকে। যখন নদী ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়ে, তখন সেখানে নদীর পানিতে বয়ে আসা নানান আকারের মাটির কণা (বালু, কাদা ইত্যাদি) জমা হয়ে চর এবং দ্বীপের সৃষ্টি হয়।

মাটি, পানি, বায়ু, জীবজগৎ ও ভূমিরূপের আন্তঃসম্পর্ক

মাটি, পানি, বায়ু এবং জীবজগৎ এগুলো প্রত্যেকটি একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পর্কিত। পরিবেশের এই চারটি উপাদানই পৃথিবীর ভূমিরূপ সৃষ্টি ও পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেকোনো স্থানের ভূমিরূপ তৈরি তিনটি প্রধান প্রক্রিয়া কাজ করে।

১. ক্ষয় কার্য (Erosion),
২. স্থানান্তর (Transportation),
৩. অবক্ষেপণ (Deposition)।

ভূমিরূপ গঠনে মাধ্যম হিসেবে পানি এবং বায়ু কাজ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তরল পানি এবং বরফ উভয়ই ভূমিরূপ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। যেকোনো স্থানের পাথর, মাটি, বালু প্রভৃতি পানি, বায়ু বা বরফের দ্বারা ক্ষয় হলে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। আবার যখন এসব ক্ষয় হওয়া পাথর ও মাটি যখন অন্য কোথাও জমা হয় তখন সেখানেও নানা ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। আমরা আগে দেখেছি যে পাথর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পরিণত হয়। যে সকল পাথর কঠিন, সেগুলো সহজে ক্ষয় হয় না। আবার যেসব পাথর তুলনামূলকভাবে নরম, সেসব এলাকায় ক্ষয়জনিত ভূমিরূপ বেশি দেখা যায়। বন্যার সময় অনেক নদীতে পাড় ভাঙে এবং নদীর পাড় খাড়া হয়ে থাকে। এটি ক্ষয়জনিত কারণে সৃষ্ট ভূমিরূপ। আবার শীতকালে বা শুকনো মৌসুমে নদীতে চর পড়তে দেখা যায়। এগুলো অবক্ষেপণজনিত কারণে সৃষ্ট ভূমিরূপ। বিভিন্ন প্রাণী মাটিতে গর্ত করে বসবাস করে। এসব গর্ত মাটির ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে। অপরদিকে মাটির উপরে উদ্ভিদের আবরণ সেই স্থানের মাটির ক্ষয় হওয়া রোধ করে।

বাংলাদেশের ভূমিরূপ

বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এ দেশের ওপর দিয়ে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার মতো বড় নদী ছাড়াও আরও শত শত ছোট নদী প্রবাহিত হয়েছে। বন্যার সময় এসব নদীর বাহিত পলি বাংলাদেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এলাকায় সঞ্চিত হয়ে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি সৃষ্টি হয়েছে, এই সমতলভূমির গড় উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে ১০ মিটারের কম। সমুদ্র সমতল থেকে খুব বেশি উঁচু না হওয়ায় প্রতি বছর প্রবল মৌসুমি বর্ষণের ফলে দেশের অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। । আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: (ক) পার্বত্য অঞ্চল খ) সোপান অঞ্চল এবং (গ) প্লাবন সমভূমি।

(ক) পার্বত্য অঞ্চল: রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্রগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পাহাড়ি এলাকাগুলো নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা প্রায় ৬০০ মিটার। প্রায় ২.৫ কোটি বছর আগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এসব পর্বতের সৃষ্টি হয়েছিল।

(খ) সোপান অঞ্চল: অনুমান করা হয় প্রায় ২৫ লক্ষ বছর আগে আন্তঃবরফগলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে এসব চত্বরভূমি সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলোকে বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড় এই তিনটি এলাকায় ভাগ করা হয়। সমুদ্র সমতল থেকে এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা ১৫ মিটার।

(গ) প্লাবন সমভূমিঃ পার্বত্য এবং সোপান অঞ্চল ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ৮০% ভূমি নদীবিধৌত এবং বিস্তীর্ণ সমভূমি নিয়ে গঠিত। এই ভূমিসমূহ গত ২০ লক্ষ বছরে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে। বছরের পর বছর বন্যার সঙ্গে পরিবাহিত মাটি সঞ্চিত হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। এখানে মাটির স্তর খুবই গভীর এবং খুবই উর্বর।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক বৈচিত্র

কোনো স্থানের বৈশিষ্ট্য সেখানকার বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক উপাদান যেমন—ভূসংস্থান, জলবায়ু নদী-নালা, বন, পাহাড়-পর্বত, জীববৈচিত্র ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি হয়। প্রকৃতি এবং তার মাঝে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণী কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করে। কোনো একটি স্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা ওই এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। যেমন—সিলেটের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের পাহাড় ও টিলা, এবং সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সুন্দরবনে বিভিন্ন উদ্ভিদের শ্বাসমূল থাকে এবং প্রতিদিন দুইবার করে জোয়ারের পানিতে গাছের শ্বাসমূলগুলো নিমজ্জিত হয়। বরেন্দ্রভূমির মাটিগুলো লাল রংয়ের হয়ে থাকে। এসবই সেসব এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ সেই স্থানের ভূসংস্থান এবং জলবায়ুর উপর নির্ভর করে।

বাংলাদেশের মোট ক্ষেত্রফল প্রায় ১,৪৮,৪৬০ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কমতি নেই। নদীবিধৌত বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচাইতে বড় ব-দ্বীপ এবং তা নানান রকম প্রাকৃতিক বৈচিত্র ভরপুর। ভূসংস্থান বা ভূমিরূপের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। এসব অঞ্চলের পরিবেশের উপাদান, উদ্ভিদ, প্রাণী সবকিছুই বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এসব অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর, সিলেট ময়মনসিংহ এলাকার হাওর ও জলাভূমি। স্থলভূমির বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পদ্মা মেঘনা যমুনা বিধৌত প্লাবনভূমি, বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়ের সোপান ভূমি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার পাহাড়সমূহ, সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন, প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন ইত্যাদি। এইসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকার কয়েকটা নিচে আলোচনা করা হলো।

সুন্দরবন

যেসব বৃক্ষ এবং গুল্ম উপকূলীয় জোয়ার-ভাটাপ্রবণ এলাকায় পাওয়া যায়, সেগুলোর সমষ্টি হচ্ছে ম্যানগ্রোভ বন। ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি। প্রায় ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ষাট ভাগই রয়েছে বাংলাদেশে, বাকি অংশ রয়েছে ভারতে। সুন্দরবনকে জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী, কাদা চর এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির লবণাক্ততাসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই বনে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গাছের প্রজাতি হলো সুন্দরী এবং গেওয়া। অসংখ্য পাখি, মাছ, স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ এবং উভচর প্রজাতি সহ প্রায় ৫০০ বন্যপ্রাণীর বাসস্থান হচ্ছে সুন্দরবন। শুধু মাছ এবং গাছ নয়, প্রতিবছর সুন্দরবন থেকে মৌয়ালরা প্রচুর পরিমাণ মধু সংগ্রহ করে।

নদী

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য ছোট-বড় নদ-নদী বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং পরে দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এসব নদীবাহিত পলি, বালু ইত্যাদি জমা হয়ে বঙ্গোপসাগরে অনেক দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এসবই বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অংশ। প্রধান নদ-নদী ছাড়াও নদীগুলোকে সেগুলোর গঠন অনুযায়ী শাখানদী কিংবা উপনদী নামে অভিহিত করা যায়।

যেমন, যেসব নদী অন্য কোনো নদী থেকে উৎপন্ন হয় তাকে শাখানদী বলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ধলেশ্বরী যমুনার প্রধান শাখানদী। এ ছাড়া মধুমতী, মাথাভাঙ্গা, কপোতাক্ষ নদ, পশুর নদ, বেতনা নদী ইত্যাদি পদ্মার শাখানদী।

আবার যেসব নদী কোনো একটি উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে কিছু দূরত্ব অতিক্রম করে অপর একটি নদীতে পতিত হয় বা সংযুক্ত হয় তাকে সেই নদীর উপনদী বলে। বাংলাদেশে তিস্তা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই, সুবর্ণশ্রী ইত্যাদি নদী উৎসস্থল থেকে প্রবাহিত হয়ে যমুনা নদীতে গিয়ে মিশেছে; তাই এরা যমুনা নদীর উপনদী।

এদেশে শাখা-প্রশাখাসহ প্রায় ২৩০টি নদ-নদী সারা বছর বিপুল জলরাশি নিয়ে ২৪,১৪০ কিলোমিটার জায়গা দখল করে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাই শত শত নদীর মাধ্যমে বয়ে আসা পলিমাটি জমে তৈরি হয়েছে। এই নদ-নদীগুলো বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, অসংখ্য মানুষ নদী তীরে বসবাস করে, কৃষিতে সেচে নদীর পানি ব্যবহৃত হয়, জেলেরা মাছ ধরে জীবনযাপন করে। আমাদের দেশের মানুষের যোগাযোগের জন্য নিয়মিতভাবে নৌকা, লঞ্চ এবং জাহাজে যাতায়াত করে। তোমরা শুনে খুশি হবে দেশের জন্য অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে নদীকে এই দেশে জীবন্ত মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

সমুদ্র

বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্র বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগর একটি উপসাগর কারণ, এর তিন দিক ভূমি দ্বারা বেষ্টিত। বাংলাদেশের জলবায়ুর ওপর বঙ্গোপসাগরের প্রভাব অপরিসীম। আমরা বৃষ্টির সময় আকাশ থেকে যে পানি ঝরতে দেখি, সেই পানির উৎস হচ্ছে কোনো সাগর বা মহাসাগর। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয়বাষ্পপূর্ণ মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সে সময় বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়।

জোয়ার এবং ভাটার মধ্যবর্তী পানির উচ্চতার তারতম্যের জন্য সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের নদীগুলোতে জোয়ারের সময় বড় নৌযান প্রবেশ করতে পারে। খুলনার মোংলা বন্দরে যেসব জাহাজ আসে তা মূলত বঙ্গোপসাগর থেকে জোয়ারের সময় নদীতে প্রবেশ করে থাকে। সমুদ্র উপকূলের বিপুলসংখ্যক জেলে সমুদ্রে মাছ ধরেন যেগুলো আমাদের দেশের মাছের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। সমুদ্রের নিচে গ্যাস এবং তেলের বিশাল সঞ্চয় আছে বলে অনুমান করা হয় এবং সমুদ্রতীরের শহরগুলো এই দেশের মানুষের পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে।

হাওর

মৌসুমি বায়ুর আগমনের সময়ে বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশের প্লাবন ভূমির একটি বিশাল অংশ চার থেকে ছয় মাসের জন্য পানির নিচে তলিয়ে যায়। এরূপ জলাভূমির মধ্যে রয়েছে হাওর, বাঁওড়, বিল ইত্যাদি।

হাওর হচ্ছে পিরিচ আকৃতির ভূ-গাঠনিক অবনমন অর্থাৎ নিচু এলাকা। বর্ষাকালে হাওরগুলোতে প্রচুর পানি থাকে, তবে শীতকালে পানির পরিমাণ অনেক সংকুচিত হয়ে যায়। বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে হাওর দেখতে পাওয়া যায়। এ হাওরগুলো মূলত নদী এবং খালের মাধ্যমে পানির প্রবাহ পেয়ে থাকে। শীতকালে হাওরগুলো বিশাল, দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরের রূপ নেয়, আবার বর্ষাকালে কূল-কিনারাবিহীন সমুদ্রের মতো রূপ ধারণ করে। বর্ষাকালে ৬ মিটার পর্যন্ত গভীর বন্যার পানিতে তলিয়ে থাকে এই অঞ্চল। শুষ্ক মৌসুমে অধিকাংশ পানি সরে যায়। তখন দুই একটি বিলের অগভীর পানিতে প্রচুর পরিমাণে বৈচিত্র্যময় জলজ উদ্ভিদ গজিয়ে ওঠে। চর জেগে সেখানে হোগলা, নলখাগড়ার ঝোপ গজিয়ে ওঠে। এর ফলে একদিকে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর খাদ্য ও আশ্রয়ের আদর্শ স্থান হয়ে ওঠেছে হাওর অঞ্চলগুলি, অন্যদিকে পরিণত হয়েছে পরিযায়ী পাখিদের আকর্ষণীয় আবাসস্থলে ।

প্রবাল দ্বীপ

বাংলাদেশের একেবারে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন একটি প্রবাল দ্বীপ। প্রবাল বা কোরাল (Coral) হচ্ছে এক ধরনের সামুদ্রিক কীট, যার মৃতদেহ জমা হয়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। এসব সামুদ্রিক কোরালের মৃতদেহ জমা হয়ে প্রবালদ্বীপ গঠিত হয়। সেন্ট মার্টিন দ্বীপের চারপাশে সমুদ্রের পানিতে নানা প্রজাতির মাছ, জেলিফিশ এবং কচ্ছপ দেখা যায়।

অনুশীলনী ?

১। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তা তো জেনেছ, তোমার এলাকা কোন ভাগে পড়ে?

২। তোমার এলাকায় সবচেয়ে পরিচিত বন্য প্রাণী কারা? পরিবেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা এই এলাকা বেছে নিয়েছে?

অধ্যায় ১৬

জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং টেকসই পরিবেশ

অধ্যায় ১৬
জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং টেকসই পরিবেশ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে—

- ☑ পরিবেশের প্রাণী ও উদ্ভিদ ও অণুজীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা
- ☑ মানুষের জীবনে অণুজীবের ব্যবহার ও উপযোগিতা
- ☑ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জীবজগতের সংকট
- ☑ বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর এর প্রভাব

সাদাচোখে আমরা যেমন জীব আর জড়কে আলাদা করে দেখি, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় বিষয়টা অত সরল নয়। আমরা যাদের জীব বলি, যারা চলতে ফিরতে পারে, খাবার গ্রহণ করে, তাদের গঠন খেয়াল করলেও দেখবে—বিভিন্ন অজৈব অণু অর্থাৎ জড় উপাদান দিয়েই তারা তৈরি! আবার জীবের সংজ্ঞাও সব সময় অত স্পষ্ট নয়। যেমন—ভাইরাসের দিকে যদি তাকাও, ভাইরাসকে জীব বা জড়ের কাতারে ফেলা খুব মুশকিল, কারণ পোষক দেহে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত ভাইরাসের আচরণ যা দেখা যায় তাতে তাকে জড় বলাই বেশি সংগত। ঠিক কীভাবে অসংখ্য জড় উপাদান একত্র হয়ে জীবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তা নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই, বিজ্ঞানীরা তাই দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে গবেষণা করছেন। তোমরা উপরের শ্রেণিতে এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও অনেক বিস্তারিত জানতে পারবে!

জীবজগৎ এবং জড় উপাদানের সম্পর্কটি একটি চক্রের মতো। যখন নতুন জীব জন্ম নেয়, তখন সেই জীবের শরীরে পরিবেশের বিভিন্ন উৎস থেকে জৈব এবং অজৈব উপাদান সঞ্চিত হয়। এই জীবটি যখন মারা যায়, তখন আবার সেই জৈব এবং অজৈব উপাদানগুলো পরিবেশে ফিরে যায়। পরবর্তীতে আবার কোনো জীবের ভেতর সঞ্চয়ের আগ পর্যন্ত তারা পরিবেশে জৈব এবং জড় উপাদান হিসেবে বিরাজ করতে থাকে।

কোনো একটি অঞ্চলের জীবজগৎ এবং সেই পরিবেশের সকল জড় উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে যে সিস্টেম গড়ে ওঠে, তাকে বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম বলা হয়।

ইকোসিস্টেম সাধারণত একটি অঞ্চলভিত্তিক হয়। ওপরের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি প্রত্যেক ইকোসিস্টেমের দুই ধরনের উপাদান রয়েছে—জীবজ উপাদান এবং জড় উপাদান।

জীবজ উপাদানের ভেতরে রয়েছে বিভিন্ন অণুজীব, উদ্ভিদ এবং প্রাণী। আর জড় উপাদানের মধ্যে রয়েছে তাপমাত্রা, আলো, পানি, অক্সিজেন, মাটি ইত্যাদি।

জীব জগতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

এই জীবজগতের অণুজীব, উদ্ভিদ এবং প্রাণী সবাই একে অপরের ওপর নির্ভর করে। অণুজীব সম্বন্ধে প্রথমেই আমাদের মনে হতে পারে তারা বুঝি আমাদের নানান রোগ-ব্যাধি তৈরি করে কেবল আমাদের ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু অনেক অণুজীব রয়েছে যারা আমাদের উপকার করে। যেমন—দইয়ের সঙ্গে আমরা যেসব ব্যাকটেরিয়া খাই তারা আমাদের শরীরের জন্য উপকারী। আমাদের জীবন রক্ষাকারী ওষুধ অ্যান্টিবায়োটিকের উৎস হচ্ছে কিছু ছত্রাক (Fungi)। ভাইরাস ব্যবহার করে আমরা প্রাণঘাতী নানান অসুখের বিরুদ্ধে টিকা তৈরি করি। যেমন—পোলিও অসুখটির কথা হয়তো তোমরা শুনে থাকবে। এই অসুখ হলে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে আমরা পঙ্গুত্ব বরণ করি। এই রোগের বিরুদ্ধে টিকা তৈরি করা হয় ভাইরাস ব্যবহার করে।

অণুজীব উদ্ভিদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া রয়েছে যারা উদ্ভিদকে পরিবেশ থেকে

নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে সহায়তা করে। বিজ্ঞানীরা পাটের পাতা এবং কাণ্ডেও বিভিন্ন ধরনের অণুজীব পেয়েছেন যারা পাটের বৃদ্ধি ও টিকে থাকার জন্য সহযোগিতা করে।

উদ্ভিদের ওপর সমগ্র জীবজগৎ নির্ভর করে। কারণ, আমরা জানি যে, সব সবুজ উদ্ভিদই নিজেরা সূর্যের আলো ব্যবহার করে শর্করা উৎপাদন করে। এই শর্করায় জমা হওয়া শক্তি পরবর্তী সময়ে অন্যান্য জৈব অণুতে প্রবাহিত হয়। এভাবে সূর্য থেকে আসা আলোকশক্তি বিভিন্ন রূপে অন্যান্য জীবে ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের কাছ থেকেই পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে অণুজীব। এ ছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদেরকে পচন করিয়ে প্রকৃতিতে বিভিন্ন উপাদান ফিরিয়ে দেয় এই অণুজীবেরা।

প্রকৃতিতে উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের মধ্যকার পুষ্টির এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে খাদ্যচক্র (Food cycle) বলে। এই চক্রের মূল বিষয় হচ্ছে—প্রকৃতিতে এক জীব আরেক জীবের খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে। পৃথিবীর খাদ্যচক্রে মানুষের অবস্থান একেবারে উপরের দিকে এবং তাদের খাদ্যভ্যাস ও এই সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিবেশের অন্যান্য জীবের ওপর বড় রকমের প্রভাব ফেলে।

ছবি: প্রকৃতিতে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক চক্রাকারে চলতে থাকে।

পৃথিবীর ইকোসিস্টেমে মানুষের ভূমিকা

পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যেহেতু খাদ্যচক্রের সর্বোচ্চ স্তরের খাদক ও প্রভাব বিস্তারকারী, তাই তার আচরণের প্রভাব জীবজগতের সকলের ওপর পড়ে। বাস্তুতন্ত্রের কেবল জীব উপাদানই নয় বরং জড় উপাদানের ওপরও মানুষের প্রভাব রয়েছে। মানুষ এখন আগুন, পানি, বাতাসসহ পরিবেশ ও আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানে প্রভাব ফেলছে। তারা কৃষির শিল্পায়ন করছে এবং পরিবহণের জন্য নানান যানবাহন, রাস্তাঘাট, সৌর প্যানেল ইত্যাদি তৈরি করছে। এর ফলে পরিবেশের ওপর দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বড় কৃষি খামার তৈরির জন্য যখন আমরা ছোট বড় পাহাড়, জলাভূমি ইত্যাদি একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করি তখন আমরা সেই স্থানের বাস্তুতন্ত্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করে ফেলি। কখনও কখনও, আমরা এমনকি একটি বাস্তুতন্ত্রকে মূল ভিত্তি থেকে সরিয়ে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাই।

যখন কোনো বনের গাছ কাটা হয়, তখন বনভূমির বাস্তুতন্ত্র পরিবর্তিত হয়। কারণ, বনের ওপর নির্ভরশীল প্রজাতিগুলোকে বেঁচে থাকার জন্য নতুন করে চেষ্টা করতে হয় এবং স্থানীয় আর্দ্রতা এবং জলবায়ু উভয়ই পরিবর্তিত হয়। আবার, একটি বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর গতিপথ এবং পানির বণ্টনও পরিবর্তিত হয় এবং নদীর গতিপথ বরাবর বসবাসকারী প্রজাতিগুলো প্রভাবিত হয়।

এভাবেই মানুষের নানান কর্মকাণ্ড আমাদের পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলছে, কাজেই এই মুহূর্তে মানুষের একটি বড় দায়িত্ব এই পরিবেশ সংরক্ষণ করা।

পরিবেশ দুইভাবে সংরক্ষণ করা হয়। একটি উপায় হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করা, যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যবহারের জন্য সেসব সম্পদের ঘাটতি না হয়। যেমন—এখন কোনো কৃষক তার জমি চাষ করে ফসল ফলাচ্ছেন। এর ফলে জমির উর্বরতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। যদি তিনি এমনভাবে কৃষিকাজ করেন যেন জমির উর্বরতা আবার আগের মতো হয়ে যায় এবং পরবর্তী বংশধরেরা ভবিষ্যতে চাষবাস করে তাঁরই মতো ফসল ফলাতে পারে, তাহলে জমির মাটি বা পরিবেশ সংরক্ষণ হচ্ছে বলা যায়।

আবার বিশেষ ক্ষেত্রে যখন কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ বিলুপ্তির পথে যায় তখন সেগুলো আরও গুরুত্ব দিয়ে রক্ষা করতে হয়। এক্ষেত্রে কোনো জীব বা প্রাকৃতিক সম্পদ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই সংরক্ষণ করা হয় এবং তা ব্যবহার থেকে মানুষকে বিরত রাখা হয়। অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে যেগুলো মানুষের খাদ্য এবং ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগে। যদি তাদের সংখ্যা বেশি পরিমাণে কমে যায় তখন তাদেরকে এইভাবে রক্ষা করতে হয়। সেক্ষেত্রে সেসব উদ্ভিদ, প্রাণী বা প্রাকৃতিক সম্পদ কেউ ব্যবহার করতে পারবে না এবং সেটি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই সংরক্ষণ করতে হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

অবাঞ্ছিত বা অব্যবহারযোগ্য বস্তুগুলোকে বর্জ্য বলা হয়। কোনো বস্তু যখন আর ব্যবহারের উপযোগী থাকে না, স্থান দখল করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে তখন সেই সব বস্তু বর্জ্য হিসেবে গণ্য হয়। যেমন আমরা বাসায় যে কাচ, সিরামিক বা মেলামাইনের থালা, বাটি, গ্লাস ব্যবহার করি সেগুলো যদি ভেঙে যায় তাহলে বর্জ্য বা আবর্জনায় পরিণত হয়। এগুলো হচ্ছে কঠিন বর্জ্য। বাসার ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তাহলে সেগুলো ইলেকট্রনিক বা ই-বর্জ্যে পরিণত হয়।
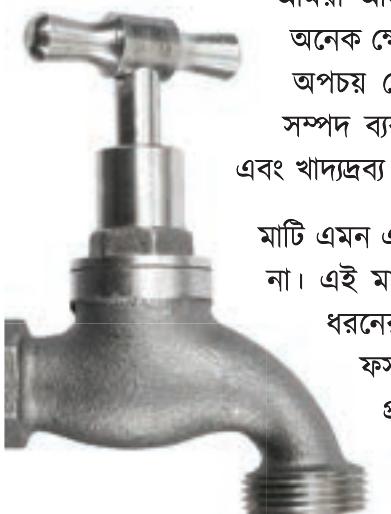
ছবি: আবর্জনা ফেলার সময় পচনশীল, অপচনশীল, ঝুঁকিপূর্ণ, ই-বর্জ্য ইত্যাদি ধরণ অনুযায়ী আলাদা করে ফেললে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। এই কারণে হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট ধরনের আবর্জনা ফেলার জন্য আলাদা আলাদা রংয়ের ডাস্টবিন রাখা থাকে

রান্নার জন্য তরিতরকারি কাটার পর ব্যবহার অযোগ্য যে সকল অংশ ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলোও বর্জ্য। তবে সেগুলো পচনশীল এবং তা পচিয়ে জৈব সার উৎপন্ন করা যায়। আবার হসপিটালে ব্যবহৃত গজ, ব্যান্ডেজ, অস্ত্রোপচারের পর ফেলে দেওয়া দেহের বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর জৈব বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এগুলিকে মেডিকেল বর্জ্য বলা হয় এবং এগুলি সবচেয়ে ক্ষতিকর বর্জ্যের মধ্যে অন্যতম। আমরা চকলেট, বিস্কুট, বা চিপস খাওয়ার পর যে প্যাকেট ফেলে দিই তা অপচনশীল বর্জ্য এবং পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এজন্য এগুলো যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নয়।

বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী সেগুলোর ব্যবস্থা করার পদ্ধতি হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। যেমন—পচনশীল বর্জ্যগুলো পচিয়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যেতে পারে যা কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। কাচ বা ধাতব বর্জ্য গলিয়ে বা প্রক্রিয়াজাত করে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য নতুন দ্রব্য তৈরি করা যেতে পারে। এমন কিছু বর্জ্য আছে যেগুলো মানুষ জীবের জন্য এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। সেক্ষেত্রে সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয় অথবা মাটির নিচে এমনভাবে চাপা দিয়ে রাখা হয় যেন কারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। তবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রথমেই যেটা মেনে চলতে হয়, তা হচ্ছে যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।

সম্পদের অপচয় রোধ এবং টেকসই ব্যবহার

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য যেসব সম্পদ ব্যবহার করি, তা অনেক ক্ষেত্রেই সীমিত। তাই দীর্ঘদিন সম্পদকে ব্যবহারযোগ্য রাখতে হলে সম্পদের অপচয় রোধ করতে হবে এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। আমরা যেসব সম্পদ ব্যবহার করি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাটি, পানি, বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি এবং খাদ্যদ্রব্য।

মাটি এমন একটি সম্পদ যা না হলে আমরা আমাদের কৃষিজ উৎপাদন করতে পারতাম না। এই মাটিও কিন্তু সীমিত সম্পদ। কোনো জমিতে একটানা কয়েক বছর একই ধরনের ফসল চাষ করলে সেই জমির উর্বরতা কমে যায়। কারণ, একেক ধরনের ফসলের জন্য মাটির একেক ধরনের খনিজ উপাদান বেশি দরকার হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে খনিজ উপাদান মাটিতে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লাগে। একটানা একই ধরনের ফসল চাষ করলে মাটির উর্বরতা পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসার সময় পায় না। ফলে ফসল উৎপাদনও কমে যায়। এমনকি অব্যবহৃত জমির ওপরে ঘাস বা অন্য গাছপালার আবরণ না থাকলে উপরের স্তরের উর্বর মাটি (Top Soil) ক্ষয় হয়ে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়।

বিভিন্ন জীবের শরীরের একটি বড় অংশই হচ্ছে পানি। পানি না থাকলে উদ্ভিদ প্রাণী কোনো কিছুই বেঁচে থাকতে পারবে না। পৃথিবীর বিপুল জলরাশির মধ্যে খুব সামান্য অংশ আমরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার কারণে প্রচুর পানি অপচয় হয় এবং এর ফলাফলস্বরূপ দরকারের সময় আমরা পানি থেকে বঞ্চিত হতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন

ছবি: নবায়নযোগ্য শক্তির বড় উৎস সৌরশক্তি যা কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বিদ্যুতের চাহিদা অনেকাংশে মেটানো সম্ভব

কাজে যতটুকু পানি দরকার, ঠিক ততটুকুই আমাদের ব্যবহার করা উচিত। গোসল করা, গাড়ি ধোয়া, বাগান বা জমিতে পানি দেওয়া, বাথরুম ব্যবহারের সময় সঠিক মাত্রায় পানি ব্যবহার করা উচিত।

বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার করে আমরা শক্তি উৎপাদন করি। জীবাশ্ম জ্বালানির মধ্যে রয়েছে কাঠ, কয়লা, জ্বালানি তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। এসব জ্বালানি একবার ব্যাবহার হয়ে গেলে পুনরায় ব্যবহার করার উপায় থাকে না। এজন্য এগুলোকে অনবায়নযোগ্য জ্বালানি বলা হয়। এজন্য এসব জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয় পরিহার করা উচিত। তবে বায়ু শক্তি, সৌর শক্তি ইত্যাদি বারবার ব্যবহার উপযোগী এবং এগুলোকে নবায়নযোগ্য শক্তি বলা হয়। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারলে বিভিন্ন জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করা সম্ভব।

যেকোনো জীবের বেঁচে থাকার জন্য পানির সঙ্গে খাদ্যও দরকার। পৃথিবীর অনেক স্থানেই মানুষ দৈনিক তিনবেলা খাদ্য জোগাড় করতে পারে না। খাদ্য উৎপাদন করতে জ্বালানিসহ অন্যান্য সম্পদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফসল ফলাতে মাটির উর্বরতা ব্যবহৃত হয়, জমিতে সেচ কাজে এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে জীবাশ্ম জ্বালানি কিংবা বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ফসল বা অন্য খাদ্যদ্রব্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিতে যে পরিবহণ ব্যবহৃত হয় তাতে অনেক ক্ষেত্রেই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হয়। তাই খাদ্যদ্রব্য অপচয় করা মানে অন্যান্য সম্পদেরও অপচয় করা। আমরা যদি সকল প্রকার সম্পদের অপচয় রোধ করতে পারি তবেই একটি সুখি, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবো।

ছবি: নবায়নযোগ্য শক্তির আরেকটি উৎস বায়ুশক্তি। পৃথিবীর অনেক দেশে বায়ুকলের সাহায্যে বায়ুশক্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়

বাংলাদেশের জলবায়ু সংকট ও আমাদের করণীয়

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আমাদের বাংলাদেশেও পড়েছে। আমাদের দাদা-দাদি কিংবা নানা-নানিদের সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারব, ষড়ঋতুর দেশ হিসেবে তারা আগে ছয়টি ঋতুর পার্থক্য বুঝতে পারতেন। দেশের কৃষিকাজের জন্য কৃষকরা এই জলবায়ু এবং ঋতুর পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করতেন। কিন্তু এখন ঋতু পরিবর্তনের সেই নিয়মে খানিকটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন—বাংলা ক্যালেন্ডারের আষাঢ়, শ্রাবণ এই দুই মাসকে বর্ষাকাল হিসেবে বলা হলেও এখন আশ্বিন মাসেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, যা অসময়ের বন্যা ডেকে আনে। আবার আগে শীতকালে যতটা শীত অনুভূত হতো, এখন তেমনটা দেখা যায় না। আবহাওয়া ও জলবায়ুর এই পরিবর্তনের ফলে দেশে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদির প্রকোপ বেড়েছে।

বাংলাদেশে 'সিডর' নামে একটি বড় সাইক্লোন আঘাত হেনেছিল ২০০৭ সালের ১১ নভেম্বর। সেই সময়ে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি স্থলভাগের কৃষি জমি, মানুষের বাসস্থানকে প্লাবিত করেছিল। তারপর থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ফসলি জমি, পুকুর, বাসস্থান ইত্যাদি লবণাক্ততার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি উৎপাদন কমে গেছে। বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন, এই প্রবণতা আরও বাড়তে থাকবে। স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অনেক অঞ্চল পানির নিচে চলে যেতে পারে। এমনকি আমাদের সুন্দরবনের একটি অংশও স্থায়ী প্লাবনের শিকার হয়ে এখানকার জীবজগতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

দক্ষিণাঞ্চলে যেমন আমরা লবণাক্ততার সম্মুখীন হচ্ছি, অপর দিকে আমাদের উত্তরাঞ্চলে অনাবৃষ্টির কারণে খরার প্রকোপ বাড়ছে। ফলে এখানেও কৃষি উৎপাদন কমবে এবং জীববৈচিত্র্যে পরিবর্তন আসবে। আমাদের বাংলাদেশের অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি এর মাঝে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ছবি: সুমাত্রা গণ্ডার, একসময় বাংলাদেশে দেখা যেত। গোটা পৃথিবীতেই এরা এখন বিপন্ন।

ছবি: নীলগাই যা একসময় দিনাজপুর-পঞ্চগড় এলাকায় বিচরণ করত

ছবি: ডোরাকাটা হায়না, একসময় রাজশাহী অঞ্চলে দেখা যেত

স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রাজশাহী অঞ্চলে ডোরাকাটা হায়েনা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে ধূসর নেকড়ে, দিনাজপুর-পঞ্চগড় এলাকায় নীলগাই, চট্টগ্রাম ও সিলেটে বান্টিং বা বনগরু বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একসময় বনমহিষ দেশের সব বনাঞ্চলেই দেখা যেত। এ ছাড়া তিন ধরনের গন্ডার ছিল বাংলাদেশে—সুমাত্রা গন্ডার, জাভা গন্ডার ও ভারতীয় গন্ডার। বাদা বা জলার হরিণকে স্থানীয়ভাবে বলা হতো বারো শিঙা হরিণ যা সিলেট ও হাওর এলাকায় দেখা যেত। কৃষ্ণষাঁড় নামে একটি প্রাণী পাওয়া যেত রাজশাহী ও দিনাজপুর এলাকায়। এদের সবই এখন বিলুপ্ত।

বাংলাদেশকে বলা হয় পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাওয়া দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একটি দেশ।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি একটি বৈশ্বিক সংকট। পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলোর শিল্প-প্রযুক্তিগত কারণে এই জলবায়ু পরিবর্তন ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। কিন্তু আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকেই ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পরিবেশ সংক্ষণের ব্যাপারে কাজ করতে হবে। একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নিজেদের আচরণের দিক খেয়াল রাখা। অপ্রয়োজেন পৃথিবীর সম্পদের অপচয় না করে আমরা অবদান রাখতে পারি। পলিথিন ও প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার কমাতে পারি। আমরা ব্যক্তিগতভাবে পানির অপচয় কমাতে পারি, গ্যাসের অপচয় রোধ করতে পারি ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পৃথিবী কেবল আমাদের একার নয়। আমরা মানুষ একটি প্রজাতি মাত্র। এখানে আরও জানা অজানা লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব রয়েছে। তাদের সবার উপস্থিতি আমাদের পৃথিবীর ভারসাম্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই সময়ে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সকল জীব ও জড় জগতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে এই ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার এবং আমাদের প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে এই সুন্দর পৃথিবীকে সবার জন্য বাসযোগ্য করা।

অনুশীলনী ?

১। তোমার বাসায় সম্পদের অপচয় রোধ করতে কী কী করা যেতে পারে ভেবে দেখো তো?

২। তোমার এলাকায় যেসব উদ্ভিদ বা প্রাণী বিপন্ন তাদের খুঁজে বের করতে পারবে? তাদের বিলুপ্তি ঠেকাতে কী করা যায় চিন্তা করে দেখো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব রোধে
জনসচেতনতা মূলক তথ্যাবলি
করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি রোধে করণীয়
১
ঘন ঘন দুই হাত সাবান পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড যাবৎ পরিষ্কার করুন। প্রয়োজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন।
২
যেখানে সেখানে কফ ও থুতু ফেলবেন না। হাত দিয়ে নাক, মুখ ও চোখ স্পর্শ থেকে বিরত থাকুন।
৩
হাঁচি-কাশির সময়ে টিস্যু অথবা কাপড় দিয়ে বা বাহুর ভাঁজে নাক-মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলুন ও হাত পরিষ্কার করুন।
জ্বর
কাশি
শ্বাসকষ্ট
করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর লক্ষণসমূহ
৩ ফুট

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ
৬ষ্ঠ শ্রেণি বিজ্ঞান

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যয়ী হওয়া ভালো

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য